কিরীটীর গোয়েন্দা গল্প

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

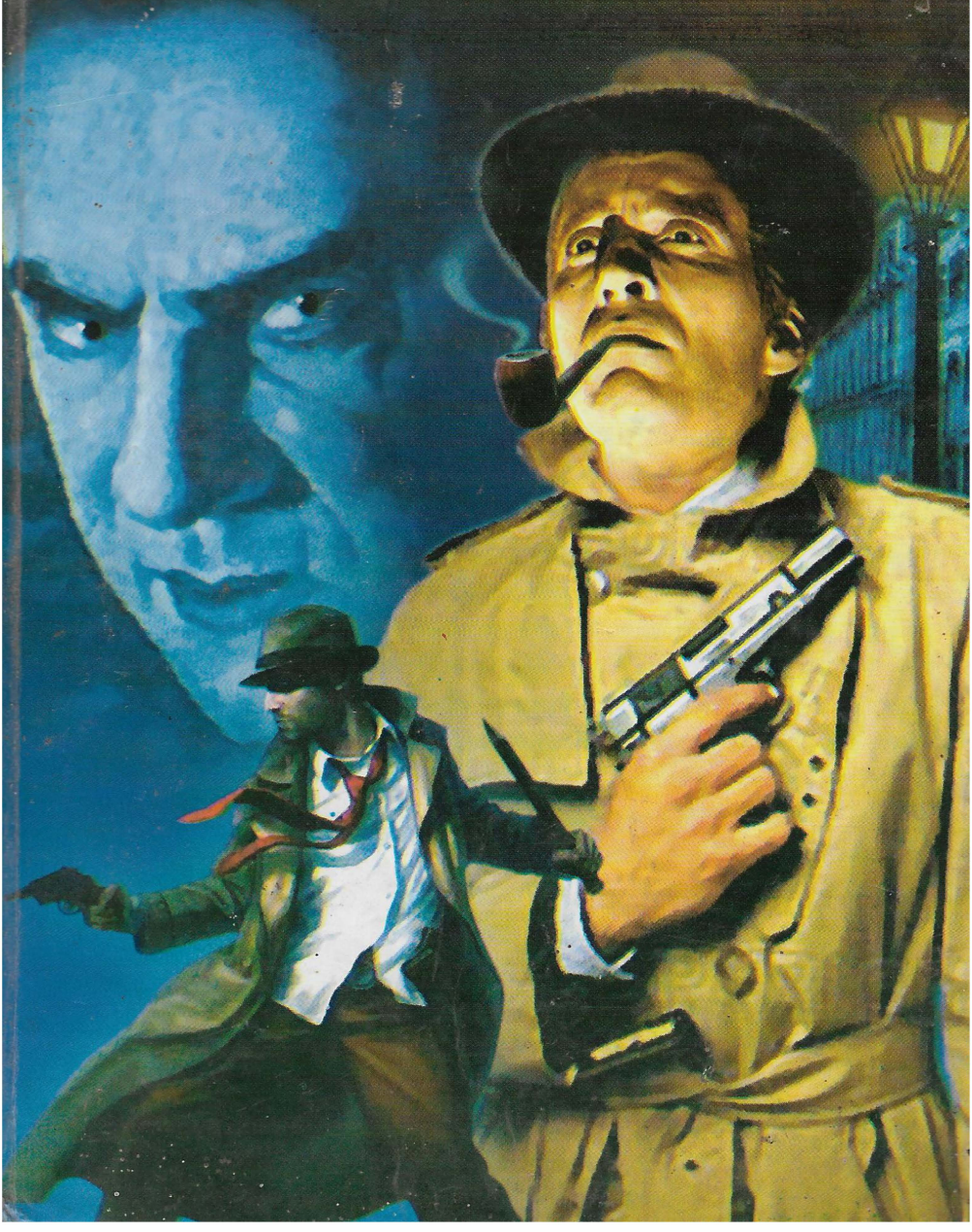

কিরীটীর গোয়েন্দা গল্প

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কামিনী প্রকাশালয় ৫, নবীন চন্দ্র পাল লেন, কল-৯

প্রকাশক :
শ্রীশ্যামাপদ সরকার
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম কামিনী সংস্করণ ঃ
শুভ নববর্ষ, ১৩৯৫
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
অগ্রহায়ণ, ১৩৯৮
তৃতীয় প্রকাশ ঃ
আষাঢ়, ১৪১০
চতুর্থ প্রকাশ ঃ
আষাঢ়, ১৪১৫

প্রচ্ছদ ঃ
সত্য চক্রবর্তী

অলংকরণ ঃ
অমল চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ
৭/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন,
কলকাতা - ৭০০০৬৭

মূল্য ঃ সত্তর টাকা

উৎসর্গ

তুতুল, বনি, মুনিয়া, মুম্‌মা ও টুম্পা, (নাতনী) তোমাদের হাতে তুলে দিলাম তোমাদের দাদামণির মানস পুত্র কিরীটীর গোয়েন্দা গল্প।

দিম্‌মা
মিসেস কনক গুপ্তা

॥ এতে যা আছে॥

কামনার রং	৯
রক্তের দাগ	৩৪
রেশমী ফাঁস	৭৮
পদ্মদহের পিশাচ	৯৬
সংকেত	১০৮
বাঘনখ	১২১
পঞ্চমুখী হীরা	১৩৩
মৃত নক্ষত্র	১৪৭
বসন্ত রজনী	১৭১
রক্তগেরুয়া	২১৮
চিতাবাঘ	২২৫
পদ্মিনী	২৪৪

কি একটা অস্বস্তি, কী একটা যন্ত্রণা যেন সর্বক্ষণ আমাকে ভিতরে ভিতরে পীড়ন করেছে! পাথর চাপা নির্ঝরিণীর মত বের হয়ে আসবার জন্য আকুলি বিকুলি করেছে।

অনুচ্চারিত

আমি জানি আমার অন্যানলেখার চাইতে আমার লেখা রহস্য কাহিনীগুলোই পাঠক-পাঠিকাদের বেশী প্রিয় বিশেষ করে কিরীটী চরিত্রটি।

কালো ভ্রমর ২য় পর্ব যখন লিখি তখন আমি মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। অসম্ভব পড়ার চাপ ও সেই সঙ্গে হাসপাতাল ডিউটি। তারই মধ্যে দীর্ঘ সাত বৎসর আগে 'কালো ভ্রমর' নামে যে কিশোর উপন্যাসটি লিখেছিলাম—এবং প্রথম প্রকাশিত হয় ধারাবাহিক ভাবে শিশুসাথীর পাতায় ও পরে পুস্তকাকারে সেই কালো ভ্রমরের সমাপ্ত কাহিনীকে আবার টেনে এনে যে কোন দিন দ্বিতীয় পর্ব 'কালো ভ্রমর' লিখব কখনো ভাবিনি। কথাটা মনের মধ্যে আমার কখনো আসেওনি! কিন্তু আজ মনে হয় ভাগ্যি 'কালো ভ্রমর' দ্বিতীয় পর্ব রচনায় হাত দিয়েছিলাম, নচেৎ 'কিরীটী' হয়ত কোনদিনই জন্মাত না!

কালো ভ্রমরের মত এক অসাধারণ criminal এর সঙ্গে মোকাবিলার জন্যই আমার প্রয়োজন হয়েছিল কিরীটীর মত এক সত্যসন্ধানীর। যার superiority humanity 'কালো ভ্রমরকে' সুনিশ্চিত ভাবে পরাজিত করবে।

সে এমন একটা মানুষ, এমন একটা চরিত্র যার প্রথম প্রকাশই হবে বিশেষ একটি আবির্ভাব। একটা character।

চরিত্রও চিন্তা করে নিলাম, কিন্তু কি দেবো তার নাম।

কোন নামে তার পরিচয় দেবো। ভাবি আর ভাবি—পছন্দই হয়না কোন নাম। কত নাম বসাই আর কাটি।

অবশেষে খুঁজে পেলাম ঐ নামটি কিরীটী! তুষার মুকুট মাথায় কাঞ্চনজঙ্ঘাই আমাকে পথ দেখিয়েছিল—কিন্তু সে কথা আজ আর আমার মনেও পড়েনা—কেবল মনে আছে আমি পেয়েছিলাম আমার কিরীটীকে।

অনেক কাহিনী রচনা করেছি এ কিরীটীকে কেন্দ্র করে—এবং সেসব ক্ষেত্রে আমায় প্রেরণা জুগিয়েছে ঐ কিরীটীই, আমার সৃষ্টি বহু চরিত্রের মধ্যেও সে—একক অনন্য।

আমি জানি কিরীটী শুধু একা আমার নয়—বহু বহু জনার প্রিয়। আবাল-বৃদ্ধবনিতার। আমার লেখক জীবনের সে এক বিশেষ প্রাপ্তি—স্বীকৃতি। জীবনের প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করতে বসে আজ তাই বার বার মনে হয়—ওকে না খুঁজে পেলে হয়ত আমার কিছুই পাওয়া হতো না।

কিরীটীকে নিয়ে লেখা গত কয়েক বৎসর আমি এক প্রকার ছেড়েই দিয়েছিলাম—কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকার আহ্বান ও বিশেষ অনুরোধে আবার কিরীটীকে আনতে হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখি আমার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল দেশ পত্রিকাতেই 'একরাত্রি' যদিও সে উপন্যাসটি আমি কখনো পুস্তকাকারে প্রকাশ করিনি।

তা না করলেও মূলত উপন্যাস লেখার প্রেরণা অনেকখানি পেয়েছিলাম 'দেশে' প্রকাশিত ধারাবাহিক ভাবে ঐ 'একরাত্রি' থেকেই। আর লেখার জন্যও প্রথম পারিশ্রমিক পেয়েছিলাম ঐ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দুঃস্বপ্ন' গল্প থেকে। পাঁচ টাকা—যে টাকার মূল্য আমার কাছে লক্ষাধিক টাকারও বেশী। এবং আমার স্মৃতির কোঠায় মণি মাণিক্যের মত আজো উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কামনার রং

বুকের মধ্যে একটা অশান্তির ঝড় নিয়ে সুমিত এলো কলকাতায়।

কি করবে এখন সে। কি করবে।

স্বপ্নেও যা ভাবতে পারেনি সুমিত শেষ পর্যন্ত তাই হলো—বিবাহের মাত্র তিন দিন পরেই সংযুক্তা তার দিল্লীর কোয়াটার্স ছেড়ে শেষ রাত্রের দিকে কোথায় যে চলে গেল কিছুই সে জানতে পারল না। এবং তারপর দশটা দিন ধরে অনেক খোঁজাখুঁজি করে অপেক্ষায় থেকেও সংযুক্তার কোন হদিস করতে পারল না সুমিত।

অবশেষে ডাকযোগে একটা চিঠি তার হাতে পৌঁছল—চিঠির ঠিকানা ঃ ১৩নং আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা।

সংক্ষিপ্ত দু'লাইনের একটা চিঠি—

সংযুক্তাকে যদি ফিরে চান তো ওপরের ঠিকানায় সাত দিনের মধ্যে দশ হাজার টাকা ক্যাশ নিয়ে এসে দেখা করবেন। অন্যথায় তার লাসটা এ দিনই পাবেন আপনার দিল্লীর কোয়াটার্সে!

ব্যস্—আর কিছু নয়—নীচে কারুর নাম নেই—কোনো তারিখও নেই।

ওপরে তার দিল্লীর ঠিকানাটা লেখা লাল কালিতে।

দশ হাজার টাকাতো নেহাৎ কম টাকা নয়। অত টাকা সুমিত একসঙ্গে চোখেও দেখেনি জীবনে আজ পর্যন্ত।

সেই সময়ই ওর মনে পড়েছিল হঠাৎই একজনের কথা।

হাওড়া স্টেশনে নেমে সোজা একটা ট্যাক্সী নিয়ে সুমিত চলে গেল তারই কাছে।
এক সময় সুমিত ঐ ভদ্রলোকের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিল।
এবং সেই সূত্রেই চিঠির মারফৎ উভয়ের মধ্যে পরিচয় হয়, কিরীটী রায়।

কিরীটী রায় তার বাড়ীতে ছিল।
দরজার বেল বাজতে জংলী এসে দরজা খুলে দিল।
কোথা থেকে আসছেন। জংলী শুধাল।
দিল্লী থেকে—সুমিত বললে—মিঃ রায় আছেন?
আছেন—কি নাম আপনার—
বলে, দিল্লী থেকে সুমিত সিংহ এসেছে—বিশেষ একটা জরুরী প্রয়োজনে দেখা করতে চায়।
বসুন। খবর দিচ্ছি আমি। আজকাল বড় একটা উনি কারু সঙ্গে দেখাই করেন না।
বাইরের ঘরে সুমিতকে বসিয়ে জংলী ওপরে গেল।
স্টাডি রুমে কিরীটী বসে একটা ইংরাজী উপন্যাস পড়ছিল। ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা মেসিন চলছে।
বাবুজী—জংলী ডাকল মৃদু গলায়।
কি? কিরীটী মুখ তুলে তাকাল।
দিল্লী থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন—তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়—কি জরুরী প্রয়োজন আছে বলছেন।
কি নাম।
সুমিত সিংহ—
দিল্লী থেকে এসেছে বললে।
হ্যাঁ—
ঠিক আছে—ওপরে নিয়ে আয়—এই ঘরেই—
এই ঘরেই—
হ্যাঁ—যা এখানেই নিয়ে আয়—

সুমিতের সঙ্গে এক সময় পত্র মারফৎ পরিচয় হলেও কখনো তাকে চাক্ষুষ দেখেনি কিরীটী ইতিপূর্বে—তাহলেও সুমিতের কথা মনে ছিল তার।
একটু পরেই সুমিত এসে ঘরে ঢুকলো।
নমস্কার মিঃ রায়—আমি সুমিত সিংহ—দিল্লী থেকে আসছি, জানি না মনে আছে কি না আপনার নামটা—
মনে আছে, বসুন—কিরীটী বললে।
সুমিত বসলো।

আপনাকে দেখে যেন মনে হচ্ছে খুব চিন্তিত আপনি।

আমার জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে মিঃ রায়—আকস্মিক এক দুর্ঘটনা।

দুর্ঘটনা—

হ্যাঁ।

কি বলুন তো।

তাই আপনার কাছে অত দূর থেকে ছুটে এসেছি—কারণ মনে হলো একমাত্র আপনিই হয়তো পারবেন আমার সমস্যাটার কোন একটা সমাধান করতে—

কি ব্যাপার যদি একটু বলেন—কিরীটী বললে।

দিন তের-চৌদ্দ আগে—হঠাৎ আমার নবপরিণীতা স্ত্রী সংযুক্তা নিরুদ্দিষ্টা হয়—আমার দিল্লীর কোয়ার্টাস থেকে।

নিরুদিষ্টা হয় মানে?

কোথায় যেন সে চলে গিয়েছে—অনেক খুঁজে তার কোনো সন্ধান করতে পারিনি।

কোনো রকম ঝগড়া-টগড়া কিছু হয়েছিল নাকি আপনাদের মধ্যে?

না। মাত্র বিয়ের তিন দিন পরেই সে নিরুদিষ্টা হয়ে গেল—কোথায় যে চলে গেল।

Negotiation Marriage আপনার।

হ্যাঁ—সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন পড়ে যোগাযোগ করি তারপর কথাবার্তা হয়—এবং সংযুক্তার বাবার উপস্থিতিতেই বিয়েটা হয় আমাদের—

কোথায় বিয়ে হয়েছিল?

এই কলকাতার কাছেই ব্যারাকপুরে—এবং বিয়ের পর তাকে নিয়ে পরের দিনই প্লেনে আমরা দিল্লী ফিরে যাই—

তারপর—

ওখানে পৌছবার দুদিন পরেই ঘটনাটা ঘটলো। সংযুক্তা নিরুদ্দিষ্টা হয়ে গেল হঠাৎ—ঘুমিয়েছিলাম, ভোরে ঘুম ভাঙার পর আর তাকে দেখিনি।

তার বাবার কাছে খোঁজ নেননি।

নিয়েছি—সেই দিনই সন্ধ্যায় ট্রাঙ্ককল করে কিন্তু আমার কথা শুনে সংযুক্তার বাবা তো অবাক—বললেন তার কাছে যায়নি সংযুক্তা—

সংযুক্তা অন্য কাউকে ভালবাসত কিনা জানেন কিছু—

না—সে রকম কিছু শুনিনি—তাছাড়া ও থাকত বরাবর হোস্টেলে—সেখান থেকেই বি.এ.পাশ করে গতবারে।

তার বাবাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

করেছি—উনি বললেন—সংযুক্তা সেরকম মেয়েই নয়—তাছাড়া বিয়ের পর ত্রিরাত্রিও একত্রে কাটিয়েছি—সেরকম কোন আভাসই পাইনি—তার কথাবার্তায় বা চাল-চলনে এবং ব্যবহারে—যতদূর বুঝেছিলাম সে খুশিই হয়েছিল আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ায়—

হুঁ। তা সেই চিঠিটা এনেছেন?

হ্যাঁ—এই যে দেখুন—সুমিত চিঠিটা তার এ্যাটাচী কেস থেকে বের করে দিল কিরীটীর হাতে।

কিরীটী চিঠিটা পড়লো—বার তিনেক। দশ হাজার টাকার কথাটার নীচে লাল কালিতে under line করা—পড়লেন মিঃ রায় চিঠিটা—সুমিত প্রশ্ন করলো কিরীটীকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

হুঁ—সুব্রত আমহার্স্ট স্ট্রীটেই থাকে। তাকে একটা ফোন করছি—বাড়ির নম্বরটাও তার বাড়ির কাছাকাছিই মাড়োয়ারী হাসপাতালটার সামনে বলেই মনে হচ্ছে।

কিরীটী সুব্রতর ফোন নাম্বারে ডায়াল করল।

দুবার রং কানেকশন হবার পর কানেকশন পেল কিরীটী।

হ্যালো—

সুব্রত—

কথা বলছি—কিরে এত সকালে হঠাৎ—কি খবর—

একবার আসতে পারিস—আমার এখানে।

কখন যেতে হবে?

এখুনি—এখানেই চা খাবি—

চা খাওয়া আমার হয়ে গিয়েছে—আমি আসছি—ওপাশে সুব্রত ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখে—কিরীটী শব্দ পেল।

কিরীটী আবার সুমিতের চিঠিটা চোখের সামনে তুলে ধরল।

হাতে লেখা চিঠিটা—অপরিচ্ছন্ন হাতের লেখা। মনে হয় যেন একটু কষ্ট করেই ধরে ধরে লেখা হয়েছে চিঠিটা যত্ন করে। আবার উল্টে দেখলো খামের ওপরে ঠিকানাটা—একই প্রকার অপরিচ্ছন্ন হাতের লেখা—যদিও ইংরাজীতেই। তবে মনে হলো দুটোই একই হাতের লেখা।

খামের ওপরে Post Office-য়ের ছাপ মারা—অস্পষ্ট কিছুটা যে ডাকের ছাপ যেন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। চিঠিটা আমি রেখে দিতে পারি মিঃ সিংহ—

হ্যাঁ—রাখুন না—সুমিত বললে।

কিরীটী তার পরিধেয় পাঞ্জাবীর পকেটে চিঠিটা রেখে দিল ঢুকিয়ে।

মিঃ সিংহ—

বলুন।

এবারে আমার কয়েকটা প্রশ্নের যদি জবাব দেন।

কি প্রশ্ন—বলুন।

যে তিন দিন আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কেটেছে আপনাদের নিশ্চয়ই কথাবার্তা হয়েছে পরস্পরের মধ্যে।

হয়েছে—

কি ধরনের কথাবার্তা—

বিশেষ তেমন কিছুই বলবার মত নয়—তবে—

বলুন—

সংযুক্তা খুব কম কথা বলেছে—মনে হয়েছে ও যেন একটা শান্ত প্রকৃতির—কথা কম বলে—

স্পষ্ট করে বলুন তো আর একটু—

সংযুক্তাকে একটু লাজুক প্রকৃতির বলে মনে হয়েছে—তাছাড়া মনে হয়েছে ও যেন একটু কম কথাই বলে—

হুঁ আচ্ছা—সামান্য যে কথাবার্তা আপনাদের মধ্যে হয়েছে—তাতে কি আপনার একবারও মনে হয়নি—

কি?

॥ দুই ॥

সংযুক্তার এই বিয়েতে তেমন একটা মত ছিল না। কিরীটীর প্রশ্ন—

না, তেমন তো মনে হয়নি মিঃ রায়—

মানে—আমি জিজ্ঞাসা করছি তার প্রাক্ বিবাহের দিকের অন্য কারো সঙ্গে তার পরিচয় বা কিছু—

না, সংযুক্তা সে ধরনের মেয়েই নয় মিঃ রায়—She is not a that type of girl.

আপনি যখন ব্যারাকপুরে আপনার শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলেন তখন তাঁকে কথাটা জিজ্ঞাসা করেননি।

না।

জিজ্ঞাসা করা কিন্তু আপনার উচিত ছিল? তার একটা অতীত জীবন হয়ত ছিল।

আপনি চান তো আজই যেতে পারি তার সঙ্গে দেখা করতে ব্যারাকপুরে—

মনে হয় আমার, একবার আপনি ঘুরেই আসুন—আর একটা কথা সংযুক্তাদেবী চলে গেছেন শুনে ওর বাবা কি বললেন আপনাকে—

উনি তো শুনে অবাক—প্রথমটায় ও কথাটা বিশ্বাসই করতে চান না—বললেন কি আবোল-তাবোল বলছ তুমি—সংযুক্তা চলে গেছে—কিন্তু কেন, কেন যাবে? তাকে না জিজ্ঞাসা করে তার মতামত না নিয়ে তো বিয়েটা হয়নি।

হুঁ—বিয়ের আগে আপনি সংযুক্তাকে দেখেননি।

না, একেবারে বিয়ের রাত্রে বাসরেই তাকে প্রথম দেখি, এবং তখনই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

মেয়ে না দেখেই বিয়ের ব্যাপারটা fix করে ফেললেন।

ফটো দেখেছি, ফটো দেখেই আমার পছন্দ হয়ে গিয়েছিল সংযুক্তাকে। আমি আমার সম্মতি জানিয়ে বিবাহের দিন ওদেরই ঠিক করতে বলি। এবং পরের মাসেই বিবাহ হয়ে যায়।

ঐ সময় সুব্রত এসে ঘরে ঢুকল।

আয় সুব্রত।

কি ব্যাপার কিরীটী—এত জরুরী তলব কেন হঠাৎ রে।

বোস।

সুব্রত বসল।

কিরীটী পকেট থেকে খামটা বের করে সুব্রতর হাতে দিল।

কার চিঠি—

আগে পড়ে নে তারপর বলছি—

দু'মিনিটের মধ্যে চিঠিটা পড়া হয়ে যায়, কার চিঠি সুব্রত আবার প্রশ্ন করে।

ঐ ভদ্রলোক চিঠিটা ডাকে পেয়েছেন। চিঠির মধ্যে যে ঠিকানাটা লিখেছে—মনে হচ্ছে। ঐ বাড়ির নম্বরটাতো তোর বাড়ির কাছেই হবে।

তিনটে বাড়ির পরে—

চিনিস বাড়িটা কার।

চিনি। তাছাড়া ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয়ও আছে। এই তো কয়েকদিন আগে ওর এক বন্ধুর মেয়ে সংযুক্তার বিয়ে হল—দিল্লীর একটি ছেলের সঙ্গে। সে বাড়িটাতো আমাদেরই পাড়াতে Post office-য়ের কাছে। কিরীটী বললে, ঐ ওর সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে—

তাই নাকি—

হ্যাঁ—

তা এ চিঠির অর্থ।

সংযুক্তাকে বিয়ের তিনদিন পর থেকেই আর পাওয়া যাচ্ছে না—মানে সে নিরুদ্দিষ্টা—

বলছিস কি!

হ্যাঁ—তার ওই চিঠি পেয়েছেন ভদ্রলোক।

বুঝলাম—black mailing বলেই মনে হচ্ছে—

ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে তো তোর পরিচয় আছে বললি না—হ্যাঁ ভদ্রলোকের নাম হিমাংশু ঘোষ—বেশ বড় একজন বিজনেসম্যান—বড়বাজারে তারও বিরাট কাপড়ের দোকান।

আর যে ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে—তাকে চিনিস।

না।

চিনিস না—

না, তাছাড়া আমি তো বিয়েতে যাইনি। তার নামটা শুনেছি প্রফুল্লকান্তি ঘোষ। তোকে কে বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছিল—

প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে আমার তেমন একটা পরিচয় নেই। আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন নিজে এসে আমার বাড়িতে হিমাংশুবাবুই।

ঐ ভদ্রলোক তার বাড়ির ঠিকানায় দেখা করতে বলেছে সুমিতবাবুকে—

বুঝলাম, যে বাড়িতে দেখা করতে বলেছেন ওকে যিনি একটু আগেই তো বললাম। তারও বিরাট বিজনেস আছে—বড়বাজারে নামকরা একজন ধনী—তা ছাড়া—একটা কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না কিরীটী—

কি?

যিনিই চিঠিটা লিখুন না কেন—হিমাংশুবাবুর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই—

সত্যিই অবিশ্বাস্য—কেন লিখবেন—সে প্রকৃতির লোকই নন তিনি। সাধু প্রকৃতির লোক অবিশ্যি সংযুক্তার বাবাকেও ভাবতে পারছি না।

তাহলে তুই আজই একবার দেখা করতে পারবি—

কার সঙ্গে।

সংযুক্তার বাবার সঙ্গে—মানে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে।

এতক্ষণে সুমিত কথা বললে, আপনাদের কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি—সংযুক্তার বাবা তো ব্যারাকপুরে থাকেন এবং তার নাম শ্রীচৈতন্য ঘোষ।

সুব্রত এবারে প্রশ্ন করে—বিবাহের পূর্বে আপনার স্ত্রীর নাম কি ছিল?

সংযুক্তা ঘোষ—

আরও বললে সুমিত, একটু আগেই বললাম আমাদের বিবাহ হয়েছে ব্যারাকপুরে, আর সংযুক্তার বাবা একজন গরীব কেরাণী, সামান্য তিনশতটাকা মাইনে পান। চৈতন্যবাবু দীর্ঘদিন ধরে ব্যারাকপুরের বাসিন্দা—আমি যতদূর জানি। তাছাড়া—

কিরীটী ও সুব্রত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তখন।

সুমিত বলতে লাগল, ঐ হিমাংশু বা প্রফুল্ল ঘোষের নাম আমি জীবনে শুনিনি আজ পর্যন্ত, আজই প্রথম শুনলাম।

ঐ নাম দুটো শোনেননি? কিরীটীর প্রশ্ন—

না, আজই প্রথম শুনলাম এখানে—সুমিত বললে।

কিরীটী অতঃপর কি যেন একটু ভাবল তারপর বলল, আপনার স্ত্রী সংযুক্তাদেবীর কোনো ফটো আছে, আপনার কাছে।

আছে—

দেখতে পারি—মানে সঙ্গে আছে আপনার।

সুমিত সুটকেশ থেকে একটা খাম বের করে দিল কিরীটীর হাতে।

কিরীটী খামের ভিতর থেকে একটা ফটো বের করল।

একটি তরুণীর ফটো।

এই ফটোটা কোথায় পেলেন—
বিয়ের আগে ঐ ফটোটাই সংযুক্তার বাবা আমাকে পাঠিয়েছিলেন।
ঠিক আছে—আপনি ফটোটা আমার কাছে রেখে যেতে পারবেন?
কেন পারব না, রাখুন না—ঐ ফটোটা।
আপনি পারেন তো কাল একবার আসুন—
কেন পারব না, আসব—কখন আসব বলুন।
এই সময়ই—
বেশ।
সুমিত উঠে দাঁড়াল এবং বিদায় নিল নমস্কার করে—
কিরীটী সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল, সুব্রত।
কি বলছিস?
এই ফটোটা নিয়ে তুই একবার প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারবি আজ।
কেন পারব-না।
তবে এখনি না—খোঁজ নিবি এই ফটোর মেয়েটিকে প্রফুল্লবাবু চেনে কিনা।
ঠিক আছে।
সুব্রত বলে উঠল।
দেরি করিস না। আজ দেখা করতে পারলেই ভাল হয়—
তাই করব। একবার কি ব্যারাকপুরে গিয়ে চৈতন্যবাবুর সঙ্গে দেখা করব?
পারবি—
বলিস তো যেতে পারি, সুব্রত বললে।

॥ তিন ॥

সুব্রত ঐ দিনই কিরীটীর ওখান থেকে বের হয়ে প্রথমে গেল প্রফুল্লবাবুর ওখানে। এবং তাকে সুমিতের দেওয়া ফটোটা দেখাল।

প্রফুল্লবাবু ফটোটা দেখে বললেন, কোথায় পেলেন এ ফটোটা সুব্রতবাবু—
আপনি একে চেনেন?
চিনি। মেয়েটি আমার আত্মীয়—
তাই নাকি?
কি রকম আত্মীয়—
আমার ছোট ভাই, মানে জ্যাঠতুত ছোট ভাই চৈতন্যর মেয়ে—
উনি ব্যারাকপুরে কি থাকেন?
হ্যাঁ—কিন্তু কেন বলুন তো? কি ব্যাপার সুব্রতবাবু? কিছুদিন আগে কি ঐ ভাইঝির আপনার বিবাহ হয়েছে—

বিবাহ!

হ্যাঁ—

না তো—তবে—

কি তবে—মেয়েটির নাম বোধ হয় সংযুক্তা—

হ্যাঁ—

এবার বলুন কি বলছিলেন।

আজ দিন পনেরো হল, সংযুক্তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

না।

কিরকম?

কলেজে পড়ত সংযুক্তা, কলকাতায়,—ব্যারাকপুর থেকে আসা-যাওয়া করতো কলকাতায়—দিন পনেরো আগে কলেজে এসে আর ফিরে যায়নি। কোথায় গেল, কি হল আজ পর্যন্ত তার কোনো হদিশই পাওয়া যায়নি।

পুলিসে—থানায় রিপোর্ট করেছেন—

হ্যাঁ, ডাইরী করা আছে-তাছাড়া—

কি?

T. V. তে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে—

আচ্ছা প্রফুল্লবাবু—সুমিত সিংহ নামে কাউকে চেনেন?

না, নাম তো এই প্রথম শুনছি—

দিল্লীতে থাকে ছেলেটি—

ঐ সুমিত সিংহ আজ কিরীটীর সঙ্গে এসে দেখা করেছে—

কি ব্যাপার—

সে বলছে দিন পনেরো আগে ওর সঙ্গে আপনার ভাইঝি সংযুক্তার নাকি বিবাহ হয়েছিল ব্যারাকপুরে—

সংযুক্তার বিবাহ—

তাই বলেছে—

Funny! বললাম তো এই মাত্র আপনাকে হঠাৎ দিন পনেরো আগে সংযুক্তা নিরুদ্দিষ্টা হয়েছে—আজ পর্যন্ত তার কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি। আজ সকাল পর্যন্তও তার কোনো খবর নেই—আপনারা কি সংযুক্তার কোনো খবর পেয়েছেন?

পুলিসের Mission squarde-য়ে জানিয়েছেন।

হ্যাঁ, রিপোর্ট করা আছে—লালবাজারের পুলিস কমিশনারের দপ্তরে—

আমার আরও কিছু প্রশ্ন ছিল—

বলুন—

আপনার ভাইঝির কোনো ফটো আছে, আপনার কাছে?

যেটা ছিল সেটা পুলিসে জমা দেওয়া হয়েছে—

সুব্রত আবার সুমিত সিংহর দেওয়া ফটোটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা প্রফুল্লবাবু, এই ফটোটা তো সংযুক্তার। কিন্তু কোনো সময়ে কি চৈতন্যবাবু এই ফটোটা বিবাহের ব্যাপারে দিল্লীতে সুমিতবাবুকে পাঠিয়েছিলেন।

বিবাহের ব্যাপারে চৈতন্য পাঠিয়েছে—

তাই—

Impossible হতেই পারে না, তাছাড়া—আমি যতদূর জানি—

কি বলুন?

তিন কপি ফটো ছিল চৈতন্যর কাছেই শুনেছি, একটা পুলিসকে দেওয়া হয়েছে—একটা সংযুক্তা তার বান্ধবী গীতাকে দিয়েছিল, আর একটা এখনো চৈতন্যর কাছেই আছে—

গীতা—

হ্যাঁ, গীতা চ্যাটার্জী—দিল্লীতে থাকে—কেরল বাগে—

কি করে সে সেখানে?

গীতার স্বামী অরিন্দম চ্যাটার্জী দিল্লীতে চাকরী করে—

তার ঠিকানাটা পেতে পারি।

প্রফুল্লবাবু বললেন, আমি তো জানি না, আমার ভাই সংযুক্তার বাবা চৈতন্য জানতে পারে—

আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি, নমস্কার—

ঐদিন সন্ধ্যার দিকে সুব্রত ব্যারাকপুরে গিয়ে চৈতন্য ঘোষের সঙ্গে দেখা করল।

চৈতন্যবাবুও একই কথা বললেন—

সংযুক্তা তার মেয়ে দিন পনেরো হলো নিরুদ্দিষ্টা। কলেজ গিয়েছিল, কলেজ থেকে ফেরার পথে যে কোথায় চলে গেছে—কেউ জানে না আজ পর্যন্ত। তার কোন সন্ধান পাইনি।

এবং চৈতন্যবাবু এও বললেন, সুমিত সিংহ নামে কাউকে চেনেন না এবং সংযুক্তার বিবাহই হয় নি।

আচ্ছা চৈতন্যবাবু, আপনার মেয়ের বন্ধু গীতা চ্যাটার্জীর কাছে সংযুক্তা-সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর নিয়েছিলেন?

না—কিন্তু কেন বলুন তো?

না—বলছিলাম কি—তার ওখানেও তো আপনার মেয়ে যেতে পারে।

আমাদের কিছু না বলে সংযুক্তা দিল্লী চলে যাবে—না মশাই এ আমি বিশ্বাস করি না।

হুঁ। গীতার addressটা দিতে পারেন।

কেন পারবো না—বসুন আমি তার addressটা এনে দিচ্ছি। আমিও জানি না—আমার স্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন।

সত্যিই সংযুক্তার বান্ধবী গীতা চ্যাটার্জীর ঠিকানাটা চৈতন্যবাবুর স্ত্রী সরমা দেবী জানতেন—ঠিকানাটা তার কাছ থেকে জেনে একটা কাগজে লিখে চৈতন্যবাবু এনে দিলেন কাগজটা সুব্রতকে।

কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে বলে আমার মনে হচ্ছে সুব্রতবাবু—আপনি কি সংযুক্তার কোন সন্ধান পেয়েছেন?

না। তবে ঐ সুমিত সিংহ একটা চিঠি পেয়েছে—১৩নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে হিমাংশু ঘোষকে বোধহয় আপনি চেনেন?

চিনি—আমার আত্মীয়—

আত্মীয়—

হ্যাঁ—আমার জ্যাঠতুতো ভাই। খুব বড় একজন business man—

ধনী—

হ্যাঁ—যাকে বলে রীতিমত ধনী—

তার সঙ্গে মানে তার বাড়িতে আপনাদের যাতায়াত আছে?

আছে—কিন্তু সত্যিই সমস্ত ব্যাপারটা যেন কেমন দুর্বোধ মনে হচ্ছে—

একটা সংবাদ নিতে পারেন—

কি সংবাদ?

হিমাংশুবাবু কোন চিঠি পেয়েছেন কিনা।

আমি এখুনি ফোন করে জানছি।

চৈতন্যবাবু তখুনিই ফোন করলেন—হিমাংশুবাবু বললেন, না তিনি কোন চিঠি পান নি।

ঠিক আছে।—আমি এবার উঠছি। সুব্রত বিদায় নিল চৈতন্যবাবুর কাছ থেকে।

ঐদিনই সন্ধ্যার পর কিরীটীর বসবার ঘরে সুব্রতর সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

কিরীটী সুব্রতর কথা শুনে বললে, ঠিক আছে কালই সুমিতবাবুকে আসতে বলছি—দেখি তার কি বক্তব্য আছে—

কিন্তু কোন সুমিতের সঙ্গে তো সংযুক্তার বিবাহই হয়নি।

তবে ঐ সব কথা বলে গেলেন কেন ভদ্রলোক?

॥ চার ॥

পরের দিন সুমিত সিংহ কিন্তু এলো না।

সন্ধ্যা পর্যন্ত কিরীটী আর সুব্রত সুমিত সিংহের জন্য অপেক্ষা করল।

ব্যাপার কি বলত কিরীটী—এক সময় সুব্রত বললে।

কিরীটী সুব্রতর কথার কোনো জবাব দেয় না। কি যেন ভাবছে সে মনে হল।

কিরীটী—

বল।

দিল্লীতে সুমিত সিংহ যেখানে থাকে তুইতো জানিস?

জানি।

আমি একবার দিল্লী ঘুরে আসব—

যাবি?

যাই না—কারণ আমার মনে হচ্ছে—ঐ ভদ্রলোক আর আসবেন না।

আমারও তাই মনে হচ্ছে—তুই বরং দুটো টিকিট কাট planeয়ের তোর আর আমার কালকের দিল্লী ফ্লাইটে।

তুই যাবি?

হ্যাঁ—আমার মনে হচ্ছে—

কি?

সংযুক্তাকে কেউ জোর করে কলেজ থেকে ফেরার পথে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে—আর এর পিছনে বিরাট একটা গ্যাঙ আছে—পাকিস্তান ও আরবে মেয়ে চালানকারীদের—

কি বলছিস তুই—

হ্যাঁ—

কিরীটী আর বিশেষ কিছু বলল না।

সেন্ট্রালের ডিটেকটিভ ডিঃ-য়ের মিঃ গণেশন মাস দুইয়েক আগে কলকাতায় এসেছিলেন।

কিরীটীর বিশেষ পরিচিত ভদ্রলোক।

সে সময়ই কিরীটী মিঃ গণেশের মুখে শুনেছিল ঐ মেয়ে চোরা চালানকারীদের কথা। সেন্ট্রালের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট—অনেকদিন ধরে ঐ গ্যাঙটাকে ধরবার চেষ্টা করছে—

বস্তুত কিরীটীর পরামর্শ চেয়েছিল মিঃ গণেশন।

কিরীটী ঐ ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চায়নি।

কিরীটী গণেশনের কথাই ভাবছিল।

কি ভাবছিস রে কিরীটী? সুব্রত প্রশ্ন করে।

কিরীটী গণেশনের কথাটা বললে।

তোর কি এখন মনে হচ্ছে—সুমিতবাবু ঐ দলে আছেন—

তাই—কিন্তু একটা কথা বুঝে উঠতে পারছি না।

কি?

সুমিত সিংহ, আমার কাছে কাল এসেছিল কেন, এবং একটা গল্প ফেঁদে গেল কেন ভদ্রলোক।

হয়তো—

কি?

তোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গেল।

চ্যালেঞ্জ—

হ্যাঁ—

কিরীটী মৃদু হাসল—

হাসছিস—

তুই আর দেরী করিস না সুব্রত—Indian Airlines-য়ের বুকিং office-য়ে একবার এখুনি চলে যা—আগামীকালের দিল্লী ফ্লাইটে কোনো প্যাসেজ যদি পাস।

যাওয়ার দরকার নেই—আমি এখান থেকেই মিঃ পার্থসারথীকে ফোন করছি—ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে—

সুব্রত উঠে গিয়ে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিসে ফোন করল।

পার্থসারথী বললে বেলা দুটোর পরে জানাবে কারণ আপাততঃ একটা সীটই আছে।—সুব্রত তার বাড়ি ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিল এবং বললে সেখানেই জানাতে।

কিরীটীর ধারণাই হয়েছিল সুমিত সিংহ একটা মিথ্যা গল্প শুনিয়ে গিয়েছে তাকে। আদৌ সংযুক্তার মানে চৈতন্যবাবুর মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয়নি। এবং বিবাহের পরও সংযুক্তা বেপাত্তা হয়নি।

কিন্তু কিরীটী ভাবছিল একটা বানানো কাহিনী কেন তাকে শুনিয়ে গেল সুমিত সিংহ। সে কি জানতো না মিথ্যা কাহিনী মিথ্যা প্রমাণ হতে দেরী হবে না। বিশেষ করে কিরীটীর কাছে।

তবে একটা ব্যাপারে কিরীটী মনে মনে সুমিত সিংহকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারে না। বিশেষ করে সংযুক্তাকে নিয়ে কাহিনীটা রচনা করায়।

ঐ মিথ্যা কাহিনী তাকে না শোনালে সংযুক্তার ব্যাপারে সে খোঁজখবরও নিত না এবং দিল্লীও সে যেতে মনস্থ করত না, এবং গণেশনের মুখে শোনা মেয়ে পাচারের ব্যাপারটা নিয়েও হয়তো সে মাথা ঘামাত না।

তবে একটা কথা মনে হচ্ছে কিরীটীর—সম্ভবত দিল্লীতেই মেয়ে পাচারকারীদের কোনো জায়গায় তাদের আস্তানাটা আছে।

তা সে যেখানেই হোক।

হয়তো দিল্লীতে গিয়ে সুমিত সিংহের সঙ্গে দেখা করতে পারলে কোনো না কোনো একটা সূত্র পাওয়া যাবে ঐ রহস্যের।

কিন্তু পরের দিন পালাম এয়ারপোর্টে নেমে কিরীটী ও সুব্রত প্রথম জনতা হোটেলের একটা কামরায় ওদের অ্যাটাচীকেস দুটো রেখে ট্যাক্সী নিয়ে সোজা সুমিত সিংহের ওখানে গিয়ে জানতে পারল সুমিত যে address দিয়েছিল সে address-এ সুমিত সিংহ বলে কেউ থাকে না।

সেখানে, একটা পাঞ্জাবী ভদ্রলোক চার বৎসর ধরে আছেন—তার ফ্যামিলি নিয়ে।

কিরীটী যে ব্যাপারটা কিছুটা পূর্ব হতেই অনুমান করেনি তা নয়—তবু একবার গিয়েছিল।

সুব্রত বললে, তাহলে সবটাই আগাগোড়া একটা ধাপ্পা ও বানানো গল্প।

আমি কিন্তু গতকালই চৈতন্যবাবুর সব কথা শুনে ঐ রকমই একটা কিছু অনুমান করেছিলাম সুব্রত।

তাহলে এখন কি করবি—

চল দেখি একবার গীতা চ্যাটার্জীর ওখানে যাই—কিরীটী বললে।

এই রাত্রে—

তা হোক—চল—এমন কিছু বেশী রাত হয়নি—মাত্র পৌনে দশটা।

মিস গীতা চ্যাটার্জী তার ফ্ল্যাটেই ছিল।

স্থানীয় একটা কলেজে সে অধ্যাপিকা।

কলিংবেল বাজাতেই একজন আয়া এসে দরজা খুলে দিল।

কাকে চাই—

মিস চ্যাটার্জী আছেন?

আছেন—আপনারা।

উনি আমাদের চিনবেন না। তা হলেও তুমি গিয়ে মিস চ্যাটার্জীকে বল কলকাতা থেকে দুজন বাবু বিশেষ প্রয়োজনে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

বসুন আপনারা—আমি খবর দিচ্ছি—তিনি খাবার টেবিলে।

ঠিক আছে খাওয়া হয়ে গেলে বল।

আয়া চলে গেল।

মিনিট কুড়ি বাদে গীতা চ্যাটার্জী বাইরের ঘরে এসে ঢুকলেন।

নমস্কার—কিরীটীই প্রথম হাত তুলে নমস্কার জানাল।

নমস্কার—কিন্তু আপনাদের তো চিনতে পারলাম না।

না আপনি চেনেন না আমাদের—

আপনারা শুনলাম কলকাতা থেকে আসছেন—

হ্যাঁ—বিশেষ একটা প্রয়োজন আছে—

কি প্রয়োজন বলুন তো?

আপনি বসুন মিস চ্যাটার্জী।

গীতা একটা সোফায় উপবেশন করল।

আমার নাম কিরীটী রায়—

ক্ষমা করবেন—আপনি কি সেই বিখ্যাত—সত্যসন্ধানী—

হ্যাঁ—

তা কি ব্যাপার—

সংযুক্তা ঘোষকে আপনি চেনেন?

সংযুক্তা!

হ্যাঁ—

চিনি। তবে অনেক দিন আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ নেই—

কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো মিঃ রায়—

সংযুক্তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সেকি!

হ্যাঁ—একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে হঠাৎ সে নিরুদ্দিষ্টা হয়ে যায়—তারপর থেকে আর তার কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি আজ পর্যন্ত—

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়—সংযুক্তাকে তো যতদূর জানি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে সে—

সেই রকমই আমরাও শুনেছি—

একটা কথা—আপনারা আমার সন্ধান কোথা থেকে পেলেন?

সংযুক্তার বাবা চৈতন্যবাবুর কাছ থেকে—আবার একটা ব্যাপার এর মধ্যে আছে মিস চ্যাটার্জী।

কি বলুন তো?

আপনি সুমিত সিংহ নামে কোনো ভদ্রলোককে চেনেন?

ঐ নামটা আমি প্রথম শুনছি—

তিনি এই দিল্লীতেই থাকেন—হনুমান রোড—গভর্নমেন্টের একজন এমপ্লয়ি—বছর দেড়েক আগে পত্র মারফৎ তার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়—তিনি আমার একজন অনুরাগীর পরিচয় দিয়ে আলাপ করেছিলেন।

তাই বুঝি।

হ্যাঁ, তিনি হঠাৎ দিন দুই আগে কলকাতায় আমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন—সেই পত্র মারফৎ পরিচয়ের সূত্র ধরে—এবং তিনি আমার সাহায্যপ্রার্থী হন—

কি রকম?

সুমিতবাবু বলেন কিছুদিন আগে সুমিতবাবুর সঙ্গে নাকি সংযুক্তাদেবীর বিবাহ হয়।

সংযুক্তার বিয়ে হল আর আমি জানতে পারলাম না।

তারপর শুনুন—বিয়ের পর সুমিতবাবু তার স্ত্রী সংযুক্তাদেবীকে নিয়ে দিল্লী চলে আসেন এবং দুদিন পরে হঠাৎ তার বাড়ি থেকে সংযুক্তাদেবী নিরুদ্দিষ্টা হয়ে যান—

এ যে এক রহস্য উপন্যাস—

কতকটা তাই—কিন্তু একটা ব্যাপার সুমিতবাবু সংযুক্তার একটা ফটো আমাকে দেন—এবং একটা চিঠি—

চিঠি—কার সংযুক্তার।

॥ পাঁচ ॥

না—

তবে কার চিঠি?

যে বা যারা সংযুক্তাকে গায়েব করেছে তারাই একটা চিঠি দিয়েছে ডাকে সুমিতবাবুকে—

তারপর!

সে চিঠির মধ্যে লেখা আছে—চিঠিটা এখনো আমার কাছেই আছে—১৩ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে দশ হাজার টাকা নিয়ে উপস্থিত থাকলে সংযুক্তাকে ফিরে পাওয়া যাবে—

১৩নং আমহার্স্ট স্ট্রীট, সেটা তো সংযুক্তার কাকার বাড়ি—মানে ওর কাকা হিমাংশু ঘোষ—

আমরাও খোঁজ নিয়ে পরে সেটা জানতে পারি—মানে সংযুক্তার বাবা চৈতন্যবাবুই বললেন। কিন্তু সবচাইতে মজার ও Interesting ব্যাপার হচ্ছে—

কি?

সুমিত সিংহকে পরের দিন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম—কিন্তু তারই আর কোনো পাত্তা নেই—

মানে ভদ্রলোক তাহলে—

হ্যাঁ একটা গল্প বানিয়ে বলেছেন—

কিন্তু—

আমিও তাই ভাবছি—হঠাৎ ঐ ভাবে আমার কাছে গিয়ে ঐভাবে ঐ চিঠিটা দিয়ে আমাকে একটা গল্প বানিয়ে শোনাবার কী প্রয়োজন ছিল—

কিছু বুঝতে পারেননি আপনিও মিঃ রায়—

ব্যাপারটা নিয়ে পরে এ দু'দিন অনেক ভেবেছি—আর একটা কথা কি জানেন মিস চ্যাটার্জী—

কি?

সুমিতবাবু দিল্লীর যে addressটা তার দিয়েছিলেন—সে addressয়েও তিনি থাকেন না—মানে ঐ নামে কেউ ঐ ঠিকানায় নেই—সুমিতবাবুকে না পেয়েই আপনার এখানে এসেছি—

বুঝলাম, তা আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি মিঃ রায়?

আমরা জনতা হোটেলে উঠেছি—রুম নাম্বার ২০৩—কটা দিন থাকবো এখানে—আপনি যদি সংযুক্তা দেবীর কোনো সন্ধান পান please আমাদের সঙ্গে একটা contact করবেন ফোনে—

নিশ্চয়ই—করবো—

আপনাকে এই রাত্রে অসময়ে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত মিস চ্যাটার্জী—

না, না—তাতে কি—আপনি বরং এসে ভালই করেছেন—আজ তাহলে উনি—আসুন—

Good night। কিরীটী আর সুব্রত অতঃপর বিদায় নিল।

পরের দিন গণেশনের অফিসে গিয়ে কিরীটী তার সঙ্গে দেখা করল।

মিঃ রায় যে—কি সংবাদ—দিল্লীতে কবে এলেন? গণেশন বললে।

কাল সন্ধ্যার ফ্লাইটে—

বেড়াতে?

না—ভাল কথা মিঃ গণেশন বছর দেড়েক আগে একবার কলকাতায় গিয়ে আপনি আমাকে একজন মেয়ে চোরা চালান কারবারীর কথা বলেছিলেন মনে আছে—

হ্যাঁ—are you now interested.

সেই জন্যই এসেছি—

কি রকম?

কিরীটী তখন সংক্ষেপে সংযুক্তার ব্যাপার বলে গেল। তারপর বললে, আমার এখন মনে হচ্ছে মিঃ গণেশন—

কি?

সংযুক্তার ব্যাপারটা বোধকরি ঐ দলেরই কাজ—মানে আপনার ঐ মেয়ে চালানকারী গ্যাংগুলোর কাজ—

হতে পারে—খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আপনাকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি মিঃ রায়—সেটা বলুন।

ঐ দলটা সম্পর্কে যতটুকু আপনি জানেন বা আজ পর্যন্ত জানতে পেরেছেন—সেটা যদি অনুগ্রহ করে আমাকে বলেন।

বিশেষ কিছুই আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি মিঃ রায়—এবং নিজে তাদের কোনো হদিশ না করতে পেরেই সেবারে কলকাতায় গিয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছিলাম—

তাহলেও আপনি তো একটা অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন—

তা চালিয়েছিলাম—এবং এইটুকু শুধু জেনেছিলাম—সাধারণত পাকিস্তানের-বর্ডার দিয়ে ও বোম্বাই শহরে জাহাজে ওরা মেয়েদের চালান দেয়—

আর কিছুই জানতে পারেন নি?

পেরেছিলাম—এখানকার একজন খুব influential লোক—আহমেদ সুলতান ভদ্রলোকের নাম—আমার মনে হয় আসল ঘাঁটিটা তারই কন্ট্রোলে—

কি রকম—

লোকটা এখানে থাকে না—আসলে তার প্রধান ব্যবসা ইরাকে—এখানে তার একটা সাব-এজেন্ট আছে—এবং ব্যবসার ব্যাপারে আহমেদ সুলতান বছরে দু'তিন বার দিল্লীতে আসে।

এলে কোথায় থাকে জানেন?

জানি, অশোকা হোটেলে—just like a prince এও শুনেছি Londonয়েও তার একটা sub-agent-য়ের office আছে—টটেনহ্যাম কোর্টে—কিন্তু ঐ যে বললাম লোকটা এমন influential অর্থাৎ এত বড় বড় লোকের সঙ্গে একটা হৃদ্যতা ও দহরম-মহরম যে তার ধারে-কাছেও পৌঁছোতে পারবেন না—তার চর সর্বত্র সজাগ—সঙ্গে সঙ্গে সে খবর পেয়ে যাবে এবং নাগালের বাইরে চলে যাবে—

গভীর জলের মাছ বলুন—

তাই—তবে লোকটা সম্পর্কে আমি সর্বদা সংবাদ রাখি—বর্তমানে জানতে পেরেছি দিন পনেরো হল সে অশোকা হোটেলে অবস্থান করছে—

বর্তমানে তাহলে সে দিল্লীতেই আছে—

হ্যাঁ—

কিরীটী কয়েকটা মুহূর্ত মনে মনে কি যেন ভাবল তারপর বললে, আজ সন্ধ্যার পর আপনার সময় হবে—

কেন বলুন তো?

একবার অশোকা হোটেলে ঢু মারবো ভাবছি—

অশোকা হোটেলে?

হ্যাঁ—

তা বেশ ত—আপনি আমার এই অফিসেই আসবেন—আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করবো—

বেশ। তাহলে এখন আমি উঠি।

আসুন...

কিরীটী ও সুব্রত গণেশনের অফিস থেকে বের হয়ে এলো।

সোজা অতঃপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে এলো হোটেলে।

আহারাদির পর ঘণ্টাখানেক টেনে ঘুমোলো।

বেলা পাঁচটার পর বেরোবার জন্য প্রস্তুত হয় কিরীটী।

সুব্রত প্রশ্ন করে, বেরুবি—

হ্যাঁ—

হ্যাঁ—তৈরী হয়ে নে—

কোথায় যাবি। অশোকা হোটেলে?

না।

তবে কোথায় যাবি?

সুমিত সিংহর বাড়ির যে ঠিকানাটা দিয়েছিল, আপাতত তো সেইখানেই একবার যাবো।

কেন?

হয়তো সুমিত সিংহ যে মিথ্যা কাহিনী আমাদের শুনিয়ে এসেছে—আমরা সেটা কখনো সত্য মিথ্যা যাচাই করবো কিনা তার জানাবার একটা কৌতূহল মনের মধ্যে আসাটা স্বাভাবিক। হয়তো সে বাড়িটার দিকে নজর রাখতে পারে—

বুঝেছি—চল সুব্রত বললে।

দুজনে অতঃপর হোটেল থেকে বের হয়ে একটা ট্যাক্সি নিল এবং হনুমান রোডে এসে ট্যাক্সিটা ভাড়া মিটিয়ে ছেড়ে দিল।

কিরীটীর অণুমানটা যে একেবারে মিথ্যা না—সেটা একটু পরেই প্রমাণিত হয়—রাস্তার একপাশে অপেক্ষমান একটা অটোর দিকে হঠাৎ নজর পড়লো ওদের। শেরওয়ানী পরিহিত—মাথায় ফেজ দাঁড়িওয়ালা এক দীর্ঘকায় ব্যক্তির পাশে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়।

কিন্তু কিরীটী সেই দিকে দেখবার আগেই অটোটা স্টার্ট দিয়ে সাঁ করে চলে গেল ফট ফট শব্দ তুলে!

সুব্রত কিন্তু দেখতে পায় নি।

কিরীটীকে তাই সম্বোধন করে বলে, কি দেখছিস ওদিকে।

সুমিত একটা অটোয় করে এদিকে এসেছিল চলে গেল দেখলি না।

কই—না তো?

অটোর নাম্বারটা আমি মনের মধ্যে তুলে নিয়েছি—চল একবার গণেশের অফিসে যেতে হবে।

সুব্রত কোনো কথা বলল না। একটা ট্যাক্সি ঐ দিকেই আসছিল কিরীটীর হাত ইশারায় ট্যাক্সিটা থামাল।

পরের দিনই মোটর ভেইকেলস্ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে গণেশন অটোচালক সুন্দর সিংকে ডেকে পাঠাল তার অফিসে। তার কাছ থেকেই জানা গেল সওয়ারীদের কে জনক রোডের কাছে দোতলা বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়েছে—

বাড়িটা একটা ফ্ল্যাট বাড়ি—

অনেক ভাড়াটে সেখানে থাকে।

দোতলার একটা ফ্ল্যাটে সুমিত থাকে জানা গেল।

আর সেই দাড়িওয়ালা দীর্ঘকায় লোকটি সেখানে মধ্যে মধ্যে আসে। লোকটার নামটা জানা গেল না।

তাহলেও গণেশন ঐ বাড়ির সামনে plain dress দুজন ওয়াচম্যান নিযুক্ত করলো কিরীটীরই পরামর্শে—কারা এবং কি ধরনের লোক ওই ফ্ল্যাটে যাতায়াত করে সব কিছুর ওপরে নজর রাখতে তাদের নির্দেশ দেওয়া হলো।

তারপর আরো দুটো সপ্তাহ কেটে গেল।

কিরীটী আর সুব্রত জনতা হোটেলেই এখনো আছে।

সুমিত সিংহের কোনো নতুন সংবাদ নেই—

কিরীটী কিন্তু হতাশ বা নিরুৎসাহ হয় না।

কেন যেন তার সুনিশ্চিৎ ধারণা হয়েছিল সুমিতের movement-য়ের ওপরে নজর রাখলেই সংযুক্তার ব্যাপারে কিছু সংবাদ পাওয়া যাবে হয়তো।

সত্যি সত্যিই সংবাদ পাওয়া গেল আরো সপ্তাহখানেক বাদেই—

সংবাদটা এলো পালাম হাওয়াই আড্ডা থেকে।

দুটি বোরখা পরিহিতা মুসলমান রমণীকে পালাম বন্দরে সিকিউরিটি পুলিসের লোক আটক করেছে—তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক ছিল এবং তাদের পাসপোর্ট জাল। পুলিশের জেল কাস্টডিতে তাদের আপাততঃ রাখা হয়েছে সতর্ক প্রহরায় সর্বক্ষণ।

গণেশন সংবাদটা দিতেই কিরীটী সোজা তার অফিসে চলে গেল।

গণেশন অফিসেই কিরীটীর অপেক্ষাতে ছিল।

কিরীটী ঘরে ঢুকতেই সাদর আহ্বান জানাল।

॥ ছয় ॥

আসুন মিঃ রায়—গণেশন বললে।

কিরীটী বললে, একটা ব্যাপারে আমি স্থির নিশ্চিত হয়েছি, মিঃ গণেশন।

কি ব্যাপার বলুন তো।

ঐ মেয়ে চোরা চালানকারীদের একটা আড্ডা আছে এই রাজধানীতেই—এই দিল্লী শহরেই—

আমারও তো তাই ধারণা মিঃ রায়—আর সেই কারণেই আমি দুজন দক্ষ গোয়েন্দাকে নিযুক্ত করেছি খোঁজ-খবর নেবার জন্য।

তারা নিয়মিতভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে।

ওরা দুজনে যখন কথাবার্তা বলছে—এমন সময় একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এলো গণেশের অফিসে।

এসো এসো তারপর—কি খবর মিঃ এ্যান্টনী—গণেশন আগন্তুককে প্রশ্ন করে।

একটা খবর আছে স্যার—

কি খবর বল?

এ্যান্টনী একবার গণেশনের পার্শ্বে উপবিষ্ট তার অপরিচিত কিরীটী ও সুব্রতর দিকে তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

গণেশন মৃদু হেসে বললেন, ওরা আমারই লোক এ্যান্টনী কোনো সংকোচ বা দ্বিধার প্রয়োজন নেই—তোমার যা বলবার বল।

এ্যান্টনী এবারে বললে, খুব reliable source থেকেই সংবাদটা পেয়েছি স্যার সামনের বুধবার আরব এয়ার-লাইন্সে একটা party দুবাই যাচ্ছে—

পার্টি—

হ্যাঁ—চারজনের একটা পার্টি—

প্লেন কখন ছাড়বে জান?

রাত্রি সাড়ে দশটায় প্লেন ছাড়বে—

আমার information হচ্ছে—তিনজন পাচার হচ্ছে—

কিছু জান—কোথায় আছে ওরা—

অশোকা হোটেলে—৩২০ নং সুইটে—পীর মহম্মদ লোকটার নাম—

কোন দেশী লোক—

মনে হয় আরবেরই—তবে সঙ্গে আরো একজন আছে। যদিও বেশ-ভূষা কথা-বার্তায় মনে হচ্ছে ইউ পির লোক—কিন্তু আমার ধারণা আসলে তা নয়—

তা নয়?

না। মনে হয় এক বাংগালী বাবু—

বাংগালী বাবু—গণেশন যেন একটু চমকেই ওঠে বাংগালী বাবু কথাটা শুনে—বলে, ঠিক আছে এ্যান্টনী—খবরটার জন্য ধন্যবাদ—thank you—

এ্যান্টনী অতঃপর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ।

তারপর এক সময় নিস্তব্ধতা ভেঙে গণেশন বলে, একবার যাবেন নাকি মিঃ রায়—অশোকায়—

নিশ্চয়ই যাবো—কখন যাবেন—

দেরি করে কি হবে—এখুনি চলুন—গণেশন বললে।

সকলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়!

বেলা তখন সাড়ে চারটে বাজে।

অশোকা হোটেলে ৩২০নং সুইট তিনতলায়।

পীর মহম্মদ নামে লোকটার বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হবে। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা—

পরনে পায়জামা ও শেরওয়ানী।

মাথায় টুপী।

গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা। একটা গোলাপী আভা যেন তার থেকে ফুটে বের হচ্ছে।

চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সতর্ক।

মুখে নুর দাড়ি।

ঘরের মধ্যে মনে হয় যেন কারও জন্য লোকটা অপেক্ষা করছে।

সামনে একটা এ্যাটাচী কেস।

ঘরের দরজায় টুক টুক করে শব্দ হল।

কৌন—পীরমহম্মদ শুধায়—

কোনো জবাব এলো না—আবার টুক টুক করে দরজার গায়ে শব্দ হল।

পীরমহম্মদ উঠে গিয়ে দরজার এপাশে দাঁড়াল।

কৌন?

বোসবাবু—এবারে মৃদু গলায় দরজার ওপাশ থেকে সাড়া এলো।

পীরমহম্মদ দরজাটা খুলে দিল।

পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসরের এক যুবক পরনে দামী সুট—চোখে কালো গগলস। সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আগন্তুক এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

কি খবর বোসবাবু—

খবর ভাল নয়—

কেন?

পুলিস আসছে এখানে রেইড্ করতে—

পুলিস—

হ্যাঁ—শোন পীর দাদা—খবরটা পাক্কা—তুমি আর এক মুহূর্তও দেরি করো না—হোটেল ছেড়ে চলে যাও—

চলে যাব।

হ্যাঁ—আর পার তো—আজকের ফ্লাইটটা ক্যানসেল করে দাও।

কিন্তু দুবাইতে খবর দেওয়া হয়ে গিয়েছে—সুলেমান দুবাই এয়ারপোর্টে থাকবে—

জরুরি ম্যাসেজ পাঠিয়ে দাও—ফ্লাইটটা ক্যানসেল করেছ—

তাইতো বোসবাবু তুমি তো আমাকে বেশ বিপদে ফেললে—

উপায় নেই—যা বলছি তাই করো—

পীরমহম্মদ মুহূর্তকাল যেন কি ভাবল—তারপর বললে, ঠিক আছে—

মাল সরিয়ে দাও—

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি—

জুম্মা মসজিদের কাছে রহমান সাহেব আছে—তাকে আমার বলা আছে—মাল নিয়ে এখুনি তুমি সেখানে চলে যাও—নচেৎ জেনো তুমি মুস্কিলে পড়বে—

মুস্কিলে পড়ব—

হ্যাঁ—কিরীটী রায় এখানে এসেছে তোমাকে তো বলেছি—

কে লোকটা?

হুঁ, ঠিক আছে—তুমি যাও বোসবাবু—

আমার টাকাটা—

ইসমাইল তোমাকে দেবে তোমার প্রাপ্য—তার কাছেই তোমার প্রাপ্য গচ্ছিত আছে—পীরমহম্মদ বললে।

কেন—আমি তো বলেছিলামই—টাকা আজই তোমার কাছ থেকে নোব—

টাকা তোমার মার যাবে না, তুমি নিশ্চিত থাকতে পার! এসো তুমি বোসবাবু —পীরমহম্মদ আবার বললে।

কিন্তু সেরকম তো কথা ছিল না—

না—ছিল না—কিন্তু ডলার আসতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে—তুমি তো ডলারই চাও—

দু'হাজার ডলার চাই মনে আছে তো?

তাই পাবে। এসো তুমি—

বোসবাবু আর কথা বাড়ায় না। ঘর থেকে বের হয়ে যায়। পীরমহম্মদ বোস-বাবুর গমন পথের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। তারপর ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে পীরমহম্মদ পাশের ঘরে তালা খুলে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে আলো না থাকায় আবছা আবছা অন্ধকার।

ঘরের এক কোণে বোরখা পরা তিনটি নারী জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

তাদের দিকে একবার তাকাল পীরমহম্মদ—

ঘরের কোণে একটা কালো রঙের চামড়ার ছোট অ্যাটাচী-কেস ছিল তার ভিতর থেকে একটা সিরিঞ্জ ও একটা ঔষদের ফাইল বের করে সিরিঞ্জের মধ্যে ঔষধ টেনে নিল নিড্‌লের সাহায্যে।

সিরিঞ্জটা হাতে এগিয়ে গেল—দুজন নারীর হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে ঔষধ দিল—কিন্তু তৃতীয় নারীমূর্তি হাত সরিয়ে নেয়—সে নেবে না ইঞ্জেকশান।

পীরমহম্মদ জোর করে ইঞ্জেকশান দেবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না।

সে তখন সেই নারীমূর্তির মাথায় আঘাত করে ছোট একটা ডাণ্ডা দিয়ে—

নারীমূর্তি সে আঘাতে ঢলে পড়ে।

তখন পীরমহম্মদ তৃতীয় নারীর হাতেও ছুঁচ ফুটিয়ে ইঞ্জেকশান দেয়।

আরও আধঘণ্টা পরে—

গণেশন কিরীটী ও সুব্রতকে নিয়ে তার গাড়িতে পালাম এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিল।

দূর থেকে গণেশনের নজর পড়ে একটা কালো রঙের বিরাট কার তাদের কিছুটা আগে আগে পালাম হাওয়াই আড্ডার দিকে চলেছে।

গাড়িটার গতি—যেন ঝড়ের মত মনে হল।

ট্রানজিট লাউঞ্জে—গণেশন কিরীটী আর সুব্রত এসে প্রবেশ করল।

কিরীটী এদিকে ওদিক তাকায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

হঠাৎ কিরীটীর নজরে স্যুট পরিহিত একটি লোক—আরব এয়ারলাইনসের কাউন্টারের সামনে—চোখে লোকটার কালো গগলস।

কিরীটী চমকে ওঠে লোকটাকে দেখে।

গণেশন ও সুব্রতকে কোনো কথা না বলে সে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যায়—

স্যুট পরিহিত লোকটি তার টিকিট দেখাচ্ছে—

yes your name please!

Samir Bose—

লোকটা জবাব দেয়।

কথাগুলো কানে যায় কিরীটীর।

গলার স্বরেই চিনতে পারে কিরীটী—

হাতের ইশারায় ডাকে গণেশনকে কিরীটী।

গণেশন দ্রুত পায়ে কাউন্টারের সামনে এগিয়ে এলো।

কিরীটী চোখের ইশারায় গণেশনকে কিছু বলে।

আরও একটু এগিয়ে আসে গণেশন।

একেবারে সমীর বোসের পিছনে সে দাঁড়ায়।

ফিস ফিস করে কিরীটী বলে, এই সুমিত সিংহ মিঃ গণেশন।

are you sure?

cent persent! কিরীটী ফিস ফিস করে জবাব দেয়।

listen মিঃ—

গণেশনের ডাকে সমীর বোস ফিরে তাকাল।

॥ সাত ॥

সমীর বোস নয়—কিরীটী চিনতে পেরেছিল সুমিত বোসকে। সে সুমিত সিংহই।

সুমিত ফিরে কিরীটীকে দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে।

কিরীটীর ওষ্ঠ প্রান্তে মৃদু হাসি।

ঠিক ঐ সময় পীরমহম্মদ তিন বোরখা পরিহিত নারীকে সঙ্গে করে কাউন্টারের দিকে এগুচ্ছিল। সেও দূরে সমীর বোসকে দেখে ততক্ষণ থমকে দাঁড়িয়েছে।

সমীর বোসকে পীরমহম্মদ তার চুক্তি অনুযায়ী টাকা দেয়নি।

তাই বোধ করি এয়ারপোর্টে সমীর বোসকে দেখে পীরমহম্মদ চমকে উঠেছিল।

এবং সে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

গণেশনের অফিসে।

সকলকেই এ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়েছিল গণেশন।

কিরীটী সুমিত সিংহকে বলছিল, আপনি মিঃ সিংহ অসাধারণ আত্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কলকাতায় আমার কাছে গিয়েছিলেন—কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল করেছিলেন সিংহমশাই—একটা গাল-গল্প আমার কাছে ফেঁদে এসে। অবিশ্যি এখনো বুঝতে পারিনি—কেন আমার কাছে গিয়েছিলেন—যাক সে কথা—সংযুক্তা কোথায় এবার বলুন—

সুমিত সিংহ বললে, সত্যিই ভুল করেছিলাম কিরীটীবাবু।

ভুলটা ইচ্ছাকৃত নিশ্চয়ই নয়—বোধকরি আমাকে একটু যাচাই করে দেখতে চেয়েছিলেন তাই কি!

সুমিত সিংহ চুপ করে থাকে।

কি, চুপ করে আছেন কেন? বলুন আর সংযুক্তাকে আপনিই বোধ হয় তার কলেজ থেকে ফেরার পথে—

হ্যাঁ—

সংযুক্তা কোথায়? এই তিনটি বোরখা পরিহিতার একজন বোধহয়?

হ্যাঁ—

মিঃ গণেশন—

বলুন—

ওদের বোরখা উন্মোচন করতে বলুন কাউকে—

অন্য কারো প্রয়োজন হল না—ওদের মধ্যেই একজন কাজটা করল।

তাদের পরিচয়ও পাওয়া গেল—

পীরমহম্মদকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানা গেল—একটি পাটনার মেয়ে—একটি রাঁচীর ও সংযুক্তা। সকলকেই সে আরব দেশে চালান করছিল—

সুমিত সিংহ দিল্লীর এজেন্ট।

অতঃপর সকলকেই পুলিস হাজতে চালান করা হল—সতর্ক প্রহরায় রাখবার জন্য।

এ্যান্টনী না হলে পীরমহম্মদের দলের অন্যান্যদের কোনো সংবাদ তার কাছ থেকে সংগ্রহ করা গেল না।

রক্তের দাগ

ফিরতে ফিরতে রোজই রাত হয়ে যায়। কখনো সাড়ে এগারোটা—কখনো রাত বারোটাও বেজে যায়। আজও রাত হয়ে গিয়েছিল। বোধহয় রাত বারোটা বেজে গিয়েছিল। হাত ঘড়ির দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছিল সুদীপ। বাড়ির প্রায় কাছাকাছি যখন এসেছে—সেই শব্দটা কানে এলো সুদীপের। একটা জুতো পায়ে হাটার শব্দ। শব্দটা কানে যেতেই থমকে দাঁড়াল সুদীপ আজও।

আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে পিছনের শব্দটাও থেমে গেল। আর কারো হেঁটে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

সুদীপ জানে আবার সে হাঁটতে আরম্ভ করলেই পেছনে সেই শব্দটা শোনা যাবে। প্রথম প্রথম অতটা ভাবায়নি সুদীপকে ; ভেবেছে কেউ তার পিছনে পিছনে হেঁটে আসছে।

দু'দিন ধরে ওই একই শব্দ শুনে শুনে তৃতীয়দিন থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করেছিল কে তার পিছনে পিছনে হেঁটে আসছে অত রাত্রে।

কিন্তু কাউকে সে দেখতে পায়নি। যতদূর দৃষ্টি চলে একেবারে ফাঁকা রাস্তাটা। ছোট শহর। কলকাতা থেকে বেশী দূর নয়। গোটা তিনেক ষ্টেশন মাত্র।

বাঁধান রাস্তাটা সোজা ষ্টেশন থেকে কিছুদূরে এসে ডাইনে একটা বাঁক খেয়ে সোজা চলে এসেছে তার বাড়ির দিকে। ষ্টেশন থেকে দেড় মাইলের বেশী হবে না।

আগে রাস্তার দু'পাশে কোন আলোর তেমন ভালো ব্যবস্থা ছিল না। দশ পনেরো

হাত দূরে দূরে মিউনিসিপ্যালিটির লাইট পোষ্ট। তাও বেশীর ভাগ দিন বালব ফিউজ হয়ে যাওয়ায় আলোই জ্বলত না।

ইদানীং সমরেন্দ্রবাবু স্থানীয় এম-এল-এ হওয়ায় মধ্যে মধ্যে কয়েকটা লাইট পোষ্ট বসাবার পর—বেশ আলো থাকে রাস্তাটায়।

পথে যেতে যেতে দু'পাশে কিছু ঘর-বাড়ি ও দোকান-পাট আছে—কিন্তু অত রাত্রে কোন বাড়ির আলো জ্বলে না—দোকানপাটও বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তাটাও একেবারে নির্জন হয়ে যায়। বোধ হয় একমাত্র সুদীপই শেষ ট্রেনের যাত্রী।

লোকাল ট্রেন ওই সময় থাকে না। রাত এগারোটায় শেষ লোকাল ট্রেনটা চলে যায়।

পরের জংশন ষ্টেশনে মেল গাড়িটা থামে—সেই গাড়িতেই ফিরে সুদীপ পিছু হেঁটে আসে জংশন থেকে, নচেৎ ফিরবার অত রাত্রে আর কোনো উপায় নেই। জংশনটা মাইল খানেক দূরে—তাদের ষ্টেশনের আর জংশনের মাঝামাঝি জায়গাটা।

আজ দিন-দশেক হলো ওই শব্দটা শুনছে সুদীপ।

স্পষ্ট মনে আছে সুদীপের—খুনের মামলায় আদালতে সাক্ষী দেবার পর যেদিন সে ফিরে আসছে, সেইদিনই প্রথম ওই জুতো পায়ের শব্দটা সে শুনতে পেয়েছিল।

তারপর থেকে প্রতি রাত্রেই সে শুনছে ওই জুতো পায়ে চলার শব্দটা।

সুদীপ বোধহয় অভ্যাস মতই হঠাৎ থেমে আজও পিছনপানে ফিরে তাকাল একবার। না, কেউ নেই—যতদূর দৃষ্টি চলে, রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা—জনপ্রাণী নেই।

তবু আজ দাঁড়িয়ে থাকে-সুদীপ রাস্তার দিকে তাকিয়ে।

আজ আবার রাস্তার কয়েকটা আলো জ্বলছে না।

কেমন একটা আধো আলো আধো ছায়া থম থম করছে। হঠাৎ সেই আধো আলো আধো ছায়ার মধ্যে দুটো যেন নীল আগুনের মারবেল ভেসে উঠলো। নীল আগুনের মারবেল দুটো এগিয়ে আসছে তার দিকে। এমনিতে ভীতু নয় সুদীপ। কিন্তু এই মুহূর্তে হঠাৎ যেন তার সমস্ত শরীর কাঠ হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়। হঠাৎ আবার নীল আগুনের মারবেল দু'টো অদৃশ্য হয়ে গেলো। দপ্ করে যেন নীল আগুনের মারবেল দু'টো নিভে গেলো।

শীতের রাত। তবু সুদীপের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, কোথাও কিছু নেই—যতদূর দৃষ্টি চলে একটা আলো-ছায়ার থমথমানি। নিশ্চয়ই ভুল দেখেছে সুদীপ। চোখের ভুল।

সুদীপ আবার চলতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই শব্দ। হেঁটে হেঁটে কেউ যেন আসছে তার পিছনে পিছনে, ঠিক তার পেছনে। আসুক। সুদীপ আর থামবে না। পিছন ফিরে তাকাবে না। সুদীপ চলার গতি বাড়িয়ে দিল।

বাড়ির সামনা-সামনি পৌঁছে দেখে জানলা-পথে ঘরে আলোর ইশারা। ঘরে আলো জ্বলছে—রমা জেগে আছে তার জন্য আজো।

প্রথম প্রথম রমা বলতো ইদানীং এত রাত করে ফের কেন? একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পার না আগের মত?

কাজ শেষ হবে—তবে তো আসবো। এখন অনেক বেশী কাজ। সুদীপ বলতো।

কি এমন কাজ তোমার যে রাত দুপুর গড়িয়ে যায় ; একা তুমি ছাড়া বোধহয় কেউ এত রাতে আর এদিকে ফেরে না।

সুদীপ কোন জবাব দেয় না। চুপ করে রমার কথাগুলো শুনে যায়। জামা-কাপড় খুলে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। কনকনে ঠাণ্ডা তোলা ড্রামের জলে ঐ রাত্রে স্নান করে।

কতদিন বলেছে রমা—অভিযোগ তুলেছে সুদীপের অত রাত করে বাড়ী ফেরা নিয়ে। কিন্তু এখন আর বলে না। বোধহয় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে রমা ব্যাপারটায়।

কিংবা হয়ত বুঝতে পেরেছে রমা—রাত করে বাড়ী ফেরার ব্যাপারে সুদীপকে বলে কোন লাভ নেই। সুদীপ তার কথায় কান দেবে না।

অথবা রমা হয়ত সুদীপকে একই কথা বলে বলে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

হন হন করে হেঁটে এসে সুদীপ দরজার সামনে দাঁড়াল। এবং আজ বেল বাজাবার আগেই দরজাটা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে রমা।

রমা কোন কথা বলল না। দরজা খুলে দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

সুদীপ কিন্তু তখুনি ভিতরে প্রবেশ করল না।

দরজার উপর দাঁড়িয়ে পশ্চাতে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছু তার চোখে পড়ল না। শীতের মধ্য রাত্রের রাস্তাটা খাঁ খাঁ করছে। কোন জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্রও চোখের দৃষ্টিতে পড়ে না তবুও কয়েকটা মুহূর্ত সুদীপ সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

হঠাৎ রমার কণ্ঠস্বর চমকে ফিরে তাকাল।

রমা যেন কখন এসে আবার তার পাশে দাঁড়িয়েছে। বললে, কি দেখছো?

না। কই, কিছু না ত!

তবে অমন করে দেখছিলে কি?

চল। ভিতরে চল। সুদীপ বললে।

মনে মনে একটা হিসাব করছিল সুদীপ। কথাটা আজই তার মনে হয়েছে সর্ব প্রথম। ঠিক দশদিন ধরে রাত্রে বাড়ী ফিরবার সময় সে ওর পশ্চাতে পদ শব্দটা শুনছে। ঠিক দশদিন। পনেরই নভেম্বর আজ। তিন, চার ও পাঁচই নভেম্বর পর পর তিন-তিনটে দিন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আদালতে তাকে সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল তপন ঘোষের হত্যার ব্যাপারে।

আদালতের রায় বের হয়েছে কিনা জানে না সুদীপ। কোন খোঁজ রাখে নি। তবে এটা সে বুঝেছিল তার সাক্ষ্যের পর বিজিতের ফাঁসী হবে না। সোমনাথ ভাদুড়ী সেই রকমই বলেছেন। এবং সে সাক্ষ্য না দিলে হয়ত বিজিতের ফাঁসীই হতো। কারণ মৃতের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহটার সামনে সেও পড়েছিল জ্ঞান হারিয়ে। হাতের মুঠোর মধ্যে তার যে পিস্তলটা ছিল সেই পিস্তলের চেম্বারে পাঁচটি গুলি ছিল। একটি ছিল ফাঁকা। এবং ব্যালেষ্টিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। সেই পিস্তল থেকেই গুলি ছোঁড়া হয়েছিল এবং যে গুলিটা মৃতদেহ ভেদ করে গিয়ে পাশের দেওয়ালে বিঁধেছিল, সেটা ওই পিস্তল থেকেই যে ফায়ার করা হয়েছিল তাও প্রমাণিত হয়েছিল।

মৃণালের পাশের ঘরের লোকটি অবিনাশ সেন ও মেয়েটি মিনতি—তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল আদালতে। সন্ধ্যার কিছু পরে মৃণাল নামে মেয়েটির ঘরে তারা বিজিত মিত্রকে ঢুকতে দেখেছে। বিজিত মিত্র নাকি প্রায়ই মৃণালের ঘরে আসত। ঘণ্টা ২।৩ থাকত। আরো প্রমাণিত হয়েছিল—বিজিত মিত্র তপন ঘোষের সঙ্গে চোরা কারবার করত। এবং মধ্যে মধ্যে মৃণালের ঘরে ওরা দুজন কখনো একা, কখনো কখনো একত্রে যাতায়াত করত।

মৃণালের কিন্তু কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সুদীপ সাক্ষ্য দিয়েছিল আদালতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঃ যে রাত্রে দুর্ঘটনা ঘটে, সে-রাত্রে ওই পল্লীর সামনে দিয়ে সে ও বিজিত মিত্র একত্রে ফিরছিল—হঠাৎ দুজন লোক তাদের আক্রমণ করে—বিজিতের মাথায় একটা ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে। বিজিত সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়—সুদীপ ছুটে পালায় প্রাণভয়ে। কিছুদূরে গিয়ে একটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে সে দেখে সেই লোকদুটো বিজিতের জ্ঞানহীন দেহটা একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল। রাত তখন পৌনে দুটো।

কাজেই রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ যদি মৃণালের ঘর থেকে পিস্তলের আওয়াজ শোনা গিয়ে থাকে এবং ময়না তদন্তে যদি প্রমাণিত হয়ে থাকে রাত বারটা থেকে সাড়ে বারটার মধ্যে কোন এক সময় গুলির আঘাতে তপন ঘোষের মৃত্যু হয়েছে, সেক্ষেত্রে তপন ঘোষের হত্যাকারী বিজিত মিত্র হতেই পারে না। সারকামস্টানশিয়াল এভিডেন্স যেমন তার বিরুদ্ধে নেই—তেমনি আছে রিজনেবল ডাউট।

সুদীপ মকদ্দমার রায় বের হয়েছে কিনা জানে না, কিন্তু বিজিত মিত্র যে দোষী সাব্যস্ত হবে না সোমনাথ ভাদুড়ীর কথায় সেটা সে বুঝেছিল। তাছাড়া মৃণাল নামক মেয়েটির সন্ধান আজো পাওয়া যায়নি—একমাত্র হয়ত যে ছিল প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

স্নান ও আহারাদির পর সুদীপ জানালার সামনে ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে একটা

পাতলা শাল গায়ে দিয়ে বসে বসে সিগ্রেট টানছিল।

রাজ রাত আরো বেশী হয়েছে, বোধকরি রাত দুটো।

রমা রান্নাঘরের কাজ সেরে এসে পাশে দাঁড়াল, কি হলো! শুতে যাবে না?

বোসো রমা, তোমার সঙ্গে কথা আছে। সুদীপ বললো।

আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

ঘুম পাচ্ছে!

হ্যাঁ।

দাঁড়াও—আসছি। সুদীপ পাশের ঘরে গেল। আলমারি খুলে একটা স্মাগল করা স্কচ হুইস্কির ছোট চ্যাপ্টা বোতল থেকে দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল, একটু জল মেশাল কুঁজো থেকে—পরে ফিরে এলো গ্লাসদুটো হাতে পাশের ঘরে।

নিজে একটা গ্লাস নিয়ে, অন্য গ্লাসটা রমার দিকে এগিয়ে দিল সুদীপ—নাও, এটা খেয়ে নাও।

কি এটা?

খেয়ে ফেল।

না! বল কি?

বিষ নয়। খাও।

রমা আর আপত্তি জানায় না। এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে ফেলে, গলার ভিতরটা জ্বলে ওঠে।

মাগো, কি এটা—

হুইস্কি।

তুমি আমাকে মদ খাওয়ালে?

মধ্যে মধ্যে খাওয়া ভাল।

ভাল?

হ্যাঁ। শরীরের উপকার হয়। ডাক্তাররা বলেন, এ্যালকোহল ইজ দ্য বেস্ট ফুড।

রমার মাথাটা তখন যেন ঝিম ঝিম করছে।

আমার বোধহয় নেশা হচ্ছে। রমা বলল।

সুদীপ বলল—কিছু হবে না। অতটুকু হুইস্কিতে নেশা হয় না কারো।

কিছুক্ষণ বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো। বোসো ঐ চেয়ারটায়।

রমা বসলো সামনের চেয়ারটার উপরে। রমার বুকটা গরম গরম লাগছে। কান দুটোও।

জান রমা, আজ কয়দিন ধরে দেখছি বাড়ি ফেরার পথে কে যেন আমাকে ফলো করে।

ফলো করে তোমায়!

হ্যাঁ।

তা জানি না।

দেখতে পাওনি লোকটাকে?

না। তবে বুঝলে কি করে ফলো করছে কেউ তোমাকে?

করে। আমি জানি।

কিন্তু কেই বা তোমায় ফলো করবে—আর কেনই বা করতে যাবে!

হয়ত—

কি?

কেউ কিছু বলতে চায় আমায়।

কে আবার কি বলতে চাইবে তোমাকে? আর যদি বলতেই চায় ত সামনাসামনি এসে বললেই ত পারে। ফলো করবার কি দরকার?

আমার কি মনে হয় জানো রমা।

কি?

তপন ঘোষ আমাকে কিছু বলতে চায়।

তপন ঘোষ! কে সে?

আমার সঙ্গে লোকটার পরিচয় ছিল। মানে তাকে আমি চিনতাম।

তা তার সঙ্গে একদিন দেখা করে কথাটা জিজ্ঞাসা করলেই পারো।

তার যে কোন উপায়ই আর নেই।

উপায় নেই! কেন! রমা বিস্ময়ের সঙ্গেই যেন তাকায় সুদীপের মুখের দিকে।

না। তপন ঘোষ মাসতিনেক হলো মারা গিয়েছে—পিস্তলের গুলিতে।

কি বলছো তুমি আবোল-তাবোল?

এই দেখো রমা, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। আমি ঠিকই বলছি। এ তপন ঘোষ ছাড়া আর কেউ নয়।

রমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, রাত অনেক হয়েছে। এবারে শোবে চল।

আর এক পেগ হুইস্কি খাবে রমা? সুদীপ বলল।

না।

একটা কথা ভাবছি রমা।

কি?

কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট কিনবো!

ফ্ল্যাট কিনবে কলকাতায়! কি বলছো? রমার কণ্ঠে বিস্ময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, টাকা তুমি পাবে কোথায়?

ফ্ল্যাট আমি দেখেছি—এখন হাজার দশেক মত দিতে হবে, তারপর বাকী চল্লিশ হাজার টাকা মাসে মাসে ত্রিশটা ইনস্টলমেন্টে—সে হয়ে যাবে।

কিন্তু ওই দশ হাজার টাকা কোথা থেকে আসবে। রমা আবার প্রশ্ন করে।

ব্যাংকে কিছু আছে! কিছু ফিক্সড ডিপোজিট তোমার নামে আছে—আর বাকীটা ধার করবো বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে।

না, না—এই ত বেশ আছি আমরা। ফ্ল্যাট নিয়ে কি হবে?

ফ্ল্যাটটা দেখলে তোমার খুব পছন্দ হবে দেখো। বালীগঞ্জে একেবারে ষ্টেশনের কাছাকাছি। সাততলার উপরে। হু হু করে বাতাস বইতে থাকে সর্বক্ষণ। রাত্রে ট্রেনের শব্দ শুনতে পাবে। ট্রেন আসছে—যাচ্ছে—

না। ওসব ধার-কর্জর মধ্যে যেও না।

সত্যি রমা—তোমার কোন এ্যামবিশন নেই। আমি কিন্তু ফ্ল্যাটটা কিনবো ঠিক করেছি।

দেখো ধার-কর্জর মধ্যে যেও না।

চল—শুইগে। সুদীপ পা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল।

॥ দুই ॥

বিছানায় শুয়ে সুদীপের ঘুম কিন্তু আসে না। অন্ধকারে বালিশে মাথা রেখে সামনের খোলা জানালাটার দিকে চেয়ে থাকে।

সব টাকাটাই অবিশ্যি সে নগদ এখুনি দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তাহলে টাকাটার সোর্স নিয়ে গোলমাল বাধবে। ব্যাংকে মাত্র হাজার তিনেক আছে আর ফিক্সড ডিপোজিটে আছে হাজার পাঁচেক—হিসাবে মিলাতে পারবে না ; বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে আর কত সে ধার পেতে পারে, বড়জোর হাজার দু'তিন।

অথচ তার অফিসের ড্রয়ারের মধ্যে করকরে চল্লিশ হাজার টাকার নোট রয়েছে। ওই চল্লিশ আর ফিক্সড ডিপোজিটের পাঁচ—ব্যাংকের তিন—মাত্র হাজার দুই টাকা বেশী সে তো অফিস থেকেই লোন পেতে পারে। কিন্তু হিসাব মেলাতে পারবে না। চল্লিশ হাজার টাকা ধার দেবে কে তাকে। মাত্র তো তিনশো টাকা মাস মাহিনা তার। না। রমা ঠিকই বলেছে। ফ্ল্যাট কেনার এখন দরকার নেই।

ওই সময় আবার মনে পড়লো বিজিত মিত্রর কথা। কাল একবার অফিসের পর বিজিতের এ্যাডভোকেট সোমনাথ ভাদুড়ির সঙ্গে দেখা করবে। লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই যেন বুকের মধ্যে কেমন দুপ দুপ করতে থাকে।

সুদীপ শুনেছে ক্রিমিন্যাল সাইডের একজন বাঘা এ্যাডভোকেট সোমনাথ ভাদুড়ি। চশমার পুরু কাঁচের মধ্যে দিয়ে লোকটা যখন তাকায় মনে হয় যেন অপর পক্ষের পেট থেকে কথা টেনে বের করবেন। রোমশ জোড়া ভ্রূ। বয়েস প্রায় এখন সত্তরের কাছাকাছি। মাথায় সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। বেঁটেখাটো মানুষটা।

কথা বলার সময় ডান হাতে ধরা পেন্সিলটা দু' আঙ্গুলের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে নাচান। ভরাট ভারী গলা! কথা বললে মনে হয় যেন একটা জালার ভেতর থেকে কথাগুলো গম গম করে বের হয়ে আসছে। সুদীপের সাক্ষ্য দেবার কথাটা বলতে শুনে—মানুষটা এমনভাবে তার দিকে তাকিয়েছিল যেন সুদীপ কত বড় অপরাধ করে ফেলেছে।

আপনি সাক্ষ্য দেবেন?

আজ্ঞে। মানে—হঠাৎ যেন! তোতলাতে শুরু করেছিল সুদীপ সেদিন।

কি নাম আপনার বললেন যেন! রোমশ ভ্রূ যুগলের নীচে চশমার পুরু লেন্সের ওধার থেকে তাকালেন সোমনাথ ভাদুড়ি।

সুদীপ রায়।

নিহত তপন ঘোষকে আপনি চিনতেন? প্রশ্ন এলো যেন তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত—বিদ্ধ করলো সুদীপকে।

না। তবে আসামী বিজিত মিত্রকে চিনি।

চেনেন? কতদিনের পরিচয় আপনাদের?

তা বলতে পারেন অনেক দিনের। বিজিত তপন ঘোষকে মারেনি। মানে হত্যা করেনি।

হত্যা করেনি?

না। আমার সব কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন স্যার—ব্যাপারটা সব সাজান বলেই আমার মনে হয়।

বলতে চান কনককটেড?

হ্যাঁ। মানে—

কি রকম!

সুদীপ তখন আদালতে যা পরে বলেছিল সেই কথাগুলো সোমনাথ ভাদুড়িকে বলল। মন দিয়ে সুদীপের সব কথা শুনলেন সোমনাথ ভাদুড়ি।

হুঁ। তা এসব কথা আগে পুলিশকে জানাননি কেন?

ভয়ে।

কি বললেন? ভয়ে?

হ্যাঁ—বুঝতেই ত পারছেন খুনের মামলা। এই সব মামলায় কে সেধে জড়িয়ে পড়তে চায় বলুন, স্যার।

তবে আজকেই বা বলতে চান কেন?

একজন নির্দোষীর ফাঁসী হবে—

রোমশ ভ্রূর তলায় পুরু লেন্সের ওধার থেকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অতঃপর সোমনাথ ভাদুড়ি সুদীপের মুখের দিকে।

সুদীপের ওই মুহূর্তে মনে হয়েছিল সেই দৃষ্টির মধ্যে যেন সন্দেহ-অবিশ্বাস তার আপাদমস্তক জরীপ করে চলেছে।

পাবলিক প্রসিকিউটার অম্বিকা সান্যাল—তার জেরার মুখে দাঁড়াতে পারবেন ত? তিনি আপনাকে পোষ্টমর্টেম করবেন। বাঘা বাঘা সাক্ষীও তার জেরার মুখে নার্ভ হারায়।

যা সত্যি তা বলবো—ভয় পাবো কেন, আপনিই বলুন না স্যার।

ঠিক আছে, আদালতে একটা এফিডেবিট করতে হবে। যা করবার আমিই করবো। আপনার ঠিকানাটা রেখে যান। সময়মত সমন পাবেন।

সমন!

হ্যাঁ, সাক্ষীর সমন যাবে আদালত থেকে। আপনার ঠিকানাটা বলুন।

সুদীপ তার অফিসের ঠিকানাই দিয়ে এসেছিল।

চলে আসবার আগে সোমনাথ আবার শুধিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবেন না তো?

না, না।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান সুদীপ রায়কে সরকারপক্ষের কৌসুলী অম্বিকা সান্যাল রীতিমত প্রশ্নে প্রশ্নে পর্যুদস্ত করেছিলেন। অম্বিকা সান্যাল প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি তো আদালতে জবানবন্দী দিয়েছেন, বিজিত মিত্র আসামীর মাথায় পশ্চাৎ দিক ঘেঁষে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান আর আপনি ছুটে পালান?

হ্যাঁ।

ছুটে কত দূরে পালিয়েছিলেন?

সামনেই একটা গলির মধ্যে।

সেটা ঘটনাস্থল থেকে কত দূরে?

হাত আট-দশ হবে—সেই গলি থেকেই আত্মগোপন করে দেখি ব্যাপারটা—পরে ওরা বিজিতকে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়।

অত রাত্রে আপনারা কোথা থেকে ফিরছিলেন? আপনি আগে বলেছেন রাত তখন দুটো হবে।

অফিসের ইয়ার-এনডিংয়ের সময়—অনেক রাত পর্যন্ত তখন কাজ করতে হতো আমাদের—কাজ সারতে সারতে প্রায় দেড়টা হয়ে যায়—ট্রাম-বাস-ট্যাক্সী তখন কিছুই ছিল না ; তাই হেঁটে ফিরছিলাম দু'জন।

আপনি কি জানেন তপন ঘোষের সঙ্গে বিজিত মিত্র চোরাকারবারে লিপ্ত ছিল?

না।

আদালতে তা প্রমাণিত হয়েছে। আপনারা এক অফিসে, একই ডিপার্টমেন্টে

এতদিন কাজ করেছেন, এত পরিচয় ছিল তার সঙ্গে আপনার, অথচ ওই কথাটা জানতেন না? জানতেন—সবই জানতেন প্রকাশ করেননি কখনো।

ওই সময় সোমনাথ ভাদুড়ি বলে উঠেছিলেন, অবজেকশন, ইয়োর অনার।

জজ সাহেব কিন্তু অবজেকশন নাকচ করে বলেছিলেন, প্রসিড মিঃ সান্যাল।

তারপরেই প্রশ্ন করেছিলেন অম্বিকা সান্যাল, যে পথ দিয়ে অত রাত্রে ফিরছিলেন সেদিন আপনারা দুই বন্ধু—নিশ্চয়ই জানতেন তার কাছাকাছি একটা কুখ্যাত পল্লী এবং সেখানে মৃণাল নামে বারবণিতা থাকতো। সেখানে বিজিতবাবুর রীতিমত যাওয়া-আসা ছিল।

না। আমি জানতাম না।

জানতেন না?

না।

ওই পথ দিয়ে আপনি আগে আর কখনো যাতায়াত করেছেন?

ঠিক মনে করতে পারছি না। বোধহয় আগে কখনো যাইনি।

ওই রাত্রেই প্রথম তাহলে?

বলতে পারেন তাই। বিজিতবাবু বলেছিল ওই পথটা শর্টকার্ট হবে শেয়ালদহে যেতে, তাই ওই পথে যাচ্ছিলাম।

অত রাত্রে তাহলে ঠিক ঠিক ভাবে রাস্তার নামটা বললেন কি করে যদি ওই পথে কখনো আগে না গিয়ে থাকেন?

বিজিত বলেছিল।

তা অত রাত্রে শেয়ালদহের দিকে যাচ্ছিলেন কেন?

মধ্যে মধ্যে ফিরতে বেশী রাত হলে ট্রেন থাকত না। ট্রেনের লাইন ধরে আমি হেঁটে চলে যেতুম বাড়ী। তাই—

কিন্তু বিজিতবাবু বাগবাজারে থাকতেন। তিনি ওই পথে যাচ্ছিলেন কেন?

আমাকে শেয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে।

আসলে সোমনাথ ভাদুড়ি বেশ করে তালিম দিয়েছিলেন সুদীপকে কয়েক দিন—নচেৎ সুদীপ নিঃসন্দেহে গোলমাল করে বসত জেরার মুখে।

বিজিতের সঠিক সংবাদ পেতে হলে তাকে একবার ওই সোমনাথ ভাদুড়ির কাছেই যেতে হবে। একবার জানা দরকার কোর্টের রায় বের হয়েছে কিনা—আর না বের হলে কবে বেরুবে পরে জানা প্রয়োজন।

মৃণালের কথাও মনে পড়ে ঐ সঙ্গে সুদীপের।

মৃণালের ঘরে যে বিজিতের যাতায়াত ছিল সেটা সুদীপ জানত। একদিন সেও

গিয়েছিল মৃণালের ঘরে—ওই বিজিতের সঙ্গেই। মৃণালকে সেও চিনত। অবিশ্যি কথাটা যে বরাবর চেপে গিয়েছে জটিলতা এড়াবার জন্যই। বস্তুতঃ আদালতে গিয়ে বিজিতের হয়ে সাক্ষ্য দেবার কথা কখনো তার মনেও হয়নি। মামলায় জড়িয়ে পড়বার ভয়ে আদালতের ধার-কাছ দিয়েও প্রথমটা সে যায়নি।

নাঃ, ঘুম বোধহয় আজ আর আসবে না। সুদীপ শয্যার উপর উঠে বসল। কপালের পাশে শিরাদুটো দপ দপ করছে।

পাশের ছোট টুলটার উপর থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট ও লাইটারটা তুলে নিল সুদীপ। প্যাকেট থেকে একটা সিগ্রেট বের করে লাইটারের সাহায্যে অগ্নিসংযোগ করল। সিগ্রেট টানতে টানতে মনের মধ্যে সুদীপের নানা কথা আনাগোনা করতে থাকে। আদালতে হলফ করে বলে এসেছে যে তপন ঘোষকে সে চিনত না।

কথাটার সত্য-মিথ্যা আজ আর অবিশ্যি প্রমাণিত হবার কোন আশা নেই।

তপন ঘোষ আজ মৃত। পোষ্টমর্টেমের পর তার মৃতদেহটা কেওড়াতলায় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। রাত হয়ে গিয়েছিল মৃতদেহটা শ্মশানে নিয়ে যেতে। তখন পাড়া প্রতিবেশীরাই মৃতদেহটা শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিল।

সন্ধ্যা থেকে সেদিন আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছিল, প্রবল বৃষ্টি। কেউ জানে না সুদীপ সর্বাঙ্গে একটা চাদর জড়িয়ে শ্মশানে গিয়েছিল—বাইরে একটা গাছের নীচে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। কেউ তাকে দেখতে পায়নি।

হঠাৎ কে একজন তার পাশে এসে দাঁড়াল। একটি স্ত্রীলোক মাথায় দীর্ঘ গুণ্ঠন। প্রথমটায় সে জানতে পারেনি তার উপস্থিতি। জানতে পেরে কথা বলবার চেষ্টা করতেই স্ত্রীলোকটি সরে গিয়েছিল।

চকিতে যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পরে ব্যাপারটা সুদীপ কোনরকম মাথা ঘামায়নি।

সুদীপ সিগ্রেট টানতে টানতে সেই রাতের কথাটাই ভাবতে থাকে।

পরের দিন অফিস-ফেরতা সুদীপ সোমনাথ ভাদুড়ির ওখানে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। বিরাট টেবিলটার উপর একরাশ কাগজপত্র ও মোটা মোটা আইনের বই ছড়ান। ঠিক তার উল্টোদিকে একটা চেয়ারে বসেছিল আর এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি। চশমার আড়াল থেকে বুদ্ধিদীপ্ত অনুসন্ধানী চোখের দৃষ্টি যেন অন্তর বিদ্ধ করে।

মাথার চুলে বেশ পাক ধরেছে। মুখে একটা জ্বলন্ত সিগার। পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবী, গায়ে একটা দামী শাল জড়ানো।

দু'জনে মধ্যে মধ্যে কথা বলছিল।

ভৃত্য এসে ঘরে ঢুকলো, বাবু—

কি?

একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

কোথায় থেকে আসছেন—কি নাম?

নাম বললেন সুদীপ রায়।

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সোমনাথ ভাদুড়ির চোখের দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। বললেন, যা পাঠিয়ে দে।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সুদীপ এসে ঘরে ঢুকল।

আসুন—বসুন। সোমনাথ ভাদুড়ি বললেন।

স্যার, একটা সংবাদ দিতে এসেছিলাম।

কি সংবাদ?

বিজিতের মামলার রায় কি—

আজই বের হয়েছে রায়। বেকসুর খালাস পেয়েছেন আপনার বন্ধু।

পেয়েছেন?

হ্যাঁ! সুদীপবাবু!

বলুন।

বিজিতবাবু যে অপরাধী আমি জানতাম—হঠাৎ বললেন সোমনাথ ভাদুড়ি।

আজ্ঞে? থতমত খেয়ে যায় সুদীপ।

আপনি তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে।

না, না। আমি—

আপনার স্টোরিটা আগাগোড়াই কনককটেড। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন সব বুঝেও আপনাকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ালাম কেন, তাই না?

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে তখন সুদীপ সোমনাথ ভাদুড়ির মুখের দিকে।

বোবা অসহায় দৃষ্টি।

আপনি বলছেন তপন ঘোষকে আপনি চিনতেন না। বাট আই এ্যাম সিয়োর, আপনি তাকে চিনতেন ; ভাল করেই চিনতেন।

সুদীপ বোবা।

আপনাকে আমি তবু সব জেনে-শুনেও কেন আদালতে সাক্ষী দেওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম জানেন। নট ফর ইউ। একটি নিরপরাধিনী মেয়ে আমাকে বাবা বলে আমার পায়ের উপর কেঁদে পড়ে তার স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে বলেছিল বলে—শুধু সেই মেয়েটির জন্যই। যান—আর কখনো আমার ঘরে দরজা মাড়াবেন না—যান—

সুদীপ উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। বুকটার মধ্যে তখন তার যেন হিম হয়ে গিয়েছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ।

যান।

সুদীপ ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আর সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ

সোমনাথ ভাদুড়ি। তারপর এক সময় ফিরে তাকালেন সোমনাথ ভাদুড়ি তার সামনে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটির দিকে এবং বললেন, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন রায়-মশাই, এই সেই লোক যার মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে শেষ পর্যন্ত মেয়েটির স্বামীকে আমি ফাঁসীর দড়ি থেকে বাঁচাতে পেরেছি—নচেৎ আইন তাকে এমনভাবে কোণঠাসা করেছিল যে—আমিও প্রায় হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু সত্যিই যদি জানতে পারতাম—

কে সে-রাত্রে তপন ঘোষকে হত্যা করেছিল সেটাই তো! কিরীটী বলল।

হ্যাঁ—রায়মশাই।

আপনার কি মনে হয় বলুন আগে শুনি। আপনি নিশ্চয়ই একটা কিছু ভেবেছেন—কিরীটী বলল।

আমার মনে হয়—

বলুন।

সে-রাত্রে তপন ঘোষকে কে হত্যা করেছিল সম্ভবতঃ সেটা ওই সুদীপ জানে।

কেন কথাটা মনে হলো আপনার মিঃ ভাদুড়ি? কিরীটী বলল।

দেখুন রায়মশাই, সোমনাথ ভাদুড়ি বললেন, জীবনের অনেকগুলো বছর এই ক্রিমিন্যালদের নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করছি। ক্রিমিন্যালদের চরিত্রের নানাদিক দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে—অনেক ক্রিমিন্যালকে আদালতে জেরা করে আইনের মারপ্যাঁচে জেলখানা ও ফাঁসির দড়ি থেকেও বাঁচিয়ে দিয়েছি। মিথ্যা বলব না, তাতে করে এক ধরনের ভ্যানিটিরও আস্বাদ হয়ত পেয়েছি অনেক সময়। কিন্তু—

কি? সহাস্যে কিরীটী তাকাল সোমনাথ ভাদুড়ির দিকে প্রশ্নটা করে।

মানুষের বিবেক বলে যে বস্তুটি মনের মধ্যে আছে, তার কাছে আমাকে জবাবদিহি দিতে হয়েছে। কিন্তু এই কেসটা যেন অন্য ধরনের। বিজিত মিত্র যে নিরপরাধ, মনে মনে কথাটা আমি হয়ত বিশ্বাস করেছিলাম—কিন্তু কেসের প্রমাণাদি তাকে এমনি কোণঠাসা করে দিয়েছিল যে আমি যেন আমার সামনে কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আইনের সাহায্যে কোন পথ ধরে লোকটাকে মুক্ত করে আনতে পারি, ওই সঙ্গে বিজিত মিত্রের স্ত্রীর চোখের জল আর কাকুতি আমাকে যেন অস্থির করে তুলেছিল। এমন সময় ওই স্ক্রাউনড্রেলটা এলো—বাধ্য হয়েই কতকটা ওকে আমি গ্রহণ করলাম বিজিত মিত্রকে বাঁচাবার জন্যই। কিন্তু মনের কাছে কিছুতেই যেন সহজ হতে পারলাম না।

ভাদুড়িমশাই, কিরীটী বললে, সব সময়ই আমাদের মন কি সত্য কথা বলে! এমনও তো হতে পারে আপনি যা ভাবছেন তা সত্য নয়। সত্যই হয়ত বিজিত মিত্র হত্যাকারী।

কিন্তু—

কিরীটী বলতে লাগল, ওই সুদীপ রায় লোকটি সত্যিই তার বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ফাঁসীর দড়ি থেকে?

ভেবেছি, আমি অনেক ভেবেছি কথাটা রায়মশাই—কিন্তু তবু আপনি যা বলছেন সেটা মেনে নিতে যেন পারিনি।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, ঠিক আছে। যদিও অনেকটা দেরী হয়ে গিয়েছে, আমাদের একটিবার চেষ্টা করে দেখতে কোন ক্ষতি নেই। মামলার সমস্ত রিপোর্টই তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে আছে।

হ্যাঁ, আছে—সম্পূর্ণ মামলার নথিটা আমি একটা ফাইল করে রেখেছি আপনার এখানে আসবার পূর্বেই। এই সেই নথি—বলে একটা বিরাট ফাইল এগিয়ে দিলেন সোমনাথ ভাদুড়ি কিরীটীর দিকে।

কিরীটী হাত বাড়িয়ে ফাইলটা টেনে নিল।

ভাদুড়ি আবার বললেন, আমি জানি ওই ফাইলটা খুঁটিয়ে পড়লেই হয়ত আসল সত্যটা আপনার দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কিরীটী বললে রাত হলো, তাহলে উঠি ভাদুড়িমশাই।

উঠবেন?

হ্যাঁ।

কিরীটী উঠে দাঁড়ালো।—একপক্ষে ভালই হলো। ঘটনাচক্রে লোকটিও আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তবে এটুকু অস্পষ্ট নেই আমার কাছে যে, বিজিত মিত্র ছাড়া পেল কিনা কেবল সে কথাটুকু আপনার মুখ থেকে শোনবার জন্যই আজ লোকটি এখানে আসেনি।

সত্যিই বলছেন?

হ্যাঁ—মামলার রায় যে এখনো বের হয়নি সেটা অনুমান করতে পেরেছিল আর রায় বেরুলে সেটাও সে খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদ থেকেই একদিন-না-একদিন জানতে পারত। লোকটা কেন এসেছিল জানেন ভাদুড়িমশাই?

কেন?

আপনি নিজে তার সাক্ষ্যদানের ব্যাপারটা কিভাবে নিয়েছেন সেটাই জানবার জন্য।

সত্যি বলছেন?

মনে ত হয় তাই। আচ্ছা চলি—

কিরীটী গাড়িতে উঠে বসল। সর্দারজী গাড়ী ছেড়ে দিল।

সোমনাথ ভাদুড়ি কিন্তু আরো কিছুক্ষণ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই রইলেন।

॥ ৩ ॥

গৃহে ফিরতেই কৃষ্ণা শুধাল, হঠাৎ সোমনাথ ভাদুড়ি তোমাকে ফোন করে ডেকেছিলেন কেন?

কিরীটী মৃদু হেসে বললেন, চল, আগে খেয়ে নেওয়া যাক।

আহারাদির পর দু'জনে এসে বসবার ঘরে দুটো সোফায় মুখোমুখি বসল। জংলী এসে দু'কাপ কফি রেখে গেল। কফির পাত্র শেষ করে কিরীটী একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল।

বাইরে শীতের রাত্রি—ঝিমঝিম করছে যেন।

কিরীটী একসময় বললে, ভাদুড়িমশাই একটা খুনের মামলার ব্যাপারে আমাকে ডেকেছিলেন। তবে আদালতে এক প্রস্থ ব্যাপারটা চরম নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে—মানে আজ আদালত তার রায় দিয়েছে—হত্যাকারী বলে যে ব্যক্তি ধৃত হয়েছিল—দীর্ঘদিন ধরে যার বিচার হয়েছে—আদালত তাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে মুক্তি দিয়েছে।

তবে?

সেই তবেই ভাদুড়িমশাইয়ের প্রশ্ন, কৃষ্ণা।

বুঝলাম না ঠিক। কৃষ্ণা বলল।

মামলায় আসামীর বিরুদ্ধে এমন সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ছিল যে সোমনাথ ভাদুড়ির মত দুঁদে ল-ইয়ার ও হালে পানি পাচ্ছিলেন না। এমন সময় এক সাক্ষীর আবির্ভাব—

কি রকম?

সে এসে সোমনাথ ভাদুড়িকে বলল, আসামী নির্দোষ—সে সাক্ষী দেবে! সোমনাথ ভাদুড়ি কিন্তু খুশি হলেন না—যদিও আসামীর স্ত্রীর চোখের জলের মিনতিতে তিনি তখন রীতিমত বিচলিত—আপ্রাণ চেষ্টা করছেন আইনের কোন ফাঁক বের করতে, যাতে করে আসামীকে মুক্ত করে আনতে পারেন।

তারপর—

আসামী ওই লোকটির সাক্ষীর জোরেই শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেল—কিন্তু ভাদুড়ি-মশাইয়ের মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব থেকে গিয়েছে।

কিসের দ্বন্দ্ব!

সাক্ষী যা বলছে তা পুরোপুরি সত্য নয়। দেখে যা বুঝলাম, তা হচ্ছে—

কি?

ওই সাক্ষীকেই সোমনাথ ভাদুড়ি সন্দেহ করছেন।

সত্যি?

হ্যাঁ।

ওই ফাইলটাই বোধহয় সেই মামলার? কৃষ্ণা শুধালো।

হ্যাঁ।

রাত্রের ঘুমও তাহলে গেল আজ—

না, না—তুমি শুয়ে পড়গে কৃষ্ণা—আমি ফাইলগুলো একটু উল্টেই আসছি।

ঠিক আছে। বেশি দেরী করো না কিন্তু।

কিরীটী সহধর্মিণীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

ফাইলের টাইপ করা পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতেই অন্যমনস্কভাবে একটা পাতায় এসে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো।

আদালতের প্রশ্ন ঃ আপনার নাম?

উত্তর ঃ শ্রীমতী দেবিকা মিত্র।

আসামীর কাঠগড়ায় যে দাঁড়িয়ে আছে আপনি চেনেন?

চিনি। আমার স্বামী।

কত দিন আপনাদের বিবাহ হয়েছে?

সাত বছর।

ছেলেপুলে?

না। কোন সন্তান হয়নি আদৌ।

সন্তান চান না আপনারা?

চাই বৈকি।

তা কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেননি?

নিয়েছিলাম। ডাঃ গোরাচাঁদ নন্দী, স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ।

তিনি কি বলেছিলেন পরীক্ষা করে?

বলেছিলেন—

বলুন!

আমাদের নাকি কখনো কোন সন্তানাদি হবার আশা নেই।

কেন?

তা তিনি বলেন নি।

কিরীটী দ্রুত কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টে গেল। নিশ্চয়ই আদালত ডেকেছিল ডাঃ নন্দীকে তার সাক্ষ্য দেবার জন্য। তার অনুমান মিথ্যা নয়। পাওয়া গেল—ডাঃ নন্দীর সাক্ষ্যদান অন্য এক পৃষ্ঠায়।

আদালতের প্রশ্নে ডাঃ নন্দী তাঁর পুরাতন রেকর্ড দেখে বলেছেন, ওদের সন্তান হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কারণ—বিবাহের আগেই বিজিত মিত্র কুৎসিত এক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু তখন চিকিৎসা করেননি ভদ্রলোক—ফলে সেই রোগ স্ত্রীর দেহে সংক্রামিত হয়, পরে অবিশ্যি বেশ কিছুদিন পরে চিকিৎসা করান দু'জনই। কিন্তু ঐ রোগ যা ক্ষতি করবার করে দিয়েছিল—স্বামীর প্রজনন-শক্তি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আদালতের প্রশ্ন, আপনি কথাটা বলেননি ওদের?

স্বামীকে বলেছিলাম।

চিকিৎসা কোনোরকম করেননি?

করেছিলাম কিন্তু কোন ফল হয়নি।

লোকটির চরিত্র কিরীটীর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিরীটী একটা সিগারেট-এ নতুন করে অগ্নিসংযোগ করে।

দেওয়াল-ঘড়িটা ঢং করে শব্দ তুলে থেমে গেল সময়ের সমুদ্রে।

বাইরে শীতের ঝিম ঝিম রাত।

কিরীটী আবার অন্যমনস্কভাবে ফাইলের পাতা ওল্টাতে থাকে, আর মনের মধ্যে তার অলক্ষ্যে একটা অদেখা মানুষের ছবি যেন একটু অন্ধকারে স্পষ্ট আকার নিতে থাকে, আজ রাত্রেই সোমনাথ ভাদুড়ির মুখ থেকে শোনা কাহিনী থেকে।

মানুষটার চেহারা—সোমনাথ ভাদুড়ি বলেছিলেন, অত্যন্ত সাদা-মাটা—মোস্ট আনইমপ্রেসিভ যাকে বলে। গালদুটো ভাঙ্গা—কিছুটা যেন গর্তে ঢোকান। পাতলা ভ্রূ। গোল বর্তুলাকার দুটি চক্ষু। কিন্তু চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। গালের হনুদুটো বদ্বীপের মত যেন ঠেলে উঠেছে।

মাথায় পাতলা চুল। শরীরটার উপর মনে হয় অনেক অত্যাচার হয়েছে।

কিন্তু আপনাকে ত আগেই বলেছি রায়মশাই, এই হত্যা-মামলা আমার হাতে নেবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, নিতামও না, কিন্তু মেয়েটি এসে হঠাৎ একদিন আমার চেম্বারে এসে দু'পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে পড়ল।

কে? কি ব্যাপার? আরে, উঠুন—উঠুন।

আমার স্বামীকে আপনি বাঁচান, বাবা।

উঠুন—বলুন কি হয়েছে আপনার স্বামীর?

না। আগে বলুন দয়া করবেন।

কি হয়েছে আপনার স্বামীর?

খুনের মামলার আসামী সে আজ।

খুনের মামলা!

হ্যাঁ, বাবা ; আমার স্বামীর চরিত্রের মধ্যে যত দোষই থাক—সে ওই পতিতাটাকে খুন করেনি।

উঠে বসুন। ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন।

আগে আমাকে কথা দিন!

ঠিক আছে, তুমি উঠে বসো।

মেয়েটি উঠে বসে মাথার ঘোমটা খুলে দিল। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে—কিন্তু মধ্য যৌবন অতিক্রান্ত হতে চললেও যেমন এখনও দেহের বাঁধুনি, তেমনি রূপ, রূপের যেন অবধি নেই। দু'চোখে অবিরত অশ্রু ঝরে চলেছে।

মেয়েটি বলল, বাবা, এ সংসারে আমার আর কেউ নেই—ওই স্বামী ছাড়া। গরীবের মেয়ে। দয়া করে উনি আমাকে বিয়ে না করলে হয়ত শেষ পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে হতো—কিংবা—

কি নাম তোমার স্বামীর?

বিজিত মিত্র।

সোমনাথ ভাদুড়ির মনে পড়লো মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই আদালতে এক এ্যাডভোকেটের মুখে শুনেছিলেন ওই কেসটা সম্পর্কে।

বিচার চলছে তার আদালতে।

মেয়েটি তখন আবার বলল, বাবা, আপনার ফিস দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তবু এসেছি আপনার কাছে—এই গরীবকে দয়া করুন।

সোমনাথ ভাদুড়ি বলেছিলেন, তুমি দু'দিন বাদে এসো।

বাবা!

বললাম ত দিন দুই বাদে এসো।

মেয়েটির হাতে দু'গাছি সোনার বালা ছিল। সে দুটি হাত থেকে খুলতে দেখে সোমনাথ ভাদুড়ি বাধা দিলেন, কি করছো—

মেয়েটি বলল, বাবা, এই বালা জোড়া রাখুন ; এ দুটো বেচে—

না—ও তুমি হাতে পরে নাও, কোন টাকা-পয়সা লাগবে না তোমার। কি নাম তোমার?

দেবিকা।

মেয়েটি সোমনাথ ভাদুড়ির পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল।

সোমনাথ ভাদুড়ি পরে বললেন, পরের দিন আদালতে যে ঘরে মামলাটা চলছিল সে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। আসামীর কাঠ গোড়ায় লোকটি দাঁড়িয়েছিল, ভেরি ফারস্ট সাইটেই আমার মনে হয়েছিল রায়মশাই, লোকটা দুশ্চরিত্র এবং যে কোন ক্রাইমই ওর দ্বারা সম্ভব। ভাঙ্গা গাল, হনুদুটো ঠেলে উঠেছে। বাঁদিককার গালে একটা জড়ুল আছে—সেই জড়ুলে গোটা দুই বড় বড় লোম।

কিরীটী মনে মনে ভাবে, ভাদুড়িমশাইয়ের অনুমান হয়ত মিথ্যা নয়, তপন ঘোষকে যখন হত্যা করা হয় সে রাত্রে ওই বিজিত হয়ত সেখানে উপস্থিত ছিল।

মৃণাল মেয়েটি একটি বারবণিতা। দুশ্চরিত্রা মেয়ে।

অনেকেই রাতে তার ঘরে যেত। তাদের দলে হয়ত বিজিত, সুদীপ ও তপন ঘোষ ছিল। তারাও হয়ত ওই মৃণাল নামে বারবণিতার ঘরে যাতায়াত করত।

সুদীপ যে তার জবানবন্দীতে বলেছেন তপন ঘোষকে সে চিনত না, কথাটা হয়ত মিথ্যা। মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার ভয়েই হয়ত সুদীপ সত্য কথাটা প্রকাশ করেনি।

তাছাড়া সত্যিই যদি সুদীপ সম্পূর্ণ নির্দোষ থাকত—বন্ধু ও সহকর্মীকে বাঁচানোর জন্য সে অনেক আগেই বিজিতের নির্দোষীতা প্রমাণের চেষ্টা করত।

সম্ভবত ওই খুনের ব্যাপারে সুদীপ জড়িত ছিল বলেই কোন-না-কোন ভাবে প্রথমটায় সে আদালতের ধারে কাছেও যায়নি।

পরে যে সে সোমনাথ ভাদুড়ির কাছে গিয়ে সাক্ষী দেবার কথা বলেছে ওই মামলায়, তার পশ্চাতেও হয়ত কোন কারণ ছিল।

কোন গূঢ় স্বার্থ!

যাহোক, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সুদীপ এবং বিজিত দু'জনাই ওই হত্যা মামলার সঙ্গে জড়িত।

ওই হত্যা-মামলার সবচাইতে বড় প্রশ্ন হচ্ছে ওই বারবণিতা মেয়েটি—মৃণাল।

গুলির শব্দের পর পাশের ঘরের লোকেরা ভীত হয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে দেখে তপন ঘোষ মৃত, রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে আর তার পাশে জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে আছে বিজিত মিত্র।

তার জামা-কাপড়ে রক্তের দাগ।

হাতে ধরা পিস্তল একটি। যে পিস্তল থেকে গুলি চালিয়েই তপন ঘোষকে হত্যা করা হয়েছিল এবং ঘরের মধ্যে মৃণাল নামে মেয়েটি নেই।

মৃণাল একেবারে উধাও।

কোথায় গেল মৃণাল?

সে কি পালিয়েছে—না কারোর পরামর্শে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে? যদি কারো পরামর্শেই গা ঢাকা দিয়ে থাকে তো কার পরামর্শে?

পুলিশ নাকি এখনো চারিদিকে মৃণালকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সোমনাথ ভাদুড়ির ধারণা—মৃণাল হত্যাকারী নয়। তবে সম্ভবতঃ মৃণাল হয়ত হত্যা করতে দেখেছে।

কিগো, আজ কি শুতে যাবে না?

কৃষ্ণার গলা শুনে কিরীটী তাকাল কৃষ্ণার মুখের দিকে।

কিরীটী বলল, অনেক রাত হয়েছে, না!

অনক রাত মানে—সোয়া তিনটে বাজে।

বল কি!

চল। এবার একটু শোবে চল।

আর কি ঘুম হবে কৃষ্ণা, বেড়াতে বেরুবার সময় হলো।

সারাটা রাত না ঘুমিয়ে এখন বেড়াতে বেরোবে। কৃষ্ণা বললে।

তাহলে আজ আর না হয় না-ই বেড়াতে বেরুলাম। জংলীকে বলো কফি দিতে।

কৃষ্ণা কোন কথা বললো না, ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

জংলীকে তোলেনি কৃষ্ণা, নিজেই কফি ক'রে নিয়ে এলো দু'কাপ।

কফির কাপটা কিরীটীর হাতে তুলে দিয়ে মুখোমুখি অন্য একটা সোফায় বসলো কৃষ্ণা।

রাত্রি শেষের ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে।

হাওয়ায় এখনো বেশ শীতের আমেজ আছে—যদিও ফাল্গুন মাস পড়ে গিয়েছে।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে কৃষ্ণা বললে, দেখ, ভাবছিলাম কিছুদিনের জন্য এ সময় বেনারস গিয়ে ঘুরে এলে কেমন হয়, ঠাণ্ডা আছে কিন্তু তীব্রতা নেই।

তা মন্দ হয় না—কিন্তু—

ভাদুড়িমশাইয়ের মামলার কথা ভাবছো?

হ্যাঁ। মানে—

ওখানে বসেই না হয় ভাববে।

কেবল ভাবলেই ত হবে না, একটা কনক্লুশনে পৌঁছাতে হবে ত।

কৃষ্ণা হেসে বললে, বাবা বিশ্বনাথের চরণে বসে দেখো তোমার কনক্লুশন ঠিক এসে যাবে। তাছাড়া—

কি থামলে কেন, বল। কথাটা বলে কিরীটী কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাল।

তোমার কাহিনীর ঐ মৃণাল মেয়েটি—এমনও হতে পারে শেষ-মেশ গিয়ে ঐ বিশ্বনাথের চরণেই আশ্রয় নিয়েছে—

মৃণালের জন্য আমি তত ভাবছি না কৃষ্ণা।

ভাবছো না।

না। ঘটনাস্থলে সে উপস্থিত ছিলই সে-রাত্রে। কাজেই নিহত তপন ঘোষের দু'এক ফোঁটা রক্ত কি তার গায়ে আর লাগেনি। লেগেছে নিশ্চয়ই—সে-রক্তের দাগ সে মুছবে কেমন করে। সেই রক্তের দাগ থেকেই ঠিক তাকে আমি চিনে নিতে পারবো। যাকগে সে কথা। তুমি টিকিটের ব্যবস্থা করো—আমরা যাবো।

ঠিক ত?

ঠিক।

পরের দিন বিকালে।

কিরীটী আবার গোড়া থেকে মামলার কাগজগুলো পড়ছিল—সোমনাথ ভাদুড়ি আদালত ফেরতা এসে কিরীটীর গৃহে হাজির হলেন।

আসুন, আসুন ভাদুড়িমশাই। মনে হচ্ছে কোন সংবাদ আছে!

ভাদুড়ি একটা সোফায় বসতে বসতে বললেন, সংবাদটা বোধহয় তেমন কিছু নয় রায়মশাই। তবু মনে হলো—আপনাকে যাবার পথে জানিয়ে যাই—তাই এলাম।

কিরীটী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে।

আজ দুপুরে আদালতে বিজিতের স্ত্রী—

কে দেবিকা—

হ্যাঁ। দেবিকা এসেছিল আমার কাছে।

কেন?

বিজিত নাকি ঘরে ফিরে যায়নি জেল থেকে খালাস পাবার পর।

যায়নি!

না সে জানত না বিজিত ছাড়া পেয়েছে। আজ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারে গতকালই বিকালের দিকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে আদালতের রায় বেরুবার পরই বেলা পাঁচটা নাগাদ। কিন্তু আজও সে ঘরে ফেরেনি—তাই দেবিকা এসেছিল আদালতে আমার সঙ্গে দেখা করতে ; আমি তখন অমিয়নাথবাবুকে ফোন করি।

তিনি কি বললেন?

জেল গেটের অদূরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এক ভদ্রমহিলা নাকি অপেক্ষা করছিলেন—

ভদ্রমহিলা!

জেলের প্রহরী সেই রকমই বলেছে। ভদ্রমহিলার মাথায় নাকি ঘোমটা ছিল। গায়ে একটা ব্লু রংয়ের র‍্যাপার ছিল।

তারপর—

বিজিত মিত্র জেল থেকে বেরিয়ে যখন রাস্তার দিকে চলেছে, ভদ্রমহিলা ট্যাক্সি থেকে নেমে বিজিতের নাম ধরে ডাকতেই সে সোজা গিয়ে ট্যাক্সিতে নাকি উঠে বসে। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে।

হ্যাঁ।

কিন্তু সেই মহিলা ঠিক ওই সময়ই বিজিত মিত্রকে ছাড়া হবে জানলেন কি করে। কিরীটীর প্রশ্ন।

ঐ ভদ্রমহিলাই কিনা জানা যায়নি তবে আগের দিন নাকি এক ভদ্রমহিলা বেলা পাঁচটা নাগাদ এসেছিলেন জেলখানায়—জেলারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। জেলারের মুখ থেকেই নাকি সে শুনেছিল আদালতের রায় তাকে মুক্তি দিলেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে জেল থেকে।

মামলার রায় পরের দিনই বেরুবে আপনার অমিয়বাবু কি জানতেন?

জানতেন আর এও জানতেন বিজিত মিত্র বেকসুর খালাস পাবে।

কি করে জানলেন?

আমিই বলেছিলাম।

আপনি?

হ্যাঁ। অমিয়বাবু যেদিন রায় বের হয় তার আগের দিন সকালে আমাকে ফোন করেছিলেন।

আশ্চর্য!

কি?

হঠাৎ অমিয়বাবু আপনাকে ফোন করতে গিয়েছিলেন কেন, বিশেষতঃ ওই বিচারাধীন কয়েদী সম্পর্কে। কথাটা তাকে জিজ্ঞাসা করেন নি?

না।

কিরীটী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে, চলুন।

কোথায়?

অমিয়বাবুর কোয়ার্টারে—তার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

বেশ চলুন। কিন্তু এখনি যাবেন?

হ্যাঁ।

সোমনাথ ভাদুড়ি উঠে দাঁড়ান।

জেলের নিকটেই অমিয়বাবুর কোয়ার্টার। অমিয়বাবু গৃহেই ছিলেন। সোমনাথ ভাদুড়ি কিরীটীকে নিয়ে এসে তার গৃহে প্রবেশ করলেন।

অমিয় চক্রবর্তী তার বসবার ঘরে বসে ওইদিনকার সংবাদপত্রটা পড়ছিলেন। বয়স অনুমান চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশের মধ্যে হবে তাঁর।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল চেহারা। এক জোড়া বেশ ভারি গোঁফ। লম্বা জুলপী, জুলপীর চুলে কিছু কিছু পাক ধরেছে। চোখে চশমা।

সোমনাথ ভাদুড়িকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সহাস্যে সম্বোধন করলেন, মিঃ ভাদুড়ি যে—আসুন—আসুন। তারপরই কিরীটীর প্রতি নজর পড়াতে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

পরিচয় করিয়ে দিই অমিয়বাবু—

অমিয়বাবু বললেন, পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না মিঃ ভাদুড়ি। সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও আমি ওঁকে চিনি। আর ওঁকে চেনে নাই বা কে?

কিরীটীবাবু বসুন—বসুন।

সোমনাথ ভাদুড়ি ও কিরীটী উপবেশন করে।

অমিয়বাবু! সোমনাথ বললেন।

বলুন।

তপন ঘোষ হত্যা-মামলার আসামী বিজীত মিত্রকে কাল বিকালে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ—আপনাকে ত সে-কথা বলেছি।

সেজন্য আমরা আসিনি অমিয়বাবু। এসেছি অন্য একটা ব্যাপারে, কিরীটী এবার কথা বললে।

কি বলুন ত?

পরশু, মানে বিজিতবাবুকে যেদিন ছেড়ে দেওয়া হয় তার আগের দিন এক ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?

হ্যাঁ—আমার কোয়ার্টারে—বিজিতবাবুর সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করতে। মানে

যদি সে আদালত থেকে মুক্তি পায় ত কখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে—সেটাই জানতে।

সেই মহিলার ঠিক বয়স কত হবে বলে আপনার মনে হয় অমিয়বাবু? প্রশ্ন করল কিরীটী।

বোধহয় ৩০/৩২ হবে। দোহারা পাতলা চেহারা, বেশ সুন্দর দেখতে। পরনে একটা দামী শাড়ি, পায়ে চপ্পল।

আচ্ছা অমিয়বাবু, তার চেহারার মধ্যে বিশেষ কিছু আপনার নজরে পড়েছিল কি? কিরীটী প্রশ্ন করল।

না। সেরকম ত কিছু মনে পড়ছে না। তবে—

কি? কিরীটী সোৎসুক ভাবে তাকাল অমিয়বাবুর মুখের দিকে।

আমার নজরে পড়েছিল তার বা হাঁতে উল্কিতে লেখা ছিল একটা ইংরেজী অক্ষর 'এম'।

'এম'! কথাটা মৃদু গলায় উচ্চারণ করে কিরীটী সোমনাথের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ! অমিয়বাবু বললেন।

আর কিছু—তার মুখের ঢংটা?

না। তার মুখটা আমি দেখতে পাইনি।

কেন?

মুখে ঘোমটা ছিল। চিবুকটা কেবল নজরে পড়েছে। উপরের ও নীচে ঠোঁট ও চিবুকের কিছুটা অংশ।

তার চলার বা বসবার—দাঁড়াবার ভঙ্গি?

না। আমি সেটা তেমন লক্ষ্য করিনি কিরীটীবাবু। আর তিনি বসেননি—আগাগোড়া দাঁড়িয়েই ছিলেন মুখে ঘোমটা টেনে। মনে হচ্ছিল তিনি যেন আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক।

তার নামটা জিজ্ঞেস করেন নি? কোন পরিচয় দেননি?

নাম বলেননি। আমি জিজ্ঞাসাও করিনি। তবে অবিশ্যি বলেছিলেন তিনি বিজিতবাবুর স্ত্রী।

কিরীটী সোমনাথ ভাদুড়ির দিকে তাকাল।

দু'জনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

চলুন ভাদুড়িমশাই, এবার যাওয়া যাক। কিরীটী বলল।

॥ চার ॥

ধন্যবাদ জানিয়ে অমিয়বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দু'জনে বের হয়ে এলেন।

গাড়িতে উঠতে উঠতে কিরীটী বললে, আপনি তো দেবিকাকে দেখেছেন ভাদুড়ি-মশাই?

হ্যাঁ। আজও তো মেয়েটি আদালতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কখনো সে মাথায় ঘোমটা দিয়ে আসেনি। তাছাড়া তার হাতে কোন উল্কি দেখিনি। তার রং অবিশ্যি ফর্সাই। আমার মনে হয় সে দেবিকা নয় রায়মশাই।

আমার তাই অনুমান। কিরীটী বললে, তাই ভাবছি কে হতে পারে মেয়েটি?

ভাদুড়িমশাই।

বলুন। মৃণালের চেহারার কোন ডেসক্রিপশন আপনার জানা আছে?

মেয়েটিকে তো আমরা কেউ দেখিনি।

আচ্ছা, ঘটনার দিন পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক ও মেয়েটি ছিল?

অবিনাশ সেন আর মিনতি দত্ত।

মেয়েটির নাম মিনতি দত্ত?

হ্যাঁ।

সে মেয়েটি তো মৃণালের পাশের ঘরেই থাকত। সেও রূপোজীবিনী ছিল।

তার সাক্ষীও ত নেওয়া হয়েছে আদালতে।

জানি। আমি বলছিলাম—

কি বলুন?

মৃণালের ডিটেলস ওই মিনতির কাছে পাওয়া যেতে পারে।

তা অবিশ্যি পারে। তা এখনো ত বেশী রাত হয়নি। সেই পল্লীটা একবার ঘুরে যাবেন নাকি? সোমনাথ ভাদুড়ি বললেন।

গেলে আমার মনে হয় ভালোই হতো।

বেশ চলুন।

সোমনাথ ভাদুড়ি ড্রাইভার সমরেশকে বললেন, কলেজ ষ্ট্রীটে যে শিবমন্দিরটা আছে সেইদিকে যেতে।

গলিটা এককালে কুখ্যাত ছিল। বর্তমানে অবিশ্যি আর ততটা নেই—তাহলেও সেখানকার পুরাতন বাসিন্দারা কিছু কিছু সেখানে এখনো ছড়িয়ে আছে।

গলির মধ্যে গাড়ি নিলেন না সোমনাথ ভাদুড়ি। ট্রাম রাস্তার উপরেই একপাশে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দু'জনে হেঁটে চললেন। সন্ধ্যার পর থেকেই গলিটাতে মানুষের চলাচল যেন বৃদ্ধি পায়।

সোমনাথ ভাদুড়ি বাড়িটা ঠিক চিনতেন না কিন্তু বাড়ির নম্বরটা মনে ছিল।

নম্বরটা খুঁজে পেতে দেরি হল না।

একটা দোতলা লাল রংয়ের পুরানো বাড়ি!

মিনতিকে একটি মেয়ে ডেকে দিল।

মিনতি বোধহয় ঘরে বসে সাজ-সজ্জা করছিল। ডাক শুনে বের হয়ে এলো।

কিরে চাঁপা!

এই ভদ্রলোক দুটি তোকে খুঁজছেন।

মিনতি তাকাল। সোমনাথ ভাদুড়িকে আদালতে দেখেছে। চিনতে তার কষ্ট হলো না। বললে, উকিলবাবু—

মিনতি, তোমার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা আছে।

মিনতি মুহূর্তকাল যেন কি ভাবলো। তারপর বললে, আসুন উকিলবাবু ঘরে।

তিনজনে মিনতির ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরটি বেশ গোছান। ছিমছাম।

একদিকে একটি পালঙ্ক পাতা। উপরে ধবধবে শয্যা পাতা। দুটি দুটি চারটি মাথার বালিশ, একটা মোটা পাশ বালিশ।

একধারে একটি কাঁচের পাল্লাওয়ালা আলমারী। কিছু রূপার, কাঁচের ও কাঁসার বাসন পত্র। নানা ধরনের পুতুল, খান দুই চেয়ারও আছে একধারে।

বসুন উকিলবাবু। একটু চায়ের যোগাড় করি।

না, না—মেয়ে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। সোমনাথ ভাদুড়ি বললেন চেয়ারে বসতে বসতে।

মিনতি আর কথা বলে না। ওদের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকায়।

মিনতি—

বলুন!

এই ভদ্রলোক তোমাকে মৃণালের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান। সোমনাথ ভাদুড়ি বললেন।

কিরীটী দেওয়ালে একটা ফটোগ্রাফের দিকে তাকিয়েছিল। সেই ফটোর দিকে তাকিয়েই কিরীটী প্রশ্ন করল, ওই ফটোটার একজনকে তো চিনতে পারছি—মনে হচ্ছে তুমিই তাই না?

মিনতি বললে, হাঁ, আমিই। আমার পাশে—

তোমার বোন বা কোন আত্মীয় বুঝি? কিরীটী বললে।

না। আমার পাশে ওই মৃণাল। মিনতি বললে।

মৃণাল। মানে যে মেয়েটি—

ঠিকই ধরেছেন যে মৃণালকে নিয়ে এতদিন ধরে মামলা চললো। যার খোঁজ পাওয়া যায়নি—

ফটোটা কবেকার তোলা? কতদিনের?

তা প্রায় দু' বছর হবে। হঠাৎ একদিন মৃণালের খেয়াল হলো একটা ফটো তুলবে আমাকে নিয়ে—কথাটা বলতে বলতে মিনতির চোখ দু'টি ছলছল করে ওঠে।

বছর দুই আগেকার ওই ফটো তাহলে!

হ্যাঁ। মৃণালই একদিন আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে হ্যারিসন রোডের একটা স্টুডিও থেকে ফটো তোলা হয়। একটা কপি তার ঘরে ছিল—অন্যটা আমার ঘরে বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু—

কি?

পুলিশের লোক খানা তল্লাসী করতে এলে ফটোটা কিন্তু ঘরে পায় না। মনে হয় এই বাড়ি ছেড়ে সে-রাত্রে যাবার আগে ফটোটা সে সঙ্গেই নিয়ে গিয়েছে।

পুলিশ সেদিন তোমার ঘরখানা তল্লাসী করেনি?

করেছিল।

ওই ফটোটা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেনি?

না।

মৃণাল সঙ্গে মনে হচ্ছে তোমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল, তাই না?

ঠিক ধরেছেন, পুলিশকেও বলেছি—আপনাকে তো বলেছি, মৃণাল অত্যন্ত লক্ষ্মী ও শান্ত স্বভাবের ছিল। এ বাড়িতে একমাত্র আমার সঙ্গে ছাড়া কারো সঙ্গে মিশতো না, কথা বলত না বড় একটা।

মৃণাল তো তোমার পাশের ঘরেই থাকত?

হ্যাঁ।

ওই ঘরে এখন কে আছে?

কেউ নেই ঘরটা আজও খালিই পড়ে আছে মৃণাল চলে যাবার পর থেকে।

কেন?

কেউ ও-ঘরে থাকতে চায়নি। মৃণাল খুব ভাল গান গাইতে পারত—নাচতেও পারত। আজও মধ্যে মধ্যে রাত্রে ঘর থেকে ঘুঙুরের শব্দ শোনা যায়।

তুমি শুনেছো?

না। সত্যি বলবো আমি কোনোদিন কিছু শুনিনি। কিন্তু মৃণালের কথা এত শুনতে চাইছেন কেন?

কথাটা তাহলে তোমাকে খুলেই বলি, কিরীটী বলল, তপন ঘোষের হত্যাকারীকে আজও পুলিশ সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু বাবু বিশ্বাস করুন, মৃণাল তপনবাবুকে রাত্রে হত্যা করেনি।

আমিও সে-কথাটা বিশ্বাস করি—কিরীটী বলল।

বিশ্বাস করেন?

করি, আর তাই তো মৃণালের সন্ধান আমিও করছি।

আপনি—

সোমনাথ ভাদুড়ি ওই সময় বললেন, এই ভদ্রলোকের পরিচয় তুমি জান না। কিরীটী রায়ের নাম শুনেছ?

না তো।

উনি সত্য-সন্ধানী। সে রাত্রে পাশের ঘরে সত্যই কি ঘটেছিল উনি সেটাই জানবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু বাবু, আমি তো মৃণালের কোন সন্ধানই জানি না। বিশ্বাস করুন।

হয়ত জান না, কিরীটী বললেন, কিন্তু মৃণালের কথা যতটা জান—অন্য কেউ হয়ত সেটা জানেনা!

মিনতি বললে, পাশের ঘরে ছিল মৃণাল। দিনের বেলাটা প্রায়ই তার আমার ঘরেই কেটে যেত—তবে—

কি?

বড় চাপা মেয়ে ছিল মৃণাল। তাছাড়া নিজের কথা বড় একটা বলত না কখনও বিশেষ করে এখানে আসার আগে তার সব কথা জানায়নি।

তুমি জিজ্ঞাসা করোনি কখনো সে সব কথা তাকে? কিরীটীর প্রশ্ন।

না। আর জিজ্ঞাসা করেই কি করব বলুন।

কেন?

এ লাইনে যারা আসে তাদের ইতিহাস তো প্রায় সকলেরই এক—অন্যরকম আর কি হবে।

আচ্ছা তোমার কি মনে হয়? হঠাৎ সে পালাল কেন?

আমার মনে হয় বাবু, খুন-খারাপি দেখে হয়ত সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে।

আচ্ছা মিনতি, কিরীটী বলল, এমন তো হতে পারে তপন ঘোষের খুনের ব্যাপারে সে-রাত্রে ওই মৃণালও জড়িত ছিল বা তার পরোক্ষ হাত ছিল?

না, না—বাবু, না। কখনো তা হতে পারে না। মৃণালকে তো আমি জানি।

সে-রাত্রে কি ঘটেছিল তুমি তো আর কিছু দেখনি!

তা হলেও জোর গলায় বলতে পারি—মৃণাল সম্পূর্ণ নির্দোষ—সে ওই ধরনের মেয়েই নয়, অমন শান্ত স্বভাবের মেয়েকে—না বাবু না।

তুমি একটু আগে বললে তোমাদের মধ্যে খুব ভাব ছিল!

হ্যাঁ। পাশাপাশি ঘরে থাকতাম। দিনের বেলা বেশীর ভাগ সময় তো সে আমার ঘরেই থাকত, আমার সঙ্গে খেতো—এক বিছানায় দু'জনে শুয়ে থাকতাম।

মৃণালের ঘরে কে আসতো নিশ্চয় তুমি জানতে?

জানতাম বৈকি, তপনবাবুর যাতায়াত ছিল তার ঘরে।

আর কেউ আসতো না? বিজিতবাবু?

আসতো তবে মধ্যে মধ্যে।

তপন ঘোষ তখন থাকত?

না। তপন ঘোষ থাকলে বিজিতবাবু আসতো না। তবে একটা কথা। আমার মনে

হয় বিজিতবাবুর উপরে মৃণালের বোধ হয় একটা দুর্বলতা ছিল।

হুঁ। আচ্ছা মিনতি—সুদীপবাবুকে কখনো মৃণালের ঘরে আসতে দেখেছো?

দেখেছি।

একা একা?

না—তপন ঘোষের সঙ্গে বারকয়েক আসতে দেখেছি।

আদালতে সাক্ষী দেবার সময় ত কথাটা তুমি বলোনি!

না। বলিনি।

কেন, কেবল বিজিতবাবুর কথাই বা বলেছিলে কেন?

মিনতি চুপ করে থাকে।

অবিশ্যি তোমার আপত্তি থাকলে আমি শুনতে চাই না।

না। তা নয়—

তবে?

আমার মনে হয় বাবু—বিজিতবাবু কোন চোরা কারবারে লিপ্ত ছিল—তপনবাবুর সঙ্গে তার হয়ত সেই নিয়ে শেষ পর্যন্ত খুনো-খুনী হয়েছে। আদালতে সে-কথাটা আমি বলেছিলামও।

আর কেউ কখনো মৃণালের ঘরে আসেনি?

না?

মৃণালের আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না?

জানি না। বলতে পারবো না।

তার দেশ বা বাড়ি কোথায় ছিল জান?

না, সেও কোনদিন তার বাড়ি-ঘরের কথা বলেনি। আমিও সে সব কথা কখনো তাকে শুধাইনি।

কতদিন এখানে মৃণাল ছিল?

তা প্রায় আড়াই বছর ত হবে।

তার আগে কোথায় ছিল সে?

জানি না।

কথাটা তুমি তাকে কখনো জিজ্ঞাসা করনি?

না।

জানবার কখনো ইচ্ছা করেনি তোমার?

না।

তার অতীত জীবনের কথা তাহলে তুমি কিছুই জান না?

না।

কিছু না?

কথায় কথায় একদিন সে বলেছিল।

কি?

তার স্বামী নাকি তাকে প্রচণ্ড মারধোর করতো প্রতি রাত্রে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরে এসে। এক রাত্রে মারধোর করে বাড়ি থেকে তাকে বের করে দিয়ে দরজায় তালা দিয়ে চলে যায়।

তারপর?

দু'দিন বাড়ির দরজার সামনেই সে বসেছিল। তৃতীয় দিন বিকেলে হঠাৎ তার স্বামীর এক বন্ধু সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তার স্বামীর কাছে পৌঁছে দেবে বলে কলকাতায় নিয়ে আসে।

সেই বন্ধুটিকে মৃণালের স্বামী চিনতো?

হ্যাঁ—প্রায়ই সে যেতো ওদের বাড়িতে।

কে সে? কি নাম তার জান?

না।

তারপর?

তারপর আর কি, এখানে বাড়িউলী মাসীর হাতে তাকে তুলে দিয়ে বন্ধুটি চলে যায়। আর সেই ব্যবসায় তার স্বামীও একজন ভাগীদার ছিল। সম্ভবতঃ এই লোকটি মৃণালকে চালান দেবার মতলব করেছিল।

কিন্তু এখানে কি করে এল মৃণাল?

সে আর এক দৈবচক্র—

কি রকম?

স্বামীর সেই বন্ধুর আশ্রয় থেকে পালিয়ে এল রাত্রে মৃণাল। রাস্তায় এসে নামল। হাঁটতে হাঁটতে নিমতলার গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে থাকল। সেখানে আমাদের বাড়িউলী মাসীর সঙ্গে দেখা—

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, ফ্রম ফ্রাইং প্যান টু দ্য ফায়ার!

কি বললেন বাবু?

না, কিছু না, তোমাদের বাড়িউলী মাসী তখন তাকে এখানে এনে তুলল, তাই না?

আজ্ঞে। এ পাপ দেহের ব্যবসায় সে নামতে চায়নি, কিন্তু পালাবার ত আর পথ ছিল না, মাসীর চার-পাঁচজন তাঁবেদার গুণ্ডা আছে—মাসীর পোষ্যও তারা—সর্বক্ষণ চোখ মেলে থাকত। কাজেই বুঝতে পারছেন বাবু—

কিরীটী প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসলো।

আচ্ছা সে রাত্রে ঠিক কি ঘটেছিল, মানে যতটা তুমি জান বা জানতে পেরেছিলে আমাকে বলতে পারো। কিরীটী প্রশ্নটা করে মিনতির দিকে তাকাল।

বাবু, সে রাত্রে আমার ঘরে কেউ ছিল না রাত দশটার পর। আমার বাবু পৌনে দশটা নাগাদ চলে যান।

কিন্তু আদালতে বলেছো অবিনাশ সেন নামে এক ভদ্রলোক আর তুমি—

ঠিকই বলেছি—যার কথা বলেছি সে আমার স্বামী।

স্বামী!

হ্যাঁ—আট বছর আগে তার ঘর ছেড়ে আমি চলে আসি—

কেন?

তার জঘন্য চরিত্র ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য। কিন্তু সে আমাকে বছর তিনেক বাদে খুঁজে বের করে এখানে। এবং তারপর থেকে মধ্যে মধ্যে সে আসতো আমার কাছে।

কেন? টাকার জন্য?

না—সোনার বেনে—মস্তবড় জুয়েলারী ফার্ম, তার টাকার অভাব তো নেই। অনেক টাকা তার। টাকার জন্য সে আমার কাছে আসবে কেন?

তবে কি জন্যে আসতো?

আমাকে আবার ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্য।

ফিরে গেলে না কেন?

না, কারণ আমি জানতাম সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে। তাছাড়া—

কি?

এই পাপ নিয়ে কি সেখানে ফিরে যেতে পারি।

তোমার কোন সন্তানাদি—

না, হয়নি। তবে তার প্রথমপক্ষের দুটি সন্তান ছিল—আমি তার দ্বিতীয় পক্ষ। আরো অনেক কথা আছে, যা বলতে পারবো না।

থাক, বলতে হবে না। কিন্তু তুমি আদালতে সে সব কথা তো প্রকাশ করনি?

না, করিনি।

কেন?

ওই সব কি প্রকাশ করবার মত কথা দশজনের সামনে আদালতে দাঁড়িয়ে?

এবার বল, সে রাত্রে ঠিক কি ঘটেছিল।

রাত সাড়ে দশটার পর, বোধহয় এগারোটা হবে তখন—আমার স্বামী এলো।

তারপর?

বললে সে আমাকে না নিয়ে ফিরবে না। আমিও যাবো না। সেও নাছোড়বান্দা। আমি বললাম আর আমি জীবনে কোনদিন তার ঘরে ফিরে যাবো না, সেও যেন আর না আসে।

॥ ৫ ॥

মিনতি বলতে লাগল, রাত বোধহয় বারটা। হঠাৎ পর পর দুটো গুলির আওয়াজ—আর একটা আর্ত চিৎকার—

দুটো গুলির আওয়াজ শুনেছিলে? প্রশ্ন করলেন সোমনাথ ভাদুড়ি।

হ্যাঁ।

কিন্তু আদালতে বলেছো একটা গুলির আওয়াজই তুমি সে-রাত্রে শুনেছিলে। আবার প্রশ্ন করলেন সোমনাথ ভাদুড়ি।

হ্যাঁ। তাই বলেছিলাম বটে।

কিরীটী এবার বললে, দুটো গুলির আওয়াজ শুনেছিলে তবে বলেছিলে কেন একটা গুলির আওয়াজ শুনেছো?

মনে ছিল না।

কিরীটী বললে, হুঁ। ঠিক আছে। গুলির আওয়াজ শুনে তুমি কি করলে?

ভয়ে প্রথমে আমরা ঘর থেকে বের হইনি। এদিকে বাড়ির অনেকেই সে আওয়াজ শুনেছে তখন, কিন্তু তারাও কেউ ভয়ে ঘর থেকে বের হয়নি। মিনিট পাঁচেক পরে আমি আর আমার স্বামী দরজা খুলে বের হই। মৃণালের ঘরের দরজা বন্ধ। কোন সাড়া-শব্দ নেই। দরজায় ধাক্কা দিয়ে মৃণালকে ডাকি। কিন্তু মৃণালের কোন সাড়া শব্দ পেলাম না। বাড়ির অনেকেই তখন এসে ঐ ঘরের দরজার সামনে ভিড় করেছে। হঠাৎ ওই সময় আমার মনে পড়ল—আমার আর মৃণালের ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে। আমার ঘরের ভিতর থেকেই আমি বন্ধ করে রাখতাম বরাবর। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সেই মধ্যবর্তী দরজাটা খুলে মৃণালের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি, তপন ঘোষ রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে। তার পাশে পড়ে বিজিতবাবু তার হাতে ধরা একটা পিস্তল। আর—মৃণাল ঘরে নেই।

মৃণাল নেই?

না। বাথরুমের দরজাটা খোলা হা হা করছে। আমি তখন প্রথমে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাথরুমের—আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে এলাম। আমার স্বামী দেখি দরজার গায়ে লাথি মারছে—বাড়িউলী মাসীর হুকুমে। দরজা ভেঙে আমি আর আমার স্বামীই প্রথমে ভিতরে ঢুকি। পর পর অন্য সকলে। পরে থামায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ আসে।

বাথরুমের ওই দরজা দিয়ে এ বাড়ির বাইরে যাওয়া যায়? কিরীটীর প্রশ্ন।

হ্যাঁ। বাইরে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িটা বরাবর একতলা থেকে দোতলা পর্যন্ত গিয়েছে।

বলতে চাও তাহলে ওই সিঁড়িপথেই মৃণাল পালিয়েছে?

হ্যাঁ। তাছাড়া আর কি হবে। তবু পুলিশের খটকা থেকে গিয়েছে—মৃণাল কোন পথে পালাল—বাথরুমের দরজা যখন বন্ধ ছিল। আমিও পুলিশকে কথাটা বলিনি, আদালতেও প্রকাশ করিনি।

কেন করনি?

পুলিশ হয়ত আমাকে সন্দেহ করত যে আমিই তাকে সে-রাত্রে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছি।

এ কথাটা তোমার মনে হলো কেন মিনতি? কিরীটী প্রশ্ন করল।

তারা যে অনুসন্ধানের সময় আমার ও মৃণালের ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা আবিষ্কার করেছিল এবং আমাকে নানাভাবে জেরা করেছিল।

তা তোমাকে যে তারা শেষ পর্যন্ত সন্দেহ করেনি তুমি বুঝলে কি করে?

আমি যে এক সময় সে-রাত্রে গোলমাল শুনে এক ফাঁকে মৃণালের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিলাম, সে কথাটাও কাউকে আমি বলিনি। তারাও সেটা অনুমান করতে পরেনি। তাই আমার মনে হয় আমাকে তারা মৃণালের সে-রাত্রে পালানোর ব্যাপারে কোনভাবে সন্দেহ করতে পারেনি।

কিরীটী মুখে কিছু না বললেও বুঝতে পারে মেয়েটি রীতিমত বুদ্ধিমতী।

মিনতি।

বলুন।

আমার কিন্তু মনে হয়, মৃণাল কোথায় আছে অন্তত আর কেউ না জানলেও তুমি জান।

কি বলছেন আপনি!

যা আমার মনে হচ্ছে তাই বললাম।

আপনি বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমি জানি না।

দেখ, মৃণালকে আমি খুঁজে বের করবই। সে অন্তত আমার চোখে ধুলো দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না। আচ্ছা, আজ আমরা উঠছি—আবার কিন্তু আসবো।

নিশ্চয়ই আসবেন। মিনতি বললে, কিন্তু বিশ্বাস করুন বাবু, মৃণালের সন্ধান জানলে নিশ্চয়ই সে-কথা আপনাদের জানাতাম।

কিরীটী মিনতিকে আর কিছু বললে না। উঠে দাঁড়াল এবং সোমনাথ ভাদুড়িকে বললে, চলুন ভাদুড়িমশাই এবার যাওয়া যাক্। ভাল কথা, একবার মৃণালের ঘরটা দেখে গেলে হতো না।

সোমনাথ ভাদুড়ি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, বেশ ত, চলুন।

মিনতি বাড়িউলী মাসীর কাছ থেকে ঘরের চাবিটা নিয়ে এলো। দরজা খুলে ওরা দু'জনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

রাত তখন প্রায় সোয়া ন'টা হয়ে গিয়েছে।

দু'জনে ওই বাড়ি থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় এসে কিরীটীর অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে বসলো।

সর্দারজী, বাবুকে তার কোঠিতে নামিয়ে দাও আগে—কিরীটী বললে।

কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর সোমনাথ ভাদুড়ি স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন।—কি ভাবছেন রায়মশাই?

ভাবছি ওই মিনতি মেয়েটির কথা।

সত্যিই কি আপনার মনে হয় মেয়েটি জানে মৃণাল কোথায়?

আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় ত জানে।

তবে সে কথা মিনতি প্রকাশ করল না কেন? এত কথা বললে, অথচ ওই কথাটা চেপে গেল কেন?

তার দুটি কারণ হতে পারে ভাদুড়িমশাই।

কি কারণ?

প্রথমতঃ, কথাটা প্রকাশ করলে সে মামলার মধ্যে জড়িয়ে পড়তো, যেটা হয়ত সে কোনক্রমেই চায়নি। দ্বিতীয়তঃ হয়ত সে ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখেছিল সেই রাত্রে।

কি রকম?

গোলাগুলির আগে হয়ত একটা গোলমাল হয়েছিল। আর সে তখন ওই ঘরের মধ্যবর্তী দরজা খুলে ব্যাপারটা সবার অলক্ষ্যে দেখেছিল। সে যে পিস্তলের গুলির শব্দেই প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিল কথাটা হয়ত সত্য নয় কিন্তু সে-কথাটা প্রকাশ করেনি ওই একই কারণে—পুলিশ তার পেটের গোপন কথা হয়ত টেনে বের করত জেরা করে। একটা কথা ভুলে যাবেন না ভাদুড়িমশাই, ঘটনার সময় মিনতি আর তার স্বামী অবিনাশ ঠিক পাশের ঘরেই ছিল। অকুস্থানের, এক কথায় যাকে বলে সন্নিকটে।

তাহলে—

মিনতির উপর কড়া নজর রাখতে হবে। আপনি ভাববেন না বাড়ি ফেরার পথেই লালবাজারের সি, আই, ডি, অফিসার প্রতুল সেনকে আমি মিনতির উপর কনস্ট্যান্ট একটা ওয়াচ রাখবার জন্য আজ থেকেই নির্দেশ দিয়ে যাবো।

সোমনাথ ভাদুড়িকে তার গৃহে নামিয়ে দিয়ে কিরীটী সোজা সার্কাস এভিন্যুতে প্রতুল সেনের গৃহে উপস্থিত হলো।

প্রতুল সেন তখন ডিনারে বসেছিলেন।

সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলেন।

কি ব্যাপার মিঃ রায়! এত রাত্রে?

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, এত রাত কোথায়, মাত্র তো সোয়া দশটা।

আমি খেতে বসেছিলাম, আপনার নাম শুনে—

ছিঃ, ছিঃ, যান আহার শেষ করে আসুন। আমি বসছি।

না-না, আপনি বলুন কি দরকার?

বলবো বলেই তো এসেছি! আগে যান ডিনার শেষ করে আসুন, আমি বসছি।

সে হবে'খন—আপনি বলুন।

না, এমন কিছু একটা জরুরী ব্যাপার নয়, আপনি যান—ফিনিস ইওর ডিনার ফার্স্ট।

প্রতুল সেন চলে গেলেন এবং মিনিট কুড়ি বাদেই ফিরে এলেন একটা সিগ্রেট ধরিয়ে। একটা সোফায় বসতে বসতে বললেন, বলুন?

কিরীটী সংক্ষেপে ব্যাপারটা খুলে বলল, আমি যে জন্য এসেছি সেটা হচ্ছে ঐ মিনতির সবরকম গতিবিধির উপর আপনাকে নজর রাখার একটা ব্যবস্থা করতে হবে, এখুনি।

বেশ, করছি—প্রতুল সেন উঠে গিয়ে ফোনেই যেন কাকে নির্দেশ দিয়ে এলেন।

মিঃ রায়, আপনার ধারণা তাহলে মিনতি জানে মৃণালের হোয়ার এবাউটস্!

হ্যাঁ।

মৃণালকে তাহলে এ্যারেস্ট করলেই তো হয়?

না, এখন নয়।

কিন্তু—তার স্বার্থ কি?

স্বার্থ একটা আছে বৈকি কিছু—

কি স্বার্থ থাকতে পারে?

ইফ আই এ্যাম নট রং—আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়ে থাকে তো, কিরীটী বললে, ঐ বাড়িতে একটা চোরাকারবারের ঘাঁটি ছিল।

চোরাকারবারের ঘাঁটি।

হ্যাঁ—যার মধ্যে জড়িত ছিল তপন ঘোষ, বিজিত মিত্র ও সুদীপ রায় তো বটেই—ঐ মিনতি ও মৃণাল সম্ভবতঃ ছিল।

সত্যি বলছো?

বললাম তো, আমার অনুমান। এবং তপন ঘোষের মৃত্যুর পশ্চাতেও ওই চোরাকারবার।

আর মিনতির স্বামী অবিনাশ সেন?

সেও থাকাটাই সম্ভব। আপনাকে আরো একটা কাজ করতে হবে মিঃ সেন।

কি?

ওই অবিনাশ সেনকে একবার লালবাজারে ডাকিয়ে আনাতে হবে কালই।

বেশ। কখন?

বেলা দশটা বা এগারোটা নাগাদ—আমরা আপনার অফিসে তাকে জেরা করলে হয়ত আমরা কোন সূত্রের সন্ধান পেতে পারি।

আমার তো মনে হচ্ছে ওই মিনতি মেয়েটি—

তাকে তো জেরা করবোই—তার আগে তার জানা দরকার তাকে ও তার স্বামীকে আমরা সন্দেহ করছি—আচ্ছা এখন তাহলে উঠি। কাল দশটা এগারোটার মধ্যে আপনার অফিসে যাবো।

গৃহে ফিরে এলে কৃষ্ণা বললে, টিকিট পাওয়া গিয়েছে সামনের সোমবারে ডুন এক্সপ্রেসে।

আজ বৃহস্পতিবার—হাতে তাহলে এখনো তিনটে দিন-রাত ও একটা বেলা আছে। ঠিক আছে, তার মধ্যে আশা করছি তপন ঘোষের হত্যার ব্যাপারে একটা হদিশ হয়ত পেয়েও যেতে পারি।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে—তুমি কোন একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের কাছাকাছি এসে গিয়েছো।

তোমাকে সেদিন বলছিলাম না কৃষ্ণা, কিরীটী একটা আড়মোড়া ভাঙ্গতে

ভাঙ্গতে বললে, রক্তের দাগ একেবারে নিশ্চিহ্নভাবে মুছে ফেলা যায় না। যতই চেষ্টা করো মুছে ফেলতে, একটা আবছা দাগ কোথাও-না কোথাও থেকে যায়ই। আর সে-রক্তের দাগ যদি হত্যার হয় ত—

হত্যাকারী সনাক্ত হয়ে যায়। কৃষ্ণা মৃদু হেসে বললে—

তাই। কারণ, কোন ক্রাইমই আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে একেবারে পারফেক্ট হয় না। হতে পারে না। ছোট একটা কিন্তু কোথাও-না কোথাও থেকে যাবেই—সেই কিন্তু ধরে যদি এগুতে পারো—ঠিক সত্যে তুমি পৌঁছে যাবেই।

চল, রাত অনেক হয়েছে, এবারে খাবে চল।

হ্যাঁ। চল।

পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ কিরীটী বেরুল।

লালবাজারে প্রতুল সেনের অফিস কামরায় প্রবেশ করে দেখলো প্রতুল সেন তারই অপেক্ষায় বসে আছে।

এসো—এসো সত্যসন্ধানী।

কোন খবর আছে?

প্রতুল সেন বললেন, অবিনাশ সেনকে এখুনি আমার লোক নিয়ে আসবে!

প্রতুল সেনের কথা শেষ হলো না, সাব-ইন্সপেক্টার রঞ্জিৎ মল্লিক অবিনাশ সেনকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

অবিনাশবাবু এসেছেন, স্যার।

বসুন অবিনাশবাবু। প্রতুল সেন বললেন।

অবিনাশ সেন বসলেন।

কিরীটী চেয়ে দেখে আগন্তুকের দিকে।

বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বলেই মনে হয় ভদ্রলোকের।

রোগা লম্বা-চেহারা। গালদুটো ভাঙ্গা।

মাথার চুলে কলপ দেওয়া। সযত্ন টেড়ি মাঝখানে সিঁথি।

চোখে সোনার চশমা।

নিখুঁতভাবে দাড়ি কামান। সরু গোঁফ ঠোঁটের উপর।

পরনে দামী শান্তিপুরী ধুতি ও সাদা সিল্কের পাঞ্জাবী। সোনার বোতাম।

দু'হাতের আঙ্গুলে গোটা দুই সোনার আংটি, তার মধ্যে একটা হীরা। হীরাটি বেশ বড় একটা বাদামের সাইজের, অনেক দাম যে হীরাটার বোঝা যায়।

লোকটি কেবল ধনীই নয়—বনেদী ধনী। সৌখীন প্রকৃতির।

কিন্তু সারা মুখে যেন একটা দীর্ঘ অত্যাচার ও অসংযমের ছাপ।

কি ব্যাপার স্যার—এত জরুরী তলব দিয়ে আমাকে এখানে ডেকে আনলেন কেন? অবিনাশ বললেন।

কোন রকমের ভণিতা না করেই প্রতুল সেন বললেন, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে তপন ঘোষ হত্যা-মামলার ব্যাপারটা।

সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশ সেনের চোখের দৃষ্টি যেন সজাগ, তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

মামলায় আপনি ত সাক্ষীও দিয়েছিলেন—

আজ্ঞে।

আপনি ওই বাড়িতে মিনতির ঘরে যেতেন? প্রশ্ন করল এবার কিরীটী।

অবিনাশ সেন চকিতে তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

প্রতুল সেন বললেন, উনি যা জিজ্ঞাসা করছেন, তার জবাব দিন।

কিন্তু স্যার—সে মামলা ত চুকে-বুকে গিয়েছে।

না। যায়নি।

যায়নি! অবিনাশ সেনের কণ্ঠে বিস্ময়।

না, তপন ঘোষের হত্যাকারী এখনো সনাক্ত হয়নি। কিরীটী আবার বললে, কিন্তু আপনি আমার প্রশ্নের এখনো জবাব দেননি।

হ্যাঁ—তা মধ্যে মধ্যে যেতাম।

আপনার সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় ছিল, তাই না?

পূর্ব পরিচয় আর কি স্যার—একজন বারবণিতা—

কিন্তু তা ত নয়—

কি বলতে চান স্যার?

মিনতির সঙ্গে আপনার সত্যিকারের কি সম্পর্ক ছিল?

সম্পর্ক আবার কি থাকবে?

আপনি সত্য গোপন করছেন অবিনাশবাবু—

সত্য!

হ্যাঁ, তিনি ঐ লাইনে আসার আগে আপনার স্ত্রী—বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন—দ্বিতীয় পক্ষের।

অবিনাশ সেনের চোয়ালটা যেন ঝুলে পড়লো সহসা। দু'চোখে বোবা দৃষ্টি।

কি, তাই না?

বাড়ী থেকে বের হয়ে এসেছিল কুলত্যাগিনী।

কথাটা আপনি আদালতে চেপে গেলেন কেন?

প্রয়োজন হয়নি—অবান্তর—

না—অনেক সত্য কথা বের হয়ে পড়ার ভয়ে কথাটা চেপে গিয়েছিলেন।

না, না—

তা সেই কুলত্যাগিনী স্ত্রীর কাছে আবার কেন আসতেন মধ্যে মধ্যে? নিশ্চয়ই ভালবাসার টানে নয়।

সত্যিই তাই স্যার। বিশ্বাস করুন—ওকে আমি ভুলতে পারিনি।

তা মিনতি যে ওইখানে আছে খবর পেলেন কি করে?

হঠাৎ—মানে একসিডেন্টালি।

মানে ওই সব পাড়ায়—ওই ধরনের মেয়েদের কাছে যেতে যেতে—

অবিনাশ সেন চুপ করে থাকেন।

অবিনাশবাবু!

আজ্ঞে—

আমরা কিন্তু খবর পেয়েছি—

কি কি খবর পেয়েছেন?

ওই বাড়িতে একটা চোরাই কারবারের আড্ডা ছিল।

চোরাই কারবার!

সেই কারবারের সঙ্গে আপনি ও মিনতি যুক্ত ছিলেন।

না-না বিশ্বাস করুন, ওসব ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই।

কিরীটী মৃদু হাসলো।

অবিনাশবাবু আপনি জানেন মৃণাল কোথায়?

না, কেমন করে জানবো।

জানেন না?

না।

কিন্তু আমি যদি বলি আপনি জানেন।

মৃণাল পাশের ঘরে থাকত। মিনতির মুখেই আমি শুনেছিলাম কিন্তু তার সঙ্গে কোন আলাপ-পরিচয় ছিল না, এমনকি আগে তার নামও জানতাম না।

তপন ঘোষের সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল না?

না।

বিজিতবাবুর সঙ্গে?

না।

সুদীপবাবুর সঙ্গে?

না।

তাহলে ওদের কাউকেই আপনি চিনতেন না বলতে চান অবিনাশবাবু? কথাটা বলে কিরীটী অবিনাশ সেনের মুখের দিকে তাকাল।

না। বিশ্বাস করুন ওদের কাউকেই আমি চিনতাম না।

পলটুকে আপনি চিনতেন?

পলটু!

হ্যাঁ—সে ত মধ্যে মধ্যে আপনার দোকানে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করত। কথাটা কি অস্বীকার করতে পারেন?

ওই নামই জীবনে কখনো শুনিনি।

কিন্তু মিনতি বলেছে—

কি বলেছে মিনতি—

মধ্যে মধ্যে আপনি ঐ তপনবাবুর সঙ্গে বিশেষ করে দেখা করবার জন্য তার ঘরে রাত্রের দিকে যেতেন।

মিনতি বলেছে?

হ্যাঁ—আরো বলেছে তপন পাশের ঘর থেকে মিনতির ঘরে আসতো মাঝখানের দরজা পথে—আবার কথাবার্তা হলে চলে যেতো ওই দরজা দিয়েই পাশের ঘরে।

মিনতি বলেছে ওই কথা আপনাকে! হারামজাদী! শেষের শব্দটা ফাঁপা আক্রোশ ভরা গলায় অবিনাশ সেন যেন অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করলেন।

ঠিক আছে অবিনাশবাবু—আপনি যেতে পারেন।

ধন্যবাদ। অস্ফুট কণ্ঠে কথাটা বলে অবিনাশ সেন বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অবিনাশ ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর প্রতুল সেন কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন। কিরীটী অন্যমনস্কভাবে পাইপটায় নতুন তামাক ভরছে তখন।

কি বুঝলেন মিঃ রায়—প্রতুল সেন প্রশ্ন করলেন।

গভীর জলের কাতলা। কিরীটী বললে।

সে ত বোঝাই গেল। নচেৎ সব স্রেফ অস্বীকার করে যেতে পারে!

তবে কাতলা টোপ গিলেছে।

টোপ!

হ্যাঁ—দেখলেন না—বঁড়শী টাকরায় গিয়ে বিঁধেছে।

মিনতি কি সত্যিই ওই সব কথা বলেছে মিঃ রায়?

না।

তবে যে বললেন—

টোপ ফেলেছিলাম একটা স্রেফ অনুমানের উপর নির্ভর করে—দেখলেন তো অনুমানটা মিথ্যে হয়নি। এবার আপনাকে একটা কাজ করতে হবে মিঃ সেন!

কি বলুন—

মৃণালের ঘরটা এখনো খালি পড়ে আছে—সেই ঘরটা আমাদের প্রয়োজন।

সে আর এমন কঠিন কি।

এখুনি লোক পাঠান—আর একটা টেপ রেকর্ডার—ওই বাড়ির খিড়কীর দরজাটা—

তাও খোলা থাকবে। তার আশেপাশে আমাদের একজন প্লেন ড্রেসে ওয়াচারও থাকবে। কিন্তু এত আয়োজন কিসের!

কিরীটী তখন তার প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিল প্রতুল সেনকে। তারপর বললে সন্ধ্যার পরই যেন সব প্রস্তুত থাকে।

কিন্তু আপনি কি মনে করেন মিঃ রায়—

কি!

টোপ গিলবে লোকটা!

গিলবে বলেই আমার ধারণা। আজ না হয় কাল—

বেশ—

এবার আমি উঠবো।

তা কখন দেখা হচ্ছে?

ঠিক রাত সোয়া আটটায়।

অতঃপর কিরীটী বিদায় নিল।

॥ ছয় ॥

সেদিনটা ছিল রবিবার। অফিস-আদালত সব বন্ধ।

লালবাজার থেকে বের হয়ে সোজা কিরীটী সোমনাথ ভাদুড়ির গৃহের দিকে গাড়ি চালাতে বলল সর্দারজীকে।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে বারটা।

সোমনাথ ভাদুড়ির ঘর প্রায় খালিই ছিল।

একজন মাত্র মক্কেল ছিল ঘরে।

সোমনাথ ভাদুড়ি, তার সঙ্গেই কথা বলছিলেন।

কিরীটীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সাদর আহ্বান জানালেন সোমনাথ ভাদুড়ি, আসুন রায়মশাই। বসুন—

কিরীটী উপবেশন করার পর সোমনাথ ভাদুড়ি তাড়াতাড়ি শেষ মক্কেলটিকে বিদায় করলেন।

আপনাকে ফোন করেছিলাম বাড়িতে—আপনার স্ত্রী বললেন আপনি সকালেই বের হয়েছেন, ভাদুড়ি বললেন।

হ্যাঁ—লালবাজারে গিয়েছিলাম।

আজকের সকালবেলার কাগজ পড়েছেন রায়মশাই?

না। সময় পাইনি, তাছাড়া আমি সাধারণত কাগজ দুপুরে বিশ্রামের সময় পড়ি।

সুদীপ রায়—

কি হয়েছে সুদীপের?

সে খুন হয়েছে—

খুন! কে বললে?

সংবাদপত্রে বের হয়েছে—তার গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত মৃতদেহটা রেল লাইনের ধারে গতকাল সকালে পাওয়া গিয়েছে।

তার মানে যেদিন সন্ধ্যায় সে আপনার এখানে এসেছিল সেইদিনই রাত্রে সে খুন হয়েছে!

হিসাব মত তাই দাঁড়াচ্ছে। সোমনাথ ভাদুড়ি বললেন।

কিন্তু প্রতুলবাবু ত কিছু বললেন না।

বোধহয় ব্যাপারটা এখনো তিনি শোনেননি।

হয়ত তাই—কিন্তু লোকটা যে ওই সুদীপ রায়ই—সেটা জানলেন কি করে?

কাগজে অবিশ্যি বের হয়েছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে—এবং মৃতের মুখটা কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে। আইডেনটিফাই নাকি করেছে আজই তার স্ত্রী রমা।

খবরের কাগজে কি সংবাদটা বের হয়েছে?

না। আসলে আমিও সংবাদপত্রে নিউজটা পড়িনি রায়মশাই—আজ সকালে একটা ফোন পাই—

ফোন!

হ্যাঁ—অজ্ঞাতনামা এক নারীর কাছ থেকে। সে-ই সংবাদটা দেয়। সংবাদটা দিয়েই সে ফোনের কানেকশন কেটে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ফোন করি সংবাদটা দেবার জন্য।

ফোনে ঠিক কি বলেছিল আপনাকে সেই মহিলা?

বলেছিল রেললাইনের ধারে যে মৃতদেহটা পাওয়া গিয়াছে সেটা সুদীপ রায়ের।

যিনি ফোন করেছিলেন তার কণ্ঠস্বর আপনি চিনতে পারেন নি?

না।

ঠিক আছে—বলতে বলতে সামনেই টেবিলের ওপরে রক্ষিত ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে কিরীটী ডায়েল করল লালবাজারে।

কিন্তু প্রতুল সেনকে তার অফিসে পেল না।

কাকে ফোন করছিলেন? সোমনাথ ভাদুড়ি জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রতুল সেনকে, পাওয়া গেল না—অফিসে নেই।

আচ্ছা রায়মশাই, কে আমাকে ফোন করেছিল বলুন ত?

মনে হয় হত্যাকারীর সহকারিণী এবং হত্যাকারীরই নির্দেশে।

কিন্তু আমাকে সংবাদটা দেবার কি প্রয়োজন ছিল?

ভাদুড়িমশাই, হত্যাকারী বরাবরই সজাগ ছিল। সুদীপবাবু যে আপনার কাছে এসেছিলেন তাও সে জানত। তাই সে আপনাকে জানিয়ে দিল—ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সুদীপবাবুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো।

তার মানে—যাতে সে ভবিষ্যতে আরো কিছু প্রকাশ করতে না পারে।

হ্যাঁ—সেই সন্দেহেই তাকে এ পৃথিবী থেকে সরানো হয়েছে। তবে একটা ব্যাপার সুদীপবাবুর মৃত্যুতে পরিষ্কার হয়ে গেল—

কোন্ ব্যাপারের কথা বলছেন?

তপন ঘোষের হত্যার ষড়যন্ত্রের মধ্যে সুদীপবাবু না থাকলেও তিনি ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছিলেন।

আমি কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না রায়মশাই।

সুদীপবাবু এগিয়ে এসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেন সাক্ষী দিলেন তাই বোধহয়!

হ্যাঁ। সে যদি ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলই—

সুদীপবাবুর মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকেছিল।

ভয়! কিসের ভয়?

তার নিজের প্রাণের ভয়।

প্রাণের ভয়!

হ্যাঁ। তার মনে ভয় ঢুকেছিল বিজিত মিত্র যদি প্রাণের ভয়ে শেষ পর্যন্ত এ্যাপ্রুভার হয়ে সব কিছু প্রকাশ করে দেয়—

তাই সে সাক্ষী দিয়ে বিজিত মিত্রকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল বলতে চান?

হ্যাঁ—বিজিত মিত্রকে আইন-আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

কেমন যেন সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার রায়মশাই। সোমনাথ ভাদুড়ি বললেন দু' আঙ্গুলের মাঝখানে মোটা পেনসিলটা নাচাতে নাচাতে।

একটা ব্যাপার কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল ভাদুড়ি মশাই, কিরীটী বললে।

কি বলুন ত! সোমনাথ ভাদুড়ি তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

তপন ঘোষ বিজিত মিত্র ও সুদীপ রায় সব এক দলের এবং সত্যিই ওরা পরস্পর কোন দুষ্কর্মের সঙ্গী ছিল পরস্পরের।

চোরাকারবার!

হতে পারে। আমি কিন্তু ব্যাপারটা পূর্বাহ্নেই অনুমান করেছিলাম—তাই আজ রাত্রে ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা করে এসেছি।

ফাঁদ!

হ্যাঁ—আর আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তা আজই রাত্রে ফাঁদে নাটের গুরুকে আটকা পড়তে হবে।

কার কথা বলছেন?

রহস্যের মেঘনাদ যিনি—তারই কথা বলছি। ব্যাপারটা সত্যি কথা বলতে কি, আমি কিন্তু এত সহজে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। ভাবতে পারিনি হত্যাকারী এতবড় একটা ভুল তড়িঘড়ির মাথায় করে বসবে বা করে বসতে পারে।

তাহলে সুদীপবাবুর নিহত হওয়াটা এ ব্লেসিং ইস ডিজগাইজ বলুন রায়মশাই, সোমনাথ বললেন।

তাই।

কিরীটীর অনুমান যে মিথ্যা নয় সেটা ওই রাত্রেই প্রমাণিত হয়ে গেল।

ব্যবস্থামত রাত্রি এগারটা নাগাদ কিরীটী ও প্রতুল সেন এসে খিড়কীর দরজা-পথে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে খোলা বাথরুমের দরজা দিয়ে মৃণালের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে পূর্ব হতেই অন্ধকার ঘাপটি মেরে ছিল প্রতুল সেনের এক বিশ্বস্ত অনুচর।

ফিসফিস করে প্রতুল সেন শুধালেন, কেউ এসেছে মৃণালের পাশের ঘরে?

না, স্যার।

মিনতি আছে ত ঘরে?

আছে।

প্রার্থিত আগন্তুক ঠিক এলো রাত বারোটায়।

টুক টুক করে পাশের ঘরের দরজায় নক করলো!

দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল।

তাদের মধ্যে সে-রাত্রে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল পরে টেপ থেকেই তা শোনা যায়।

কে? মিনতির প্রশ্ন।

আমি।

তুমি? আবার কেন তুমি এসেছো?

তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে, চল—আমার সঙ্গে—

না।

চল।

না, কিন্তু এখানে আর তুমি থেকো না—চলে যাও, আমি টের পেয়েছি পুলি ছদ্মবেশে এ বাড়ির আশে পাশে ওৎ পেতে রয়েছে।

পুলিশের সাধ্যও নেই আমাকে ধরে।

বিশ্বাস করো, আমি সত্যি বলছি, আর তুমি হয়ত একটা কথা জান না—কিরীটী রায়—

সেই ছুঁচার ব্যাটা চামচিকে—তার সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়েছে চল—আর দেরি করো না।

তুমি আমার কথা শোন। আমি বলছি তুমি চলে যাও।

একা চলে যাবো—তাই কি হয়, তোমাকে একা ফেলে ত যেতে পারি না।

ওগো—

তারপরই একটা গোঁ গোঁ শব্দ।

কিরীটী পাশের ঘরে প্রস্তুতই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে পরদা খুলে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে, তার পশ্চাতে প্রতুল সেন, তার হাতে ধরা পিস্তল।

বলাই বাহুল্য আততায়ী পালাবার পথ পায় না।

যে দুটো হাত মিনতির গলায় ফাঁস পরিয়েছিল—তার সেই হাতের মুষ্টি আপনা থেকেই শিথিল হয়ে আসে।

সে ফ্যালফ্যাল করে তাকায় প্রতুল সেনের হাতে ধরা উদ্যত্ত পিস্তলটার দিকে।

লোকটার পরণে পাজামা ও গায়ে কালো সার্ট। মুখে চাপ দাড়ি।

কিরীটী কঠিন কণ্ঠে বললে, মিঃ সেন, ওই তপন ঘোষ ও সুদীপের হত্যাকারী—এরেষ্ট করুন।

প্রতুল সেন ডাকলেন, বীরবল, ওর হাতে হ্যান্ডকাপ লাগাও।

বীরবল পশ্চাতেই ছিল, হাতকড়া নিয়ে এগিয়ে এলো। লোকটার হাতে হাতকড়া পরাল।

মিনতিকেও ছাড়বেন না। ওর হাতেও হ্যান্ডকাপ পরান। আর এক জোড়া আনেননি?

বীরবলের কাছে আর এক জোড়া হাতকড়া ছিল ; সে সেটার সদ্ব্যবহার করল।

ইতিমধ্যে গোলমাল শুনে বাড়ির অনেকে সেখানে এসে ভিড় করে।

তারা ব্যাপার দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত।

কিরীটী এবার বললে প্রতুল সেনের দিকে তাকিয়ে, মহাপুরুষটিকে চিনতে পারলেন মিঃ সেন?

না তো।

অবিনাশ—

অবিনাশ সেন!

হ্যাঁ—দাড়িটা উৎপাটন করুন—বেশী লাগবে না—কারণ স্পিরিট গামের সাহায্য নেওয়া হয়েছে—উৎপাটন করলেই আসল চেহারাটা প্রকাশ পাবে।

কিরীটীর কথা মিথ্যা নয় দেখা গেল।

অবিনাশ সেনই।

সেইদিন রাত্রিশেষে লালবাজারে প্রতুল সেনের অফিস কক্ষে—

কিরীটীকে ফিরে যেতে দেননি প্রতুল সেন—টেনে এনেছিলেন সঙ্গে করে।

প্রতুল সেন বলছিলেন ব্যাপারটা কি আপনি বুঝতে পেরেছিলেন আগেই—মানে আসল হত্যাকারী কে?

বুঝতে পেরেছিলাম প্রথমেই বললে ভুল হবে—তবে কিছুটা অনুমান করেছিলাম।

কি?

বুঝতে পেরেছিলাম তপন ঘোষ, বিজিত মিত্র ও সুদীপ রায়—আপনার কাহিনী-গুলির এক ঝাঁকের পাখী—বার্ডস অফ দি সেম ফেদার। আর এও বুঝেছিলাম ওরা যন্ত্র মাত্র, আসল যন্ত্রী ওদের পশ্চাতে কেউ ছিল। কিন্তু কে সে? একটা ধাঁধাঁ থেকে গিয়েছিল। তারপর মিনতির সঙ্গে দেখা করতেই ব্যাপারটাকে ঘিরে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হলো।

কি রকম!

বিজিত মিত্রের স্ত্রী দেবিকার পরিচয় দিয়ে ভাদুড়ি মশাইয়ের পায়ে যে গিয়ে পড়েছিলেন সে আসল দেবিকা নয়। বিজিত মিত্রের স্ত্রী নেই।

প্রতুল সেন বললেন, কি বলছেন আপনি?

ঠিকই বলছি। বিজিত মিত্রের কোন স্ত্রীই ছিল না।

তবে কে সে?

সে ওই মিনতি।

মিনতি!

হাঁ। মনে আছে আপনার অমিয়বাবুর সঙ্গে একটি মেয়ে ঘোমটা মাথায় এসে দেখা করেছিল?

মনে আছে।

সেই মেয়েটি ও দেবিকা নাম ধরে যে মেয়েটি ভাদুড়ি মশাইয়ের কাছে গিয়েছিলেন তারা এক ও অকৃত্রিম।

ও-ই মিনতি কি করে বুঝলেন?

ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেইদিনই, যেদিন আমি আর ভাদুড়ি মশাই মিনতির সঙ্গে দেখা করতে যাই। মিনতির হাতে উল্কিতে লেখা 'এম অক্ষরটা দেখে। একবার ঘোমটা খুলে, একবার ঘোমটা দিয়ে গিয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুমান করেছিলাম—মিনতিও ওই দলে আছে। আর তাই আজ রাত্রের ফাঁদটা পেতেছিলাম আপনার সক্রিয় সাহায্যে।

আচ্ছা, সেদিন রাত্রে কি ঘটেছিল বলে আপনার মনে হয় মিঃ রায়?

অনুমানে মনে হয়—ওই অবিনাশ সেনই সে-রাত্রে পাশের ঘর থেকে মাঝের দরজা খুলে ওই ঘরে ঢুকে তপন ঘোষকে হত্যা করে। তারপর এক ঢিলে দুই পাখী মারার প্ল্যান করে বিজিত মিত্রর মাথায় আঘাত করে এবং তার হাতে পিস্তলটা গুঁজে দিয়ে পালিয়ে যায়।

আচ্ছা, মিনতি যদি ওই দলেরই তবে সে অত কথা আপনাকে বললে কেন?

তার উপর থেকে সন্দেহটা দূর করবার জন্য। কারণ সে আমাকে দেখে, আমার কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছিল আদালতে যে মামলা শেষ হয়ে গিয়েছে, সেটা আমার বিচারে শেষ নিষ্পত্তি নয়। এবারে হয়ত কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুবে। তাই অত কথা সে বলে আমাদের। কিন্তু সে বুঝতে পারেনি তখন তার ওই সব কথা তার বিরুদ্ধে আমার মনে সন্দেহ জাগবে।

বিজিত মিত্রর কি হলো?

সম্ভবতঃ মৃত্যুভয়ে সে আত্মগোপন করে আছে।

আর মৃণাল?

মনে হয় মৃণালকে আর কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু এরপর আমি—

নিরস্ত হবেন না, এইত, তা খুঁজুন—যদি কখনো খুঁজে পান তাকে। কথাটা বলে কিরীটী মৃদু হাসলো।

রেশমী ফাঁস

॥ এক ॥

রাত্রির কালো অন্ধকার।

সমস্ত বাড়ীটা যেন রাত্রির সেই ঘন অন্ধকারে একেবারে নিঃশেষে হারিয়ে গিয়েছে। উপরের দালানের বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো—ঠিক সেই সময় এক আর্ত চীৎকার! চীৎকারটা হঠাৎ জেগে উঠেই যেন আচমকা আবার মিলিয়ে গেল রাত্তির নিঃস্তব্ধতায়। মনে হলো কে যেন সেই চীৎকারের শব্দটাকে মুহূর্তে গলা টিপে থামিয়ে দিল।

বিজয়বাবু বলতে লাগলেন—

চীৎকারের শব্দে প্রথমটায় আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম, তারপর ধীরে ধীরে নিজের সত্তাকে ফিরে পেলাম—সব আবার তখন স্তব্ধ নিঝুম হয়ে গিয়েছে।

তারপর? বিজয়বাবুর মুখের দিকে চেয়ে কিরীটী প্রশ্ন করল।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম—সুইচ টিপে আলোটা জ্বাললাম। কিন্তু আশেপাশে সন্দেহজনক কোন কিছুই দেখতে পেলাম না। সামনেই নিচে নামবার সিঁড়ি। রাত্রেও সিঁড়িতে আলো জ্বলে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলাম—সেখানেও কিছু দেখতে পেলাম না। আবার উপরে এলাম। সকলের ঘরই তখন ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। একটু আগের আর্ত চীৎকারের শব্দে কারও ঘুম

ভেঙেছে বলে মনে হলো না। নিজের ঘরে এসে আবার দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম! নানা চিন্তায় মন আচ্ছন্ন, এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে বিনয়ের ডাকে ঘুম ভাঙলো। উঠে দরজা খুলে দিতেই সে হাউ-হাউ করে কেঁদে বলে উঠলো—সর্বনাশ হয়েছে দাদা—জ্যেঠামশাইকে কে খুন করেছে।

খুন করেছে! সে কি?

হ্যাঁ—দেখবে এসো!

বিনয়ের সঙ্গে জ্যেঠামশাইয়ের ঘরে গেলাম। সকলেই তখন সেখানে উপস্থিত—চাকরবাকররাও দরজার বাইরে জটলা পাকাচ্ছে। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি যে, যে আরাম কেদারায় জ্যেঠামশাই বেশীর ভাগ সময় শুয়ে বিশ্রাম করতেন, তার উপরেই জ্যেঠামশাইয়ের প্রাণহীন অসাড় দেহটা এলিয়ে পড়ে আছে। গলায় একটা রেশমী সূতোর ফাঁস শক্ত করে আঁটা। চোখ দু'টো ঠেলে কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে—বীভৎস! সমস্ত মুখখানা একেবারে নীল হয়ে গিয়েছে। ঠোঁটে ঠোঁট চাপা—আর ঠোঁটের পাশ দিয়ে কালো রক্তের ফেনা গড়াচ্ছে। কেদারার দু'পাশ দিয়ে হাত দু'টো অসহায় ভাবে ঝুলছে। মৃতদেহ ঘিরে সকলে চারপাশে দাঁড়িয়ে। সে দৃশ্যে সকলেই স্তম্ভিত বিমূঢ়। পিতার অধিক ছিলেন জ্যেঠামশাই আমাদের সকলের কাছে। ব্রহ্মচারী মানুষ—ভাইপোরা আমরাই ছিলাম তাঁর সব। এই বত্রিশ বছর কখনো দুঃখের ছায়া দেখিনি! জীবনে তাঁর চেয়ে বড় আপনার জন আর কেউ ছিল না—তাঁর চেয়ে কাউকে ভালবাসিনি—তাঁর নৃশংস মৃত্যু কতখানি অভিভূত হলাম আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না মিষ্টার রায়।

বিজয়বাবুর দু'চোখ জলে ভরে এলো।

আচ্ছা বিজয়বাবু, সাধারণত আপনি কত রাত্রে শুতে যান?— কিরীটী প্রশ্ন করে।

আমি একটু তাড়াতাড়ি ঘুমোই—রাত্রি দশটার বেশী বড় একটা জাগি না।

জীবনের দীর্ঘ ত্রিশটা বছর রেশমের ব্যবসায় সাফল্য ও লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করে আজ যখন শশাঙ্ক চৌধুরী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত তখন শেষে এমনি রেশমী সূতোর ফাঁসে প্রাণ দিয়ে গেলেন।

কি নির্মম! কি মর্মঘাতি।

যে রেশম তাঁর জীবনে যশ, মান, অর্থ প্রতিপত্তি এনেছিল, সেই রেশমই অকস্মাৎ একরাত্রে তাঁর জীবনান্ত ঘটালো। এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কি হতে পারে?

ছোট ছোট তিনটি অনাথ ভাইকে নিয়ে সেদিন শশাঙ্কশেখর পিতৃহীন হন—বয়স তখন তাঁর মাত্র একুশ বছর। শশাঙ্কর এক দূরসম্পর্কীয় মামা বহরমপুরে রেশমের কুটিতে কাজ করতেন—শশাঙ্ক বি-এস-সি পাশ করেছিলেন ; মামার আহ্বানে বহরমপুরে গিয়ে রেশম-কুঠিতে সামান্য পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় চাকরি নিলেন।

রেশম-কুঠির সত্ত্বাধিকারী ছিলেন এক কৃশ্চান সাহেব। অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং বুদ্ধির জোরে শশাঙ্ক শীঘ্রই সাহেব সত্ত্বাধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তিনি উন্নত ধরনের রেশম প্রস্তুত করবার পন্থা আবিষ্কার করলেন এবং সে রেশম বাজারে বহুমূল্যে বিক্রী হতে লাগলো। শশাঙ্কশেখরের কপাল গেল ফিরে। ছাত্র জীবনে পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে উচ্চশিক্ষার যে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল—সে দুঃখের তার সীমা ছিল না। সেই অঙ্কুরে-বিনষ্ট আশাকে তিনি সাফল্যমণ্ডিত করতে চাইলেন ছোট তিন ভাই মধুশেখর, শম্ভুশেখর ও সাধুশেখরকে নিয়ে। তিন ভাইয়ের মধ্যে শম্ভুশেখরের বুদ্ধি ছিল বেশী, কিন্তু হঠাৎ একদিন অতর্কিতে সকালে তাঁর মৃতদেহ তাঁরই শয়ন-কক্ষে পাওয়া গেল। মৃত্যুর কারণ জানা গেল না! অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে পুলিশ সন্দেহ করেছিল, কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে শশাঙ্ক-শেখর টাকা দিয়ে অনেক চেষ্টা চরিত্র করে গোপনে সব মিটিয়ে নিলেন।

কিন্তু সেদিন শশাঙ্কশেখর টাকা ঢেলে গৃহের যে কলঙ্ক মুছে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন জীবনের যে কালো পৃষ্ঠাটা ভুলে যেতে চেয়েছিলেন, সত্যিই কি তা মুছে গেল।

শম্ভুশেখরের মৃত্যুর প্রায় ৮।১০ বৎসর পরে—ক্রমে শশাঙ্কশেখরের রেশমের ব্যবসা বড় হয়ে উঠেছে—ব্যাঙ্কব্যালেন্স ক্রমে স্ফীত হয়ে উঠছে। একা শশাঙ্কশেখর সবদিক দেখে উঠতে পারেন না, বয়সও যথেষ্ট হয়েছে—একরকম বাধ্য হয়েই তাকে মধুশেখরকেও ব্যবসার মধ্যে টেনে নিতে হলো। ইতিমধ্যে মধুশেখর আর সাধুশেখরের বিবাহ দিয়েছিলেন। মধুর দুটি ছেলে, সাধুর একটি। ছোটবেলা হতেই সাধুর লেখাপড়ার দিকে তেমন কোনো দিনই আকর্ষণ ছিল না, কোনমতে ম্যাট্রিকটা পাশ করলে আই-এর গণ্ডি সে উৎরোতে না পেরে তাস-পাশা ও আড্ডা দিয়ে সময় কাটাতে লাগলো। শশাঙ্ক মনে মনে দুঃখ পেলেও মুখে কিছু বললেন না ছোট ভাইকে। মধুর বড় ছেলে বিজয়ের যখন একুশ বছর বয়স, সেই সময় হঠাৎ আবার একদিন মধুশেখর দুর্দান্ত কলেরা রোগে চার ঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন। বিজয়ের ছোট ভাই বিনয়ের বয়স তখন ষোল বছর। মধুর মৃত্যুতে শশাঙ্ক বড় বেশী আঘাত পেলেন। কিন্তু অত্যন্ত চাপা মানুষ বলে তেমন বোঝা গেল না। দ্বিগুণ উৎসাহে যেন তিনি ব্যবসার মধ্যে ডুবে গেলেন। ভিতরে ভিতরে কিন্তু শশাঙ্কশেখরের প্রাণশক্তি ক্ষয় হয়ে আসছিল। অবশেষে একদিন শশাঙ্কশেখর বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলেন—কারবার দেখাশুনা করতে লাগল মধুর বড় ছেলে বিজয় আর সাধুর একমাত্র পুত্র অমিয়।

কলকাতার অফিস দেখাশুনা করতো সাধু—তবে সে শুধু নামে। বিনয়ই বেশীর ভাগ সময় কাকার সঙ্গে থাকতো এবং কলকাতার অফিসের যা কিছু তাকেই দেখতে হতো। গড়িয়াহাট অঞ্চলে শশাঙ্কশেখরের মস্ত বড় বাড়ী। বিজয়, বিনয় আর অমিয় সকলেই অবিবাহিত। সাধুর স্ত্রী সুনয়নী দেবীই কলকাতার বাড়ীতে সর্বময়ী কর্ত্রী।

ইদানীং শশাঙ্কশেখরের জীবন নিরুদ্বেগে কাটছিল গত কবছর ধরে।

হঠাৎ এই দুর্ঘটনা!

এবারে কিন্তু আর পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। পুলিশ এলো, তদন্ত শুরু হলো।

এবাড়ীর সঙ্গে আগেকার একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিরীটীর আলাপ পরিচয় হয়েছিল এবং ক্রমে শশাঙ্কশেখরের সঙ্গেও এবাড়ীর সকলের সঙ্গেই এমন কি সুনয়নী দেবীর সঙ্গেও যথেষ্ট আলাপ এবং সৌহার্দ জমে ওঠে কিরীটীর। ইদানিং কিরীটী সকাল বেলাটা প্রত্যহই প্রায় দু'-তিন ঘণ্টা করে শশাঙ্কশেখরের প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ঘরে এসে বই পড়ে আর শশাঙ্কশেখরের সঙ্গে নানা আলাপ আলোচনায় কাটিয়ে যেত। সেদিনও নিত্যকার মত সকালবেলা এ বাড়ীতে এসে কিরীটী শশাঙ্কশেখরের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে গেল।

দিন দুই আগে ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিজয় আর অমিয় কলকাতার বাড়ীতে এসেছে। বিজয়ের মুখেই কিরীটী আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনলো।

পুলিশ উপরের ঘরে আছে, না বিজয়বাবু? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হাঁ। টালিগঞ্জ থানার ইনচার্জ সুচিৎবাবু আর লালবাজার থেকে ইনস্পেক্টর মফিজুদ্দীন তালুকদার সাহেবও এসেছেন।

তালুকদার এসেছে?—চলুন, উপরে যাওয়া যাক। He is an old friend of mine.

॥ দুই ॥

বিজয়বাবুর সঙ্গে কিরীটী এসে দোতলায় যে ঘরে মৃতদেহ আছে অর্থাৎ শশাঙ্কশেখরের শয়নকক্ষে প্রবেশ করল।

আরে কিরীটী! তুমি এখানে?

এদের সঙ্গে আমি বিশেষ পরিচিত। বলতে বলতে কিরীটী তখনও যেখানে আরাম কেদারার পরে শশাঙ্কশেখরের নিষ্প্রাণ অসাড় দেহটা পড়েছিল, সেইখানে এসেই দাঁড়াল। চব্বিশ ঘণ্টা আগেও ও দেহ প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর ছিল।

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধান। এই তো জগৎ! এই তো জীবন!

মৃত্যু তার কঠোর হিমশীতল স্পর্শে ঐ দেহের সমস্ত অহংকার, সমস্ত গৌরব যেন শোষণ করে নিয়ে গেছে। একেবারে নীল হয়ে গিয়েছে। কিরীটী হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে কেদারার দু'পাশে অসহায়ভাবে ঝুলন্ত শশাঙ্কশেখরের একখানা হাত তুলেই ছেড়ে দিল। আত্মগত মৃদু কণ্ঠে বললে ঃ Rigor mortis set in করছে দেখছি!

তারপর মৃতদেহের চতুঃস্পার্শ্বে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। কেদারার

সামনেই একটা ছোট টিপয়—একটা আঢাকা কাচের গ্লাসে তখন দেখা যাচ্ছে অর্ধেকটা জল।

রাত্রে শোবার আগে উনি জল খেতেন না? কিরীটী বিজয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

হাঁ। ডায়বেটিসের রুগী হলেও রাত্রে শোবার আগে জল খাওয়া জ্যেঠামশায়ের দীর্ঘ দিনের অভ্যাস ছিল।

মৃতদেহের পায়ের দিকে তাকিয়ে কিরীটী আবার প্রশ্ন করে, ওঁর স্লিপার দুটো কোথায়? দেখছি না যে।

কিরীটীর কথায় সকলেরই সেদিকে নজর পড়ল। সত্যি, শয়নকক্ষে নিয়মিত যে ঘাসের স্লিপার জোড়া উনি ব্যবহার করতেন, সেটা কেদারার আশেপাশে কোথাও নেই! স্লিপার জোড়া ঘরের মধ্যে কোথাও দেখা গেল না।

আচ্ছা, মৃতদেহ প্রথম কে দেখেছে? কিরীটী বিজয়বাবুকেই জিজ্ঞাসা করে।

এবারে বিনয় কথা বললে—জ্যেঠামণির চাকর হরেকেষ্ট।

—তাকে একবার ডাকুন তো।

হরেকেষ্টকে ডেকে আনা হলো। লোকটার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেহে সবে যেন ভাঙন ধরেছে। বেঁটেখাটো আঁটসাট চেহারা। পরণে ধোপ দুরস্ত ধুতি আর ফতুয়া গায়ে।

তোমারই নাম হরেকেষ্ট? তালুকদার প্রশ্ন করে।

হাঁ, হুজুর।

হরেকেষ্ট কিরীটীর বিলক্ষণ পরিচিত। কিরীটীর সোজাসুজি প্রশ্ন সুরু করে, হরেকেষ্ট, ব্যাপারটা আমাকে সব খুলে বল তো?

রোজ খুব সকালে কর্তাবাবু প্রথমে এক গ্লাস গরম জলের সঙ্গে লেবুর রস খেতেন আপনি তো জানেন রায়বাবু। আজ ভোরে গরম জল নিয়ে এসে ঘরের দরজা ভেজানো দেখে ঠেলতে গিয়ে দেখি—দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

দরজা বুঝি খোলাই থাকত!

হাঁ, কর্তাবাবু, কখনো দরজা বন্ধ করে রাখতেন না।

তারপর?

বাবুকে ডেকে যখন কোন সাড়া পেলাম না—তখন ভাবলাম বাবু হয়ত ঘুমোচ্ছেন। ক্রমে বেলা যখন সাতটা বাজল, কর্তাবাবুর ঘরের দরজা খুললো না, মনে কেমন সন্দেহ হলো—আজ একুশ বছর এ-বাড়ীতে চাকরি করছি, এমন তো কখনো হয় না। কর্তা নিয়মিত কি শীত কি গ্রীষ্ম ভোর পাঁচটার মধ্যেই ঘুম থেকে ওঠেন। ঘরের দরজাও কখনো বন্ধ থাকে না। তাড়াতাড়ি গিয়ে তখন ছোটবাবুকে ডাকলাম। ছোটবাবু তখন ঘুম থেকে উঠে সবে চা খাচ্ছেন—আমার কথা শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। ডাকাডাকি করে আর দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেও যখন কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না--ছোটবাবু আর আমি দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকলাম। প্রথমটা বিছানা খালি

দেখে আমরা বুঝতে পারিনি, তারপর হঠাৎ ছোটবাবুর চিৎকার শুনে চেয়ে দেখি আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কর্তাবাবুর দেখাশুনা তো তুমিই করতে, না হরেকেষ্ট?

আজ্ঞে। আপনি তো সবই জানেন। রাত সাড়ে দশটার সময় প্রত্যহ একগ্লাস জল কর্তার ঘরে রেখে আমার তবে রাতের মত ছুটি মিলত—এদিকে আবার ভোর ঠিক পাঁচটার সময় এসে গরম জল আর লেবুর রস মিশিয়ে দিতে হতো। দিনের বেলা আমাকে সর্বদাই তাঁর কাছে কাছে থাকতে হতো।

তাহলে গতকাল রাতে দশটার সময় তুমি যখন কর্তাবাবুর জল রাখতে এঘরে আস, তখন তিনি বেঁচে ছিলেন?

আজ্ঞে।

সে সময় বাবু নিশ্চয় জেগে ছিলেন?

আজ্ঞে।

কথাবার্তা হয়েছিল কিছু?

না, তেমন কিছু না—তবে জলটা রেখে গেলাম, আর বলে গেলাম, কর্তা, জল রইলো। তিনি বললেন, হুঁ! জিজ্ঞাসা করলাম, আর কোন কিছু দরকার আছে কি না? বললেন, না।

আজ্ঞে, ঐ চেয়ারটাতেই বসে ছিলেন—জানালার কাছে ঘরের দিকে পিছন ফিরে।

য়্যাঁ! কিরীটী যেন হঠাৎ চমকে ওঠে!

ঠিক বাইরের বারান্দায় এমন সময় জুতোর মচমচ আওয়াজ পাওয়া গেল। কিরীটী তালুকদারের দিকে তাকিয়ে বললে, Here comes our Doctor Ahmed! বলতে বলতেই পুলিশ সার্জন ডক্টর আমেদ এসে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ঘরের চারপাশে একবার দৃষ্টিপাত করেই কিরীটীকে দেখে সোল্লাসে বলে ওঠেন, কিরীটী রায়! Ah ! then something is really bad ! তারপর মিস্টার রায় রহস্য ঘনীভূত তো?

কিরীটী হাসতে হাসতে বলে, আপাতত অন্ধকার রাত্রে রেশমী নিষ্ঠুর এক হত্যাকাণ্ড মাত্র। আগে আপনি dead body পরীক্ষা করুন—যতটা সম্ভব পুলিশকে সাহায্য করুন।

পুলিশকে। মানে our old friend তালুকদারকে! সে তো আছেই। কিন্তু তাহলে আপনি?

না, হঠাৎ এসে পড়েছি। এদের সঙ্গে যথেষ্ট জানাশোনা আছে আগে থাকতেই এবং বিশেষ করে মৃত শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। তাই এই একটু জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম আর কি। তাছাড়া বোঝেন তো দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। কিরীটী মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

ডক্টর আমেদ তাঁর কাজ শুরু করেন। মোটামুটি পরীক্ষা সেরে উঠে দাঁড়াতেই কিরীটী প্রশ্ন করে, কতক্ষণ মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয় আমেদ সাহেব?

তা প্রায় ঘণ্টা এগার বার হবে বৈকি।

আমারও তাই ধারণা। Strangulationই তো মৃত্যুর কারণ?

আপাতত তাই বলেই ত মনে হচ্ছে। ময়না তদন্ত করে দেখা যাক if anything mysterious is found।

এরপর কিরীটী তালুকদারকে প্রশ্ন করে, তোমাদের পুলিশের তদন্ত শেষ হয়েছে তালুকদার?

হাঁ, মোটামুটি। কেবল জবানবন্দী নিতে বাকী।

তবে শুরু করো। আমি অপেক্ষা করি। তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে একসঙ্গেই আমার গাড়ীতে ফেরা যাবে কি বল?

বেশ।

তালুকদারের নির্দেশে টালিগঞ্জ থানা-ইনচার্জ তাঁর জবানবন্দী নেওয়া সুরু করলেন।

লোকজনের মধ্যে বাড়ীতে মৃত ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে শশাঙ্কর ছোটভাই সাধুশেখর—মধুর দুইপুত্র বিজয় আর বিনয়শেখর। সাধুর একমাত্র পুত্র অমিয়শেখর। অমিয়র মা সুনয়নী দেবী। শশাঙ্কশেখরের খাস ভৃত্য হরেকেষ্ট। নেপালী ভৃত্য গোলক। রাঁধুনি বামুন কৈলাস। ঝি হরিমতি। সোফার উজ্জ্বল সিং এবং দুজন দারোয়ান বিক্রম সিং আর লাল সিং।

একে একে সকলের জবানবন্দীই নেওয়া হলো আলাদা আলাদা করে—একমাত্র সুনয়নী দেবী আর সাধুশেখরকে বাদ দিয়ে। এদের সকলকে ঘর থেকে বিদায় দিয়ে সর্বশেষ ওদের দুজনকে ডেকে পাঠানো হলো।

সকলের জবানবন্দী থেকে ব্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে। টালিগঞ্জের থানা অফিসার সুচিৎবাবু বলতে লাগলেন—শশাঙ্কশেখর চৌধুরীকে শেষ জীবিত দেখেছে তাঁর খাস ভৃত্য হরেকেষ্টই। রাত্রি বারটার সময় বিজয়বাবু তখনও জেগে পড়াশুনা করছিলেন, একটা আর্ত চীৎকার শুনতে পান। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে কোথাও তিনি সন্দেহজনক কিছু দেখতে পাননি বা শুনতে পাননি। বাড়িতে রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সাড়ে ন'টার মধ্যেই চিরদিন শেষ হয় এবং গতরাত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিজয়বাবুর বর্ণিত চীৎকারের শব্দটা বিজয়বাবু ভিন্ন আর কেউ শুনতে পাননি। বিনয়বাবু রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় তাঁর জ্যেঠামশাই শশাঙ্কশেখরের ঘরে গিয়েছিলেন ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতে। মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যেই শেষ হওয়ায় তিনি চলে আসেন। তারপর বিনয়বাবু নিজের শয়নকক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়েন এবং সারাদিনের পরিশ্রমের পর শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর আজ সকালে গোলমালে ঘুম ভেঙে

উঠে সব জানতে পারেন। গত দিনে বা রাত্রে বিজয়বাবুর সঙ্গে শশাঙ্কশেখরের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

অমিয়শেখরের জবানবন্দী—তিনি রাত্রি আটটার মধ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান। তিনি গিয়েছিলেন night showতে সিনেমা দেখতে। হোটেলে খেয়ে সিনেমা দেখে ফিরেছেন রাত সাড়ে বারটায়! এসেই সোজা নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। হরেকেষ্টও রাত সাড়ে দশটায় জল দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শোয়। অন্যান্য ভৃত্যদের মধ্যে কেউ কিছু জানে না—যদিও রাত এগারটা পর্যন্ত প্রায় সকলেই জেগেছিল। দারোয়ান লালসিং রাত সওয়া ন'টা নাগাদ কাকে যেন বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছে—ঠিক বুঝতে পারেনি, কে সেই লোক এবং বাড়ীর কেউ হবে বলে তাকে কোন প্রশ্ন করেনি।

কিরীটী বলে, হুঁ। লোকটি কে? We must find him out !

বাইরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

॥ তিন ॥

প্রথমে সাধুশেখর, তাঁর পশ্চাতে সুনয়নী দেবী ধীরপদে কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন।

সাধুশেখরের বয়স প্রায় পঞ্চান্নর কাছাকাছি। প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, লোকটি বেশ সৌখীন। কাঁচাপাকা মাথার চুল পরিপাটিভাবে ব্রাশ করা। সযত্নবর্ধিত গুম্ফ পালোয়ানী ছাঁচে সূক্ষ্ম করে দুদিকে পাকানো। পরিধানে শান্তিপুরী ধুতি ; গায়ে দামী নেটের গেঞ্জী। সুনয়নী দেবীর বয়স চল্লিশের উর্ধ্বে। পরিধানে মিলের সাধারণ লালপাড় শাড়ি। হাতে অলঙ্কারের বাহুল্য নেই—বরফি প্যাটার্নের দু'গাছি করে সোনার চুড়ি, শাঁখা আর লোহা। মাথায় অল্প ঘোমটা—কপালের প্রান্তদেশ ছুঁয়ে আছে মাত্র আলগোছে।

টালিগঞ্জ থানা ইনচার্জ অফিসার সুরু করলেন, নমস্কার! আপনিই—

আজ্ঞে, সাধুশেখর। ইনি আমার স্ত্রী।

বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

উভয়ে চেয়ারে বসলেন।

নিতান্ত কর্তব্যবোধেই এ-সময় আপনাদের বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম, ক্ষমা করবেন। কাল রাত্রে আপনার movements সম্পর্কে আমাকে যদি details বলেন!

পাড়ায় একটা ক্লাব আছে, প্রতি রাত্রেই সেখানে আমি যাই! কাল রাত ন'টা সওয়া ন'টা হবে, ক্লাব থেকে বেরিয়ে আমি শিয়ালদহ মার্কেটের কাছে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—কিন্তু দেখা না পাওয়ায় ফিরে আসি। বাড়ী পৌঁছুতে প্রায় এগারটা হয়েছিল।

সাধুশেখর এই পর্যন্ত বলেছেন—হঠাৎ সুনয়নী দেবী স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন এবং ঘরে ঢোকা অবধি যেমন মাথা নিচু করে বসেছিলেন, আবার তেমনিভাবে বসে রইলেন। সাধুশেখর আবার বলতে লাগলেন, এরপর খেয়েদেয়ে আমি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খাচ্ছি, এমন সময় হরেকেষ্ট এসে আমাকে বলে, দাদার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ—ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করে, আপনার দাদা কোন উইল করে গেছেন বলে জানেন।

হ্যাঁ। গত বছর দাদা উইল করেছেন জানি!

এ বাড়ীর আর সকলেই সেই উইলের কথা জানেন।

না। একমাত্র আমি, আমার স্ত্রী আর বিজয় ছাড়া বাড়ীর আর কেউই উইলের কথা জানে না।

ছেলেদের মধ্যে একমাত্র বিজয়বাবু ছাড়া উইলের কথা কেউ জানল না এর মানে?

সাধুশেখর চুপ করে থাকেন।

কিরীটী কি ভেবে তারপর আবার প্রশ্ন করে—

যদি কিছু মনে না করেন, উইলে মোটামুটি কি ব্যবস্থা—যদি বলেন?

একমাত্র আমার ছেলে অমিয়শঙ্কর ছাড়া সকলেই দাদার সম্পত্তিতে অধিকারী সমানভাবে। অমিয় কেবল মাসে দেড়শো করে টাকা—যতদিন বেঁচে থাকবে—মাসোহারা পাবে।

কেন? অমিয়বাবুকে তিনি হঠাৎ বিষয় থেকে বঞ্চিত করলেন যে?

ইদানিং অমিয় রেস খেলতে সুরু করেছিল। দাদা আর আমরা স্বামীস্ত্রীতে তাকে অনেক বুঝিয়েও ফেরাতে পারিনি। দাদাকে শেষে বাধ্য হয়েই এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তাঁর এক কষ্টের উপার্জিত সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পর ঘোড়ার পিছনে তচনচ হবে, এ তিনি সইতে পারেননি।

ও! আচ্ছা, আপনার স্ত্রীও তো সম্পত্তির সমান একজন অংশীদার?

হ্যাঁ!

আচ্ছা, রাত বারটার সময় একটা চীৎকার শুনতে পেয়েছিলেন?

না। আমি তখন ঘুমিয়ে।

আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন। আপনার স্ত্রীকে আমরা আলাদা ক'টি প্রশ্ন করতে চাই—আপনার আপত্তি আছে?

না। ওঁর যদি কোন আপত্তি না থাকে—

স্বামীর কথায় সুনয়নী দেবী মুখ তুলে তাকালেন। কিরীটী বললে, দু'চার মিনিটের বেশী লাগবে না—বৌদি। আপনাকে দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করেই ছেড়ে দেবো।

সাধুশেখর ঘর থেকে চলে গেলেন।

আপনি কোন চীৎকার শুনতে পেয়েছিলেন বৌদি গতরাত্রে?

না! দৃঢ় সংযত কণ্ঠে সুস্পষ্ট জবাব!

আপনার স্বামী সাধুবাবু কাল রাত্রে কখন বাড়ী ফিরেছিলেন?

কিরীটীর দ্বিতীয় প্রশ্নে সুনয়নী দেবী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, উনিই তো একটু আগে সে কথা আপনাদের বলে গেলেন।

না বৌদি আপনি তো জানেন উনি—মানে আপনার স্বামী সত্যকথা বলেননি। সহসা কিরীটীর কথাগুলো যেন মেঘাবৃত আকাশে অশনি সম্পাতের মতই শোনাল।

সত্যিকথা বলুন যদি এখনও আপনার প্রিয়জনকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে চান।

ফাঁসি! একটা অর্ধস্ফুট আর্তচীৎকারে বেরুলো সুনয়নী দেবীর কণ্ঠ চিরে।

হ্যাঁ, ফাঁসি! হত্যা অপরাধে আইনে ফাঁসিই হলো শাস্তি।

না, না! আমি কিছু জানি না! আমি কিছু জানি না! অসহ্য কান্নার ভাবে সুনয়নী দেবী ভেঙে পড়লেন।

মৃতদেহ তখনও তেমনি ঘরের মধ্যে কেদারায় পড়ে আছে। তালুকদার দলবল-সহ প্রস্থান করেছেন। ওঁরা থানায় পৌঁছে মৃতদেহ ময়নাঘরে নেবার ব্যবস্থা করাবেন। দরজার সামনে একজন পুলিশ কেবল প্রহরায় মোতায়েন। কিরীটী একা এখনও ঘর ত্যাগ করেনি—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মৃতদেহের মুখের দিকে চেয়ে ছিল কি নিষ্ঠুর ভয়াবহ পৈশাচিক হত্যা! দেহের কোথাও struggle-এর চিহ্ন পর্যন্ত নেই! যেই হত্যা করে থাকুক, সে মৃত শশাঙ্কশেখরের একান্ত পরিচিত এবং পরিচিত যারা এ বাড়ীর সকলেই তাঁর আত্মীয় এবং সেদিক দিয়ে সকলের পক্ষেই তাঁকে হত্যা করা সম্ভব! কিন্তু কে? সাধুশেখর? সুনয়নী দেবী? বিজয়? বিনয়? অমিয়? এদের মধ্যে কার পক্ষে শশাঙ্কশেখরকে হত্যা করা বেশী সম্ভব? শশাঙ্কশেখরের মৃত্যুতে কে বেশী interested? এদের মধ্যে যদি কেউ করে থাকে, motive (উদ্দেশ্য) তার কতখানি তীব্র ছিল অন্যের চেয়ে? চিন্তান্বিত কিরীটী ঘরের মেঝেটা পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ তার নজরে পড়লো ছোট ছোট ক'টা কাচের টুকরো ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত। সযত্নে মেঝে থেকে কাচের টুকরোগুলো খুটে খুটে তুলে একটা কাগজে মুড়ে পকেটে রেখে দিল কিরীটী। জলের গ্লাসটা। গ্লাসে আধাআধি জল এখনও পড়ে রয়েছে। শয্যা দেখে মনে হয়, গতরাত্রে শয্যায় তিনি একেবারেই শোন নি। রাত্রে সাধারণত এগারটার আগে শুতেন না, সেকথা সে নিজেও জানে। তারপর কেদারাটা!

বিজয়শেখর কক্ষে প্রবেশ করলেন, মিষ্টার রায়?

কে বিজয়বাবু। আসুন!

কাকামণির মুখে জ্যেঠার খবর আপনি শুনেছেন?

হ্যাঁ! কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, বিজয়বাবু?

কি?

ঐ কেদারাটা—যেটার উপর এখন মৃতদেহ রয়েছে!

আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছেন না। হরেকেষ্ট সে যখন গতরাত্রে জল নিয়ে আসে কেদারাটা ঐ জানলার সামনে ছিল এবং শশাঙ্কশেখর ঐখানেই কেদারাতে পিছন ফিরে বসে ছিলেন তবে কেদারাটা এখানে এলো কি করে?

তারপর হয়ত কোন এক সময় জ্যেঠামশাই আবার কেদারাটা এখানে টেনে নিয়ে এসে বসেছিলেন! এমনও তো হতে পারে।

হতে পারে ত সবই! কিন্তু তা হয়নি এক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত রাত্রে যে ঘাসের স্লিপারটি উনি ব্যবহার করতেন where is that pair of slipper? It could not vanish in air ! তারপর ঐ blessed চীৎকার—বাড়ীর আর কেউ শুনতে পেল না? No, No I can't believe it ! It's damn lie ! মিথ্যা কথা! বলতে বলতে কিরীটী হঠাৎ চুপ করে যায়। এবং মিনিট কয়েক গুম হয়ে বসে থেকে আবার বলে, যদি কিছু মনে না করেন, আপনারা জ্যেঠামশায়ের লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে লালবাজারে মিষ্টার তালুকদারকে আমার হয়ে যদি ফোন করে বলে দেন—কাল সকালেই অতি অবশ্য আমার সঙ্গে যেন একবার তিনি দেখা করেন। সে আবার বলে গেল, আজ দুপুরে বাইরে কোথায় যাবে।

নিশ্চয়! এখুনি যাচ্ছি! বিজয়শেখর চলে গেলেন ফোন করতে।

কিরীটী চট করে কক্ষ সংলগ্ন বাথরুমের ভেজানো দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে মেঝের দিকে তাকাতেই সোল্লাসে অর্ধস্ফুট চীৎকার করে উঠলো, ইউরেকা!

সঙ্গে সঙ্গেই নিচু হয়ে কিরীটী বাথরুমের মেঝে থেকে শশাঙ্কশেখরের ঘাসের স্লিপার জোড়া তুলে সোজা জামার পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল এবং আলো জ্বেলে বাথরুমটা ভালো করে আর একবার দেখলো।

প্রায় মিনিট পনের পরে বিজয়শেখর ফোন করে ঘরে ফিরে এলেন।

ওদিকে ময়নাঘরে মৃতদেহ নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী এলো।

॥ চার ॥

দিন সাতেক পরের কথা।

কিরীটী তার শয়নকক্ষে একা বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা বাংলা নভেল পড়ছিল। বেলা প্রায় এগারটা। জংলী এসে সংবাদ দিল—সাধুশেখরবাবু এসেছেন দেখা করতে চান।

এই ঘরে নিয়ে আয়।

সাধুশেখর এলো। কিরীটী আহ্বান করলো, আসুন। তারপর হঠাৎ এ সময়ে যে?

গতকাল তালুকদার সাহেব আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন—একটা ঘরে তিনি

একা অমিয়র সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে কি সব কথাবার্তা বলেন। যাবার সময় বলে গেছেন—আপাতত কিছুদিনের জন্য নাকি অমিয়কে বাড়ীতে নজরবন্দী থাকতে হবে। এই সব কি কিরীটীবাবু? পুলিশ কি অমিয়কে খুনী বলে সন্দেহ করেছে?

পুলিশের মনের খবর আমি জানব কি করে বলুন মিষ্টার চৌধুরী?

But this is horrible ! অমিয় আমার ছেলে! সে রেস খেলতে পারে—গোল্লায় যেতে পারে—তা বলে এমন হীন কাজ সে করবে না, আমি হলফ করে বলতে পারি কিরীটীবাবু।

সে কথা আমার কাছে বলে তো কোন লাভ নেই মিষ্টার চৌধুরী! আমি কি করতে পারি এক্ষেত্রে বলুন?

দোহাই আপনার! তালুকদার সাহেব আপনার বন্ধু—তাছাড়া আমাদের বাড়ির সকলকে আপনি তো ভালো করেই চেনেন! আর—

আর?

উইলের কথা সে তো ঘুণাক্ষরেও জানত না।

য়্যাঁ! কি বলছেন আপনি?

বলছিলাম অমিয় তো জানত না দাদার উইলের কথা?

উহুঁ জানত!

য়্যাঁ!

হ্যাঁ, আপনি বলছেন বটে একথা কিন্তু আমি বলছি মিষ্টার চৌধুরী, আপনার ছেলে জানতেন তিনি জ্যেঠার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তারপর একটু থেমে আবার কিরীটী বলে, তাছাড়া অতক্ষণ পর্যন্ত সে রাত্রে তিনি কোথায় ছিলেন কি করছিলেন সব কথা খুলে না বললে, আমি কোন সাহায্যই করতে পারবো না।

কিরীটীবাবু?

আপনার ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবেন?

কিন্তু সে যে নজরবন্দী।

সেজন্য ভাবতে হবে না। আমি তালুকদারকে বলে দেবো ফোনে।

বিকেলের দিকে অমিয়শেখর এসে হাজির হলেন কিরীটীর ওখানে।

কিরীটী শশাঙ্কশেখরের সুরতহাল রিপোর্টটা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল—পদশব্দে মুখ তুলে বললো, আসুন অমিয়বাবু।

আপনি আমাকে ডেকেছিলেন?

হ্যাঁ! কাজের কথা সুরু করা যাক। আপনি জানেন পুলিশ আপনাকে আপনার জ্যেঠামশায়ের হত্যার ব্যাপারে suspect করেছে।

জানি! কিন্তু I don't care for that !

ছেলেমানুষী করবেন না অমিয়বাবু! Speak out the truth. এ সন্দেহ থেকে যে কি হতে পারে আর কি না হতে পারে, কেউ বলতে পারে না! তাছাড়া আপনারা সকলেই চান, যে লোক সারা জীবনের শ্রম আর অধ্যবসায় দিয়ে সমস্ত

চৌধুরী পরিবারকে দাঁড় করিয়ে গেলো, তাঁর এই নিষ্ঠুর হত্যা ব্যাপারের একটা মীমাংসা হোক—প্রকৃত অপরাধী দণ্ড পাক? কেমন তাই কিনা?

জংলী এসে খবর দিল, বিজয়বাবু এসেছেন।

যা এই ঘরেই তাকে পাঠিয়ে দে!

একটু পরে বিজয়শেখর এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

আসুন বিজয়বাবু! অমিয়বাবুকে একটু আগে বলছিলাম, সব কথা আমাকে খুলে বলতে শশাঙ্কশেখর আপনাদের জ্যেঠামশাই—আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন—তাছাড়া আপনাদের সকলেরই আমি হিতাকাঙ্ক্ষী—সে দিক থেকেও আমি আশা করতে পারি আপনারা সব কথাই আমাকে খুলে বলবেন!

অবুঝ হোস না অমু! কিরীটীবাবু তো ঠিক কথাই বলেছেন। মিষ্টার রায়কে সব কথা খুলে বল।

বিজয়শেখর অমিয়বাবুকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বললেন।

তুমি কি বলছো দাদা? তুমিও কি তাহলে সন্দেহ করো, আমি জ্যেঠামশাইকে হত্যা করেছি? অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় অমিয়বাবুর মুখখানা যেন থম থম করতে থাকে।

এরপর সকলেই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে তারপর হঠাৎ কিরীটীই নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠে, শুনুন অমিয়বাবু, সেরাত্রে আপনি সিনেমাতে যান নি। কোথায় গিয়েছিলেন, বলুন তো।

সিনেমাতে যাইনি? বিস্মিতভাবে তাকাল অমিয়বাবু কিরীটীর মুখের দিকে।

না! তার প্রমাণ আছে আমার হাতে। আপনাদের দারোয়ান লালসিং আপনাকে রাত সওয়া নটা নাগাদ বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছে একথা সত্যি কিনা?

কিরীটীর কথা শুনে অমিয়বাবু সহসা যেন বৈদ্যুতিক শক খাবার মত নিশ্চল হয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ কিরীটীর দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

অমিয়বাবু, এখন বোধহয় বুঝতে পারছেন Why the police suspects you?

সে কি! তবে তুই মিথ্যা বলেছিস অমু। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিজয়শেখর প্রশ্ন করলেন।

হাঁ! কিরীটীবাবু ঠিকই বলেছেন সিনেমাতে সে রাত্রে আমি যাই নি!

তবে?—

আমি বাড়ীতেই ছিলাম। আর—আর রাত্রি সওয়া দশটা নাগাদ জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখাও করেছিলাম। মুহ্যমানের মত অমিয় যেন বলে গেল কথাগুলো।

জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলি কেন?

মাসখানেক আগে হঠাৎ একদিন মা আর বাবার কথা শুনে বুঝতে পারি, জ্যেঠামশাই আমাকে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন! কেন আমাকে বঞ্চিত করবেন, জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলাম।

তারপর? বিজয়শেখর প্রশ্ন করেন।

আমার কথা শুনে জ্যাঠামশাইকে বললেন, তিনি যা ভালো বুঝেছেন তাই করেছেন। তখন ইচ্ছা হয়েছিল, তাঁকে!—তাঁকে—খুন করি।

কি সর্বনাশ!

এবারে বোমার মতই যেন ফেটে পড়লো অমিয়।

সর্বনাশ কেন? কেন তিনি আমাকে বঞ্চিত করবেন? কি আমার অপরাধ! রেস কি শুধু একা আমিই খেলি? তাঁর আর সব ভাইপোরা সাধু? তাদের কারো কোন দোষ নেই? তবে? কেন! আমি সইবো এ অন্যায় অবিচার?

মুহূর্তে ঘরের সমস্ত আবহাওয়া যেন বিষিয়ে উঠলো!

ঐদিন রাত্রি প্রায় সাড়ে নটা—শশাঙ্কশেখরের গৃহে।

শশাঙ্কশেখরের ঘরে উপস্থিত সাধুশেখর, বিজয়, বিনয়, অমিয়শেখর আর সুনয়নী দেবী।

ঘরের মধ্যে কিরীটী বলছিল, পুলিশ অমিয়কে একা নজরবন্দী করে রাখলেও আসলে আপনারা সকলেই পুলিশের নজরবন্দী। কারণ, আপনাদেরই মধ্যে আছে খুনী।

সাধুশেখর চীৎকার করে উঠলেন, এ আপনি কি বলছেন কিরীটীবাবু? আমরা আমাদের সবচেয়ে যিনি আপন, তাঁকে খুন করেছি!

হাঁ! মানুষের শুভবুদ্ধি যখন দুর্বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয়, তখন কোন নীচ কাজ নেই, যা মানুষ করতে পারে না।

কিন্তু, এ যে সাংঘাতিক কথা! বিজয়বাবু বললেন।

শুনুন, আমি অনুমানে বলতে পারি, সে রাত্রে আসলে কি ঘটেছিল। রাত্রি সওয়া নটার সময় অমিয়বাবু তাঁর জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং উইল সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। অমিয়বাবু ভয়ানক চটে ওঠেন এবং হয়ত তাঁকে মৃত্যুভয়ও দেখান। অমিয়বাবুর সঙ্গে যখন কথা কাটাকাটি হচ্ছিল, সে সময় সুনয়নী দেবী ছিলেন দরজার বাইরে!

হঠাৎ সাধুশেখর প্রশ্ন করলেন তাঁর স্ত্রীকে—এ কথা সত্য?

হাঁ! আমি ওঁর ঘরের দিকে আসছিলাম—রাত্রে কিছু খাননি, অন্তত এক কাপ দুধ খাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে।

অমি অমন ধরনের কোন কথা বলেছিল?

হাঁ। খুন করবে বলে শাসিয়েছিল! রেগে ঘর থেকে ও যখন বেরিয়ে যায়—আমাকে দেখতে পায়নি ও!

হা ভগবান। সাধুশেখর দু'হাতে মুখ ঢাকলেন।

কিরীটী বলতে লাগল, রাত্রি সাড়ে নটার পর এবং সওয়া দশটার মধ্যে শশাঙ্ক-শেখরবাবু খুন হয়েছেন। বিজয়বাবু তাঁর জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে দেখা করে আসবার পরই বোধহয় তিনি নিহত হন!

সে কি! তবে যে হরেকেষ্ট বললে, জ্যেঠার সঙ্গে সে কথা বলেছে—তিনিও তার উত্তর দিয়েছেন! বিজয়শেখর প্রশ্ন করলেন।

That is not correct ! হরেকেষ্ট যখন জল নিয়ে এঘরে আসে, শশাঙ্কশেখর was already dead ! মৃত। জানলার কাছে কেদারাটাকে টেনে নিয়ে মৃতদেহটাকে কায়দা করে কেদারার উপর পিছন ফিরিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। কিরীটী বললে।

তবে তার কথার জবাব দিয়েছিল কে?

খুনী। He was somewhere in this room—লুকিয়েছিল? শশাঙ্কশেখর হরেকেষ্টর কথার জবাবে কেবল 'হাঁ' আর 'না' দুটি কথা বলেছিলেন! হরেকেষ্টর মনে কোন সন্দেহ হয়নি। তারপর হরেকেষ্ট যখন চলে গেল, তখন খুনী নিশ্চয় আবার কেদারাটাকে টেনে ঘরের মাঝখানে এনে রাখে। খুনী যতই চালাক হোক না কেন, আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে সে! বলতে বলতে সহসা কিরীটী পকেট থেকে শশাঙ্ক-শেখরের ব্যবহৃত ঘাসের স্লিপার জোড়া বের করে বলে, এই স্লিপার জোড়াই খুনের প্রমাণ এবং এছাড়া এই ঘরের মধ্যে এমন একটি প্রমাণ সে রেখে গেছে অজ্ঞাতে, যাতে করে তাকে আমাদের সনাক্ত করতে আদপেই বেগ পেতে হবে না। বলতে বলতে কিরীটী স্লিপার জোড়া টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল।

তারপর আবার বলতে সুরু করল, রাত বারটার সময় একটা আর্ত চীৎকার শোনা যায়। একমাত্র বিজয়বাবু ছাড়া দ্বিতীয় কেউ সে চীৎকার শুনতে পাননি! কথা হচ্ছে, চীৎকারটা সত্যই হয়েছিল কিনা? আমি বলছি, হাঁ!—চীৎকার করেছিলেন সুনয়নী দেবী।

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হলো।

॥ পাঁচ ॥

কিরীটী একা চেয়ারে বসে ছিল। আর সকলেই তার নির্দেশে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

হঠাৎ ভেজানো দরজা ঠেলে সুনয়নী দেবী কক্ষে প্রবেশ করলেন।

আসুন বৌদি।

আমার ছেলেকে বাঁচান, ঠাকুরপো। আমি মা, আমি ভগবানের নামে বলছি, আমি এ পাপ করিনি।

কিন্তু এখনো আপনি আমাকে বলেন নি বৌদি, সেরাত্রে বারোটার সময় আপনি আবার এ ঘরে এসেছিলেন কেন?

হতভাগা অমিয়কে বাঁচাতে। ও কথা শোনবার পর তার উপর আমি নজর রেখেছিলাম। আর মাঝ রাত্রে হঠাৎ তাকে একা ঘর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে এ ঘরের দিকে আসতে দেখে আমি আসি তার পিছনে পিছনে অনুসরণ করে। সে আগেই এ ঘরে আসে—ঘরে ঢুকেই দেখি অমির হাতে পিস্তল...ভাসুরের পিছন দিকে উঁচিয়েছে। দেখে চীৎকার করে উঠি! কিন্তু—কিন্তু—

জানি, সে চীৎকার শুনে হঠাৎ আপনার [illegible] বোধহয় ভয় পেয়ে পালাতে যায়। যার ফলে ধাক্কায় জলের গ্লাসটা পড়ে ভেঙে যায়, এবং আপনি তখন আর একটা গ্লাসে জল এনে রেখে দিয়ে কাচের টুকরোগুলো তুলে নিয়ে জল মুছে চলে যান এঘর থেকে। কিন্তু কেন?

কারণ, জলের গ্লাসটা ভাঙা দেখলে আর আমার চীৎকার যদি কেউ শুনে থাকে, সন্দেহ হতে পারে এই ভেবে।

সন্দেহ কিসের? আপনি তো তখনও জানতেন না যে শশাঙ্কশেখর মারা গেছেন?

জানতাম না বটে, তবে আমার ছেলে ঘর থেকে চলে যাবার পরই আমার কেমন সন্দেহ হয়—চীৎকারের শব্দেও আমার ভাসুর কোন সাড়া দিলেন না কেন? কাছে এগিয়ে যেতে সব বুঝতে পারি। আর সেইজন্যই আর একটা গ্লাসে জল এনে রেখে দি।

ইতিমধ্যে কখন একসময় বিজয়শেখর কক্ষ মধ্যে এসে প্রবেশ করেছেন সুনয়নী দেবী না জানতে পারলেও কিরীটী লক্ষ্য করেছিল।

এবারে বিজয়শেখর হঠাৎ প্রশ্ন করল, তবে জলের গ্লাস থেকে জল খেলো কে?

পরে আপনার এ প্রশ্নের জবাব দেবো বিজয়বাবু। রাত অনেক হলো। আজকের মতো বিদায় নেবো। এরপর সকলকে ঘর থেকে বিদায় করে দরজায় চাবি লাগিয়ে কিরীটী বিদায় নেবার আগে আর একবার সুনয়নী দেবীর সঙ্গে গোপনে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে গেল।

অন্ধকার রাত্রির বুকে জেগে কৃষ্ণাচতুর্দশীয় চাঁদ। রাত বোধকরি দুটো হবে। কিরীটী আর তালুকদার নিঃশব্দে শশাঙ্কশেখরের ঘরে প্রবেশ করে খাটের বাঁদিকে যে আলমারীটা ছিল, তার পশ্চাতে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে লাগল।

সমস্ত বাড়ীটাই যেন কবরখানার মত নিঃস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ঝিম-ঝিম করছে রাত্রির নিঃশব্দতা। চাঁদের সামান্য একটু আবছা আলো খোলা জানালা পথে যা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে।

তালুকদারকে কিরীটী বলছে, তাকে আসতেই হবে। যখন সে জেনেছে, ঐ স্লিপার জোড়াই একমাত্র প্রমাণ নয়, তাছাড়াও এ ঘরে এমন কোন চিহ্ন রেখে গেছে, যাতে করে সনাক্ত করতে আমাদের এতটুকু বেগ পেতে হবে না এবং এসব ক্ষেত্রে খুনীর সাইকলজি যা হয়—তাকে সেই মারাত্মক চিহ্নটি সরাবার জন্য আসতেই হবে।

হঠাৎ এমন সময় বাথরুমের দিক থেকে সতর্ক পায়ের চাপা শব্দ শোনা গেল! কিরীটী সজাগ হয়ে ওঠে। ঐ আসছে! নিঃশব্দ সতর্ক পদসঞ্চারে দীর্ঘ সাত দিন ও সাত রাত্রির পরে খুনী আবার এই ঘরে পদার্পণ করছে।

সত্যই সে এলো—অন্ধকারে অস্পষ্ট আবছা দিয়ে ঘেরা। সর্বাঙ্গ কালো একটা চাদর মুড়ি দেওয়া। চাদরখানা টেনে মুখের নিম্নাংশ পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে। যেখানে কিরীটী ঘণ্টাখানেক আগে টি'পয়ের উপর স্লিপার জোড়া রেখে গিয়েছিল, সেটার

সামনে এসে দাঁড়াল সে। হাত বাড়িয়ে স্লিপার জোড়া তুলে নিল—সঙ্গে সঙ্গে একটু চাপা হাসি এবং কিরীটীর কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ, You game is up my dear friend ! পাঁচ সেলের হান্টিং টর্চবাতির আলোর ঝাপটা খুনীর চোখে-মুখে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল! একটা আর্ত অস্ফুট চীৎকার! কিরীটী বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে দু হাতের-লৌহ বেষ্টনীতে বেঁধে ফেলল আগন্তুককে, বলল—চাঁদের আলো আছে—ঘরে, বাড়ীর সকলকে ডাকো তালুকদার।

বিস্মিত হতচকিত সকলে। ঘরে বাতি জ্বালা হয়নি—শুধু চাঁদের ক্ষীণ আলো। সেই অস্পষ্ট আলোছায়ায় সবাই দেখল চেয়ারের উপর কালো চাদরে মুখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ ঢাকা কে একজন বসে আছে নিঃশব্দে।

আসুন সকলে! খুনীকে পাওয়া গেছে। লজ্জায় কালো কাপড়ে মুখ ঢেকেছেন। ঘরে আলো জ্বেলে ওঁর অবগুণ্ঠন মোচনের আগে প্রকৃত ব্যাপারটা সংক্ষেপে আপনাদের খুলে বলতে চাই। আগেই আমি বলেছি খুনী আপনাদের মধ্যেই একজন। কেন? তার কারণ আপনারা ছাড়া বাইরের কেউ জানত না যে, শশাঙ্কশেখর diabetis (বহুমূত্র) রোগে ভুগছিলেন—ঘন ঘন তাঁকে বাথরুমে যেতে হতো ; খুনী took that chance এবং বাথরুমের মধ্যে আত্মগোপন করে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। অমিয়বাবু সেরাত্রে এঘর থেকে চলে যাবার পর শশাঙ্কশেখর উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাই জল খেয়ে বাথরুম যান। বাথরুমে গিয়ে আলো জ্বালতেই খুনী অতর্কিতে পিছন দিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করে—রেশমী সুতোর গুচ্ছ দিয়ে গলায় ফাঁস লাগায়। দ্বিতীয়ত, এবাড়ির সংস্থান আর নির্মাণ এমন যে একমাত্র এ বাড়ীর লোক ছাড়া বাইরের কারো পক্ষেই তাঁর শয়নকক্ষের মধ্য দিয়ে কিংবা বাইরের দেওয়াল বেয়ে বাথরুমে এসে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব। যখনই আমি স্থির নিশ্চিন্ত হলাম যে বাড়ীর মধ্যেই একজন খুনী, তখনই ভাবতে সুরু করি সে কে! সকলের movements চেক্ করে বুঝলাম আপনাদের মধ্যে একমাত্র ইনি ছাড়া আর কারও পক্ষে সে রাত্রে হত্যা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু হত্যার motive থাকা প্রয়োজন। সেটা? শুনলে আশ্চর্য হবেন—সামান্য বোঝবার ভুল। শশাঙ্কশেখরের উইলে অমিয়বাবুকে বঞ্চিত করবার প্রধান কারণই ছিল তাঁকে কানভাঙানী দেওয়া। স্নেহদুর্বল চিত্ত শশাঙ্কশেখরের। অমিয় সম্পর্কে নানা কথা শুনতে শুনতে তাঁর মন বিকল হয়ে ওঠে—ফলে অমিয়কে তিনি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু খুনী একটা জিনিষ জানত না—শশাঙ্কশেখরের চিত্ত স্নেহদুর্বল এবং তিনি কানপাতলা হলেও ভীষণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন লোকটা—এবং একদিন he smelt the rat এবং ব্যাপারটা যে বহুলাংশে হিংসায় হয়েছে, তা বুঝতে তাঁর দেরী হলো না। শশাঙ্কশেখর তখন খুনীকে একদিন মুখোমুখি charge করলেন এবং তাঁকেও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন, সেকথা জানিয়ে দিলেন। খুনী এইখানেই মারাত্মক ভুল করলো—সে ভাবলো, ওটাই বুঝি শশাঙ্কশেখরের সত্যিকারের অন্তরের কথা। পাছে সত্যই শশাঙ্কশেখর দ্বিতীয় একটা উইল করেন, এই ভয়ে অতর্কিতে পেছন থেকে গলায় ফাঁস জড়িয়ে তাকে খুন করল। ও ঝগড়ার

ঘটনাটা সুনয়নী দেবী ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানতেন না। আজই রাত্রে তিনি সে কথা তোমাকে বলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খুনের উদ্দেশ্যও আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তালুকদার, ঘরের আলোটা এবারে জ্বালো। শশাঙ্কশেখরের পায়ে চটি না থাকতেই আমি বুঝেছিলাম—he was murdered in the bathroom—তাছাড়া সেখানে খুন করাই ছিল সব চাইতে নিরাপদ খুনীর পক্ষে।

দপ করে ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। হাত বাড়িয়ে কিরীটী তখন খুনীর মুখ থেকে কাপড়টা টেনে নিয়ে বলতে সুরু করলো, বিজয়বাবু, ভেবেছিলেন নিজে থেকে আমার কাছে সাফাই গাইতে পারলেই বুঝি আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন! একটা কথা কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন—যে লোক সাধারণত রাত্রি দশটার বেশী জাগে না—সে হঠাৎ সেদিন রাত বারটা পর্যন্ত জেগেছিল কেন? চীৎকার শুনতে কি?

কি করে বুঝলে কিরীটী যে বিজয়বাবুই খুনী? তালুকদার প্রশ্ন করলো।

By simple analysis! বিনয়বাবু হত্যা করতে পারেন না—কারণ তিনি থাকতেন একেবারে শেষদিককার ঘরে! সেখান থেকে শশাঙ্কশেখরের ঘরে ঢুকতে হলে একমাত্র ঐ দরজা ছাড়া উপায় ছিল না এবং সে ক্ষেত্রে ঘরে ঢুকে হত্যা করে দরজা বন্ধ করে বেরুবারও উপায় ছিল না। তারপর অমিয়বাবু! তিনি যে খুন করেননি তার প্রমাণ তাঁর movements। সাধুবাবু আর সুনয়নী দেবীর movementsও তাদের নির্দোষিতার প্রমাণ। বাকী বিজয়বাবু। সামান্য একটা পরীক্ষা করেছিলাম খুনীকে স্রেফ একটা ধাপ্পা দিয়ে যে, খুনী এমন একটা চিহ্ন এ ঘরে রেখে গেছে, যাতে করে তাকে সনাক্ত করতে আমাদের এতটুকুও বেগ পেতে হবে না এবং নির্ভুলভাবেই উনি আমার ফাঁদে পা দিলেন। বিধাতার দণ্ড এমনি করেই পাপীর মাথায় পড়ে। সাধুবাবু, আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে। এবারে তালুকদার সাহেবের সঙ্গেই আপনাদের আলোচনা। আমি আসি।

স্তম্ভিত মুহ্যমান সকলকে ঘরের মধ্যে রেখে কিরীটী ধীরপদে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো অন্ধকারের সকল রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছে।

বিজয়শেখর তাঁর জ্যেঠামশাইয়ের হত্যাপরাধের কলঙ্ক এবং দুর্নিবার লজ্জা মাথা পেতে নিলেন।

পদ্মদহের পিশাচ

সিতাংশুকে শেষ পর্যন্ত কলকাতার সহরের মায়া কাটাতেই হলো। শহরে ঘুরে ঘুরে দুবছর ধরে বিশেষ কোন সুবিধাই যখন করতে পারলে না এক প্রকার বাধ্য হয়েই তাকে পিতার জমিদারীতে ফিরে আসতে হলো। জমিদারীর অবস্থা যাই হোক এখনো সেখানে গিয়ে থাকতে পারলে সুখে সাচ্ছন্দেই কেটে যাবে। নায়েব নরেনবাবুকে একটা তার করে দিয়ে একটা দিন দেখে রওনা হয়ে পড়ল সিতাংশু, স্ত্রী রমা ও একমাত্র পুত্র চম্পককে নিয়ে।

ষ্টেশনে এসে যখন ওরা নামল প্রকৃতি জুড়ে তখন ঝড় জলের যেন তাণ্ডব চলছে। দরোয়ান গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। যাহোক আর অপেক্ষা না করে সেই ঝড় জলের মধ্যেই রওনা হয়ে রাত প্রায় বারোটার সময় জমিদার বাড়ীর গেটে এসে গাড়ী থামল। বৃষ্টিটা তখন প্রায় ধরে এসেছে। নায়েব নরেনবাবু ও বাপের আমলের পুরানো চাকর জগা গাড়ীবারান্দায় অপেক্ষা করছিল। প্রকাণ্ড টানা বারান্দা, ঝোলানো বাতিক স্বল্পালোকে আবছা আলো ও আঁধারে সমগ্র বারান্দাটি কেমন যেন থমথমে ও নিঃসঙ্গ মনে হয়।

নায়েব নরেনবাবুর বয়স যথেষ্টই হয়েছে। তিনি গত মহাযুদ্ধে গিয়ে বাঁ-হাতটা হারান ও বিষাক্ত গ্যাসে বাঁ দিকের গালটা পুড়ে কুঁচকে একেবারে বিশ্রী হয়ে যায়। অস্পষ্ট আলোয় লোকটার দিকে তাকালে বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন কেমন ছ্যাঁৎ করে ওঠে। তাঁর বাঁ হাতের জায়গায় একটা রবারের হাত লাগান ; দেখালে প্রথমটা ঠিক বোঝা

যায় না। সিতাংশু গাড়ী হতে নামতেই নরেনবাবু এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন, আসুন! আসুন! পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?—

না—।

এমন সময় রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ছাপিয়ে সহসা একটা আকাশপাতাল ফাটান বীভৎস চীৎকার শোনা গেল। সিতাংশু চমকে উঠল। চম্পক এতক্ষণ মার কোল ঘেঁষে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল। সেও চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল, ও কি বাবা?

সিতাংশু যে কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। বারান্দার অস্পষ্ট আলোয় স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে সিতাংশু দেখলে তার মুখেও যেন রক্তের লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই।

বাইরে টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে। থেকে থেকে কালো আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ লক্‌লকিয়ে উঠেছে। মেঘের গুরু-গুরু গর্জন আর ব্যাঙ ও ঝিঁঝির একঘেরে ডাক শোনা যায়।

কিছুক্ষণ একটা জমাট স্তব্ধতা তারপর নরেনবাবুই প্রথমে কথা বললেন, গভীর রাতে পদ্মদহ হতে ঐ রকম বীভৎস চিৎকার মাঝে মাঝে শোনা যায়। এখানকার লোকদের বিশ্বাস ঐ পদ্মদহের জলের মধ্যে নাকি দৈত্য বাস করে; সেই মাঝে মাঝে গর্জন করে উঠে।

এতক্ষণে সিতাংশু নিজেকে অনেকটা সামলে উঠেছে—

নরেনবাবুর কথা শুনে হাঃ-হাঃ করে হেসে বলে, ইডিয়ট! এখনও—এই বিংশ শতাব্দীতেও এসব গাঁজাখুরী গল্প চলে নাকি?

নরেনবাবু বোকার মত কেবল জবাব দেয়, আজ্ঞে!

যাহোক সে রাত্রের মত তাড়াতাড়ি কোন মতে খাওয়া দাওয়া সেরে যে যার মত গিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিল। ভোরবেলা যখন সিতাংশুর ঘুম ভাঙ্গল খোলা জানালা পথে শির-শির করে কেমন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। সিতাংশু এসে ঘরের পূবমুখো খোলা জানালার কাছে দাঁড়াল। বৃষ্টি-ধৌত প্রকৃতি প্রভাতের সোনালী আলোয় শুচি-স্নান করছে যেন। দিগন্তপ্রসারী পদ্মদহের বুকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি সূর্যের সোনালী আলোয় ঝিক্‌মিক করছে! নয়নাভিরাম সে দৃশ্য! ইতিমধ্যে এক সময় রমলা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, সিতাংশু টেরও পায়নি। সিতাংশু হাসতে হাসতে বললে, দেখছো রমু।—এই জন্যেই বোধহয় ঠাকুর্দ্দা এই মায়ার ফাঁদে ধরা দিয়েছিলেন।

সারা সকাল ও দুপুরটা সিতাংশুর জমিদারী সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতেই কেটে গেল। সিতাংশু অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। জমিদারীর আয় ভালই এখনো, দেখাশুনা ভাল করে করতে পারলে যথেষ্ট অর্থাগম হবে।

গভীর রাতে আবার সহসা সেই আকাশ-পাতাল-ফাটান বীভৎস চীৎকারে সিতাংশুর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সিতাংশু ধড়ফড় করে শয্যায় উঠে বসল। চেয়ে দেখে

স্ত্রী রমলাও শয্যার উপর উঠে বসেছে। সমগ্র মুখখানি জুড়ে তার সেই পূর্ব রাতের আতঙ্ক।

সিতাংশু শয্যা হতে নেমে খোলা জানালাটার কাছে এসে দাঁড়াল। বাইরে অস্পষ্ট চাঁদের আলো। সেই আবছা চাঁদের আলো পদ্মদহের বুকে কেমন যেন একটা ভয়াবহ নির্জনতার সৃষ্টি করেছে।...

কিন্তু সহসা অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ও কি দেখা যায়? কী? ওটা কী? সিতাংশু হাতের পাতা দিয়ে চোখ দুটো ভাল করে একবার রগড়ে নিল। না—এ তো স্বপ্ন নয়!...

প্রকাণ্ড—হাত বারো-তের লম্বা—আগাগোড়া সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা মানুষের মত মূর্তি পদ্মদহের ধার দিয়ে দিয়ে হেলে দুলে হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে—লম্বা লম্বা পা ফেলে। সাধারণ মানুষ কখনও এত লম্বা বা ঢ্যাঙ্গা হয়? এক একটা পা ফেলছে বোধহয় হাত পাঁচ-ছয় দূরে দূরে!

সহসা আবার সেই আকাশ-পাতাল-ফাটান অদ্ভুত চীৎকার! সিতাংশু চমকে চোখ বুজল। যখন সে আবার চোখ মেলে চাইল—সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি আর দেখা যাচ্ছে না, চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে।

সিতাংশু স্তম্ভিত বিমূঢ়!

ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই যেন সিতাংশু বুঝে উঠতে পারে না।

হঠাৎ পাশ ফিরে তাকাতেই সিতাংশুর নজর পড়ে ঠিক পাশেই ইতিমধ্যে কখন এসে না জানি দাঁড়িয়েছে স্ত্রী রমলা।

রমলাও কি তাহলে তার মত ক্ষণপূর্বে পদ্মদহের ধার দিয়ে সেই অদ্ভুত মূর্তিটাকে হাঁটতে দেখেছে।

আমার একটা কথা শুনবে?—সহসা রমলা বলে।

বল!

চল আমরা কলকাতাতেই ফিরে যাই—

কলকাতায় ফিরে যাব?

হ্যাঁ! বাবার মৃত্যুর কথা কি তুমি ভুলে গেছো? তুমিই তো একদিন সে কথা আমায় বলেছিলে!

তোমার কি সন্দেহ হয়?

সন্দেহের কথা থাক! কেন যেন আমার মন বলছে এখানে থাকলে বিপদ একটা ঘটবে।

বিপদ। কিসের বিপদ?—বিস্মিত সিতাংশু স্ত্রীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

জানি না তবে—

না রমু! এত সহজে আমি এখান হতে নড়বো না। এর শেষ একটা কিছু না দেখে আমি এ জায়গা ছেড়ে যাবো না। চল রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো—

রমলা স্বামীর কথার প্রত্যুত্তর করে না। নিঃশব্দে শয্যায় এসে শুয়ে পড়ে।

সিতাংশুও এসে শয্যা গ্রহণ করে।

অন্ধকারে দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে তবু দু'জনের চোখে যে ঘুম নেই কারওই তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

॥ দুই ॥

দিন চারেক বাদে সেদিন সকালে!

এখানকার দশ আনার জমিদার যতীন রায় এসেছিল সিতাংশুদের বাড়ীতে বেড়াতে। যতীনের বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশের বেশী নয়, সুশ্রী বলিষ্ঠ চেহারা, শিক্ষিত ও অত্যন্ত মিশুকে ও আমুদে প্রকৃতির লোক।

রমলা ও সিতাংশু দুজনারই যতীনকে বড় ভাল লাগে।

এখানে আসবার পরদিনই বিকালে যতীন নিজে যেচে এসে সিতাংশুর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে গেছে।

যতীন এখনো বিবাহ করে নি। বাড়ীতে বুড়ী পিসি আর চাকরবাকর।

সিতাংশুদের বাড়ীর দোতলার বারান্দায় বসে সিতাংশু, রমলা ও যতীন চা পান করতে করতে গল্প করছিল! তাদের গল্পের বিষয় ছিল—রাত্রের সেই পদ্মদহের ধারে অদ্ভুত মূর্তি ও সেই অদ্ভুত চীৎকার!

এখানে আগের ইতিহাস একটু বলা দরকার।

জমিদারবাড়ীর পাশের প্রকাণ্ড বিলটার নামই 'পদ্মদহ' এবং তার নাম থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে পদ্মদহ। একদা পদ্মদহর সমগ্র জমিদারীই ছিল দীননাথ রায়ের। কোন এক সময়ে তাঁর অবস্থা খারাপ হওয়ায় জমিদারীর ছ' আনা অংশ সিতাংশুর পিতামহ সৌরাংশু চৌধুরীর কাছে বিক্রয় করেন। সৌরাংশু কলকাতায় ওকালতী করতেন। সৌরাংশুর মৃত্যুর পর সিতাংশুর পিতা অরুণাংশুবাবু জমিদার হন।

সিতাংশুর বয়স তখন পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর ; কলেজের পড়া শেষ করে সিতাংশু ওকালতী শুরু করেছে। এমন সময় এক জরুরী তার পেয়ে পদ্মদহে এসে শুনল, তার বাপের মৃতদেহ পদ্মদহের ধারে পাওয়া গেছে। মৃতদেহ তখনও সৎকার করা হয় নি। মৃতদেহের মধ্যে কোথাও কোন ক্ষতের চিহ্নমাত্র ছিল না।...পিতার শেষ কাজ করে সিতাংশু আবার কলকাতায় ফিরে গেল।

তারপর দীর্ঘ চার বছর পরে এবার সে সস্ত্রীক পদ্মদহে এসেছে। দীননাথের মৃত্যুর পর তার পৌত্র যতীন দশআনা অংশের জমিদার।

যতীন বলছিল, পদ্মদহের ধারে এমন একটা মূর্ত্তি আমারও চোখে পড়েছে, আর চীৎকার—সে তো গ্রামের সকলেই শুনেছে। উঃ! সে শব্দের কথা ভাবলেও আমার

বুক কেঁপে ওঠে।

এমন সময় চম্পকের ডাকে সকলে ফিরে দেখল, একজন লম্বা মত সুশ্রী তরুণের হাত ধরে চম্পক এদিকে আসছে। এগিয়ে এসে চম্পক বলল, মা! মা! এই দেখ, কে এসেছে—

সিতাংশু সানন্দে বলল, আরে কিরীটী! কখন এলে! হঠাৎ এখানে কি মনে করে।

কিরীটী রমলার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। রমলারও মুখে মৃদু হাসির রেখা।

সিতাংশু বললে, ব্যাপার কি বল তো?

কিরীটী জবাব দিল, এমনি বেড়াতে এলাম। কেন—আসতে নেই না কি?

বিলক্ষণ! একবার কেন—একশবার আসবে। তা যাক, এস যতীনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। ...যতীন, ইনি শ্রীকিরীটী রায়, একজন সৌখীন গোয়েন্দা ; রহস্য-ভেদী কিরীটী নামেই পরিচিত। আর ইনি যতীন রায়, এখানকার দশআনার জমিদার আমাদের বিশেষ বন্ধু। চমৎকার লোক!

যতীন ও কিরীটী উভয়ে উভয়কে নমস্কার জানাল। যতীন হাসতে হাসতে বললে, হাঁ, ওঁর কথা আমি শুনেছি, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে কি করে পরিচয় হল?

ওঃ! তা জান না বুঝি? ইনি আমার খোকা চম্পকের মামা—অর্থাৎ কিনা রমলা দেবীর আপন মামাতো ভাই।

আরো খানিকটা আলাপ আলোচনার পর হঠাৎ এক সময় যতীন প্রশ্ন করে, তা হঠাৎ এখানে এলেন যে কিরীটীবাবু?—যতীন হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

হাতে কোন কাজকর্ম নেই ; তাই এখানে চলে এলাম। কয়েকটা দিন নির্জনে বিশ্রাম নেওয়াও তো যাবে।

বেশ! বেশ! তো এখানেও বোধহয় আপনার রহস্যের কিছু খোরাক জুটতে পারে।

কিরীটী যেন বেশ একটু উদগ্রীব হয়েই বলে, বটে! এই অজ জায়গাতেও আবার রহস্য আছে নাকি?

কেন আপনি কি মনে করেন, যত রহস্য সব আপনাদের শহরেই ঘটেছে?

না? না তা হবে কেন? তা ব্যাপারটা কি বলুন তো?

না! সে অবশ্য এমন বিশেষ কিছু নয়।

তবু শুনি?—

ঠিক রহস্য না হলেও কয়েক বছর হতে এখানে এমন একটা ব্যাপার ঘটছে যাকে ভৌতিক বলা ছাড়া উপায় নেই। আবার বিংশ শতাব্দীতে ভৌতিক ব্যাপারও কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চায় না।

সত্যি! আশ্চর্য! ব্যাপারটা খুলেই বলুন না শোনা যাক?

যতীন বলতে শুরু করে।

সে আজ বছর চার আগেকার কথা। হঠাৎ একদিন সিতাংশুর বাবা অরুণবাবুর মৃতদেহ পদ্মদহের ধারে পাওয়া যায়। শরীরের কোথাও কোন ক্ষত বা আঘাতের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, বিশেষত্বের মধ্যে চোখের মণি দুটো যেন ঠিকরে কোটর হতে বের হয়ে আসছে—খুব বেশী ভয় পেলে মানুষের যে অবস্থা হয় অনেকটা সেই রকম! তাঁর মৃতদেহের পাশেই পদ্মদহের পাড়ে জলা মাটির উপর দেখা গেল গোটাকতক পায়ের দাগ—স্বাভাবিক মানুষের পায়ের দাগের চাইতে আকারে প্রায় দেড়গুণ বড়। আরও আশ্চর্য সেই পায়ের দাগগুলো ক্রমে দহের জলের কোল ঘেঁষে শেষ হয়ে গেছে। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, অরুণবাবু মৃত্যুর দিন রাত্রে প্রায় দেড়টা পর্যন্ত নাকি তিনি জেগে জমিদারী-সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম করেছিলেন, তারপর শুতে যান। রাত্রি তখন দুটো কি আড়াইটে হবে। গ্রামের দু'একজন নাকি একটা বীভৎস চীৎকারও শুনেছিল।...অরুণবাবুর মৃত্যুর পর হতে প্রায় রাত্রেই পদ্মদহের দিক হতে সেই বীভৎস চীৎকার মাঝে মাঝে এখনও শোনা যায় এবং আগাগোড়া সাদা কাপড়ে মুড়ি দেওয়া একটা বারো-তের হাত লম্বা মূর্তিকে পদ্মদহের ধার দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেও অনেকেই নাকি দেখেছে।

সকলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে যতীনের কথাগুলো শুনছিল। গল্প শেষ হলে কিরীটী শুধু বললে, সত্যি, অদ্ভুত ব্যাপারই বটে। কিন্তু সিতাংশু তুমি একথা তো কই আমায় আগে কোনদিন বল নি—?

না বলিনি।

যাহোক সেদিনকার মত যতীন সকলকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল।

রমলা তখন ভাইয়ের জন্য খাবার আনতে উঠে গেল।

কিরীটী সিতাংশুকে বললে, রমা আমায় তার করে এনেছে। এখানে তোমরা নাকি খুব বিপদে পড়েছ। ভৌতিক ব্যাপার ট্যাপার ওসব স্রেফ বাজে—বোগাস্? ওটা দশজনের চোখে ধূলো দেওয়ার জন্য শয়তানের কারসাজি।

পরের দিন দুপুরে কিরীটীর ঘরে, কিরীটী ও চম্পক বসে আছে। চম্পক একমনে আবোল-তাবোল কত কি বকে চলেছে। কিরীটী শুনছে, আর মাঝে মাঝে দু-একটা প্রশ্ন করছে।

চম্পক বলছিল, গরুড় পাখীর মত সরু বাঁকানো নাক, প্যাঁচার মত বড় বড় গোল চোখ, গাধার মত লম্বা লম্বা কান? বুঝলে মামা, রোজ রাত্রে আমার ঘরের ঐ খোলা জানালার কাছে এসে সেটা আমার দিকে চেয়ে থাকে।

তোর ভয় করে না?

দ্যুৎ। ভয় আবার কি, ভয় ত পায় বোকারা। আর সেটা তো কিছু বলে না, শুধু আমার দিকে চেয়েই থাকে। বাবা বলেছেন—ভয় পায় তো গাধা ছেলেরা?

কিরীটীর কিন্তু তখন সব কথায় মন নেই। সে ভাবছে চম্পকের দেখা সেই অদ্ভুত জীবটির কথাই।

॥ তিন ॥

পরের দিন সকালে একটা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রমলা কিরীটীকে বলছিল।

এই ঘরটাতেই বাবা শুতেন দাদা।

বেশ মাঝারী গোছের একখানি ঘর। গরাদহীন বড় বড় জানালা। ঘরের দক্ষিণ দিকেই সেই পদ্মদহ। দিবারাত্র হু-হু করে হাওয়া এসে ঘরে ঢোকে। ঘরখানি দোতলায়। ঠিক তার নিচেই একটা ফুলের বাগান। বাগানটা পার হলেই একটা মাঠের মত। সেই মাঠ পদ্মদহের পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত।

কিরীটী ঘুরে ঘুরে ঘরের সব জানালা, দরজা, দেওয়াল দেখছিল ; হঠাৎ এক সময় বাগানের দিককার জানালার কাঠের পাল্লার উপর তার নজর পড়ল। পাল্লার গায়ে রংয়ের উপর পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ শুকিয়ে আছে। দাগগুলো এমনভাবে বসেছে—যেন বাইরে হতে কেউ আঙ্গুলের চাপ দিয়ে জানালার বদ্ধ পাল্লা ঠেলে খুলেছে।

কিরীটী রমলার দিকে ফিরে বললে, শেষ তোদের এ বাড়ীতে কবে রং দেওয়া হয়েছে বলতে পারিস রমা?

তা ত জানি না দাদা। তবে নায়েব মশাই হয়তো বলতে পারেন। রমলা জবাব দিল।

সেই দিনই বিকালের দিকে কিরীটী নিজেই গিয়ে নরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ করলে, নমস্কার। আপনিই নরেনবাবু এদের নায়েব?

হ্যাঁ।

কিরীটী লোকটার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে।

আপনি তো এখানে অনেক দিন আছেন নরেনবাবু না।

আজ্ঞে।

আচ্ছা নরেনবাবু, বলতে পারেন সর্বশেষ ও বাড়ীতে কবে রং দেওয়া হয়েছিল?

হ্যাঁ। বছর চার আগে—কর্তার মৃত্যুর কয়েকদিন আগে সমস্ত বাড়ী রং করা হয়েছিল।

এর মধ্যে আর রং দেওয়া হয় নি?

হয়েছে বটে, তবে বাইরের মহলগুলোতেই যা আবার রং দেওয়া হয়েছিল ভিতরের মহলে রং দেওয়া হয় নি। ওদিকটা তো আর এতদিন ব্যবহার হয় নি। এবারে রং আবার দিতে হবে।

ঐদিনই শেষ রাত্রে একটা অস্পষ্ট খস খস শব্দে কিরীটীর ঘুমটা সহসা ভেঙ্গে গেল। কার যেন চাপা শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ভোরের আকাশের কোণে ত্রয়োদশীর ক্ষীণ চাঁদ তখন যাই-যাই করছে।

কিরীটী চোখ মেলে শুয়ে শুয়েই যতদূর সম্ভব ঘরের মধ্যে চারদিক দেখতে

লাগল।

হঠাৎ মনে হলো ঘরের বাইরে বারান্দা দিয়ে কে যেন নিঃশব্দে হেঁটে গেল। কিরীটী তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে টর্চটা হাতে নিয়ে বাইরে চলে আসে। মিটমিটে চাঁদের আলোয় বারান্দাটা যেন খাঁ খাঁ করছে। কিরীটী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ে না। দূরে দিগন্ত প্রসারী পদ্মদহ। সহসা ক্ষীণ শেষ রাতের চন্দ্রালোকে তার নজরে পড়ল—অদূরে পদ্মদহের ধার দিয়ে আগাগোড়া সাদা চাদরে মুড়ি দেওয়া বারো-তের হাত লম্বা একটা মূর্ত্তি যেন লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে বেড়াচ্ছে! কিরীটী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে।

রাত আর বেশী নেই। কিরীটী আর শয্যাগ্রহণ করে না। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে গায়ে জামাটা দিয়ে জুতো পায়ে বের হয়ে পড়লো।

ক্রমেই ভোরের অস্পষ্ট আলোয় চারদিক ফিকে হয়ে উঠেছে। কিরীটী পদ্মদহের ধার দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বেড়াতে বেড়াতে একসময় পদ্মদহের ধারে—সহসা ওর নজর পড়ল ভিজে মাটির উপরে পরপর অনেকগুলো একই রকম পায়ের দাগ। দাগগুলো সাধারণ মানুষের পায়ের দাগ হতে অনেক বড়। পায়ের পাতা যেমনি বড়, পায়ের আঙ্গুলগুলোও তেমনি লম্বা লম্বা। আঙ্গুলের নখগুলো নরম মাটির বুকে চেপে চেপে যেন বসে গেছে। কিরীটী পায়ের দাগগুলো ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল। মানুষের পায়ের দাগ যেমন খানিকটা পড়ে না—আঙ্গুলের মাথাগুলোর গোল গোল দাগ পড়ে মাত্র, এ পায়ের দাগ মোটেই সে রকমের নয়, পায়ের পাতার সমস্ত দাগটুকু তো পড়েছেই, লম্বা লম্বা আঙ্গুলের দাগও পড়েছে। পায়ের দাগগুলো ক্রমে যেন পদ্মদহের জলের দিকে নেমে গেছে।

কিরীটী চিন্তিতমনে বাড়ীর দিকে ফিরে এল।

॥ চার ॥

ঐ দিনই—কিরীটী, সিতাংশু, রমলা ও যতীন সকলে বিকালের দিকে খোলা বারান্দায় বসে চা পান করছে এবং নানা গল্প গুজব করছে।

এমন সময় ভৃত্য জগা একখানা চিঠি নিয়ে এসে বলল, একজন লোক যতীনবাবুকে এই চিঠিখানা দিতে বলে গেল।

একখানা সাদা খামের চিঠি। যতীন হাত বাড়িয়ে জগার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে খামের উপরের নাম পড়ে বলল ; কই না। এ তো আমার চিঠি নয়! 'মিঃ কিরীটী রায়' লেখা। বলতে বলতে যতীন চিঠিখানা টেবিলের উপর রেখে দিল। মিঃ রায় আপনার চিঠি!

সে কি! এখানে আবার আমায় কে চিঠি দিল?—বলে, কিরীটী চিঠিখানা আলগোছে টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে সোজা নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। ঘরে গিয়ে সে সুটকেসের ভিতর হতে একটা ব্রাউন রংয়ের ছোট শিশি বের করল। শিশির গায়ে লেখা 'অস্‌মিক এ্যাসিড' সলুশন। একটা কাচের পাত্রের মধ্যে সেই খামখানা রেখে শিশিটার ছিপি খুলে খানিকটা এ্যাসিড সেই ছাপ খামটার গায়ে ঢেলে দিল দেখতে দেখতে খামটার গায়ে কালো কালো আঙ্গুলের চিহ্ন ফুটে উঠেছে দেখা গেল।

কিরীটী গভীর আগ্রহে দাগটার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল।

পরের দিন কিরীটী আবার বাড়ীর পশ্চাতে বাগানের ভিতরটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল। এক সময় হঠাৎ একটা ঘরের জানলার নিচে এসে একটা মোচড়ান কাগজের প্রতি তার নজর পড়ল। কৌতূহল ভরে সে কাগজটা তুলে নিয়ে কাগজটা পরীক্ষা করে—ক'টা অক্ষর পরপর সাজান।

কিরীটী অবাক বিস্ময়ে কাগজটা দেখতে লাগল—এ আবার কি? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে কাগজটা হাতে করে নিজের ঘরের দিকে চলল।

নিতাংশু বাড়ী ছিল না বলে কিরীটী রমলাকে সেদিন রাত্রে চম্পককে নিয়ে তার ঘরে শুতে বললে। তাতে রমলা বললে, আচ্ছা।

রমলারও একলা শুতে ভয় করছিল।

রাত্রি তখন ঠিক কত হবে বলা যায় না। আকাশে ও মাটিতে কালো আঁধার যেন জমাট বেঁধে উঠেছে।

বাড়ীর পিছনের বাগানে একটা বড় আমলকী গাছের গুঁড়ির আড়ালে একটা দড়ি হাতে নিয়ে কিরীটী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। এমন সময় রায়দের কাছারীর পেটাঘড়ি ঢং-ঢং করে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করল। ঠিক সেই মুহূর্তে দোতালার ঘরের একটা জানালা খুলে গেল, আর সেই খোলা জানালাপথে দেখা গেল একটা সবুজ বাতি দুলছে আর জ্বলছে! এক সময় আলোটা দপ করে নিভে গেল।

এরপর আবছা আঁধারে কিরীটী দেখল, বাগানের মধ্যে দিয়ে সেই বারো-তের হাত লম্বা মূর্তি পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে। মূর্তিটা এসে রমলার ঘরের জানালার সামনে দাঁড়াল। মূর্তিটা প্রায় দোতালার সমান উঁচু। মূর্তি হাত দিয়ে জানালার কবাটটা ঈষৎ একটু টানতেই জানালার কবাট দুটো খুলে গেল। মূর্তিটা এবারে জানালার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

একমিনিট দুমিনিট করে প্রায় দশ মিনিটের পর দেখা গেল, মূর্তিটা আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জানালা ছেড়ে এগিয়ে আসছে। আর দেরী নয়, সহসা কিরীটী হাতের দড়িটা বিদ্যুৎবেগে মূর্তিটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। কিরীটীর নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ দড়ির ফাঁস মূর্তিটার মাথা দিয়ে গলে কোমর পর্যন্ত নামতেই সে দিলে এক টান। অমনি মূর্তিটা তালগোল পাকিয়ে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল। অন্ধকারে মাটিতে পড়ে

মূর্তিটা ছটফট করতে থাকে। কিরীটী ছুটে গেল, কিন্তু সেখানে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা সাদা চাদরের জামা, একটা অদ্ভুত মুখোশ ও মস্ত মস্ত দুটো বাঁশের 'রণ-পা' ছাড়া কিছুই পেল না।

'রণ-পা' দুটো নিয়ে কিরীটী যেমন ফিরতে যাবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন বাঘের মত কিরীটীর উপরে এসে লাফিয়ে পড়ল পিছন হতে এবং ক্ষিপ্র গতিতে তার হাতের তীক্ষ্ণ ছোরাখানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কিরীটীর বাঁ হাতের কনুইয়ে বসিয়ে দিল। আঘাত খেয়েও কিরীটী বিচলিত হয় না বরং বিদ্যুৎ-গতিতে ফিরে যুযুৎসুর প্যাঁচ দিয়ে লোকটাকে মাটিতে ফেলে দিল এবং তাকে ঠেসে ধরল। কিরীটীর হাতের ক্ষতস্থান দিয়ে তখন কিন্তু রীতিমত রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

কোমরে ঝোলান টর্চটা টেনে লোকটার মুখের উপর ফেলেই কিরীটী বললে, এ কি নরেনবাবু, আপনি! আপনার এই কাজ! হিসাবে আমার ভুল হয়নি তবে, কি বলুন?

নরেনবাবুর মুখখানা তখন ছাইয়ের মতই ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

নরেনকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সিতাংশু, যতীন, কিরীটী ও রমলা পরের দিন দ্বিপ্রহরে সিতাংশুর ঘরে বসে গল্প করছিল! গত রাত্রের গল্পই হচ্ছিল।

যতীন বললে, অদ্ভুত সাহস কিন্তু আপনার মিঃ রায়! শেষ পর্যন্ত দেখলেন তো এটা আসলে একটা শয়তানের শয়তানী। এ আমি আগেই জানতাম। কিন্তু উঃ। নরেন লোকটা যে এত বড় নীচ ও শয়তান তা কিন্তু আমার মোটেই ধারণা হয় নি। নিমকহারাম।

কিরীটী বললে, ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি এবং চার বছর আগেকার ঘটনা হতেই শুরু করা যাক কি বলেন?

নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই বলুন শোনা যাক! যতীন আগ্রহে বলে ওঠে।

কিরীটী বলতে শুরু করে আমরা জানি সিতাংশুর বাবা অরুণাংশুবাবুকে এক রাত্রে হঠাৎ মৃত অবস্থায় পদ্মদহের পাড়ে পাওয়া যায়। আসল ব্যাপারটা কেউ না জানলেও যা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে অরুণবাবু এক রাত্রে হঠাৎ জানালার উপর অদ্ভুত এক মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে মারা যান। মূর্তির নাকটা ছিল গরুড় পাখীর মত বাঁকা বাঁকান, চোখ দুটো প্যাঁচার মত বড় বড় আর গোল, কান গাধার মত লম্বা লম্বা। মূর্তি যখন দেখলে অরুণবাবু ভয় পেয়ে মারা গেছেন, তখন গ্রামবাসীর মনে একটা ভৌতিক ত্রাসের সঞ্চার করবার জন্য সে হত্যাকারী নিজে 'রণ-পা' পরে পদ্মদহের ধার দিয়ে রাত্রে হাঁটত ও একটা মাটির হাঁড়ির মধ্যে মুখ গুঁজে বীভৎস চীৎকার করত।

গ্রামবাসীদের মনে ধারণা হল পদ্মদহের পিশাচের হাতেই অরুণবাবু মারা গেছেন, কিন্তু খুনী তার হত্যার নিদর্শন রেখে গেল আঙ্গুলের ছাপের মধ্য দিয়ে ; জানালা দরজায় নূতন রং দেওয়া হয়েছিল, সেই জানালার গায়ে খুনী যখন বাইরে হতে জানালার পাল্লা টেনে খোলে তখন জানালার কাঁচা রঙে হাতের আঙ্গুলের ছাপ পড়ে যায়। আরও একজনের চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়ে। তার মুখ বন্ধ করবার জন্য খুনী তার হাতে টাকা দেয় ও ভয় দেখায়। লোকটা চুপ করে থাকে।—দীর্ঘকাল পরে সিতাংশু যখন ফিরে এল, খুনী এবারেও এদের ভয় দেখিয়ে এখান হতে সরাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু সিতাংশু ভয় পেলে না। তখন সে চম্পককে ভয় দেখিয়ে মারবার চেষ্টা করল, কিন্তু সে চেষ্টাও নিষ্ফল হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে খুনী একদিন চম্পকের ঘরের জানালা খুলে রেখে তাকে চুরি করার মতলব বার সেই লোকটির কাছে একটা সাংকেতিক চিঠি দেয়। এই সেই চিঠি—'ন'—জ আ ; ত রা ; য়টা রো বা ; কে ক ম্প চ ; ই চা।—'য'

চিঠিটার প্রত্যেক শব্দের পর সেমিকোলন থাকলেও আসলে কিন্তু একটা কথাই এতে লেখা আছে। তবে চিঠিটা পড়তে হবে প্রত্যেক সেমিকোলনের পিছন হতে আগে, যেমন—জ আ অর্থ আজ। এইভাবে পড়লে দাঁড়ায়—'ন' আজ ; রাত ; বারটায় ; চম্পককে ; চাই। 'য' ; কিন্তু সে রাত্রেও ওদের মতলব ভেস্তে যায়; কেননা রমলাকে আমার ঘরে শুতে বলেছিলাম। যেহেতু চিঠিটা সৌভাগ্যক্রমে আমি পেয়ে গিয়েছিলাম আগেই বাগানের মধ্যে।

এই পর্যন্ত বলে কিরীটী সিতাংশুর দিকে ফিরে বললে ; এই চিঠি এবং তার পরের ঘটনা তোমরা তো সব জান ও শুনেছ। 'য' এবং 'ন' কে তাও হয়তো বুঝেছ। 'ন' হচ্ছে তোমাদের নায়েব নরেনবাবু, আর 'য' হচ্ছে তোমাদের সামনে বসে বন্ধুবেশী শয়তান—তোমার পিতার হত্যাকারী ঐ যতীন।

যতীন উঠতে যাচ্ছিল, তার সমস্ত মুখখানাই রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চকিতে পকেট হতে রিভলবারটা বের করে যতীনের দিকে উঁচিয়ে কিরীটী বললে, এক পা নড়েছ কি কুকুরের মত গুলি করে মারব। দেখ সিতাংশু, যতীন যে হত্যাকারী সে আমি আগেই টের পাই আঙ্গুলের ছাপ হতে। জানলার গায়ে যে দাগ দেখেছিলাম তার একটা ফটো নিই তারপর জগার হাত দিয়ে কৌশলে একখানা পত্র পাঠাই। আমার নাম খামের পরে লিখে। যতীন সেই পত্র হাতে নিয়ে তার নয় বলে ফেরত দেয়, কিন্তু ওতেই আমার কাজ হয়ে যায়। আমি সেই চিঠির গায়ে 'অস্‌মিক এ্যাসিড' দিয়ে যতীনের হাতের ছাপ ফুটিয়ে তুলে ফটো নেই। এই দেখ দুটো ফটোই প্রমাণ করছে দুই ছাপই এক লোকের আঙ্গুলের। তারপর পদ্মদহের পাড়ে পায়ের দাগ যে মানুষের পায়ের দাগ নয়, তাও ছাপ দেখলেই বোঝা যায়। মানুষের পায়ের দাগ এবং যে ছাপ সেখানে পেয়েছি তারও একটা ফটো নিয়েছি। এই দেখ পার্থক্য কোথায়—একটা ছবিতে সমস্ত পায়ের দাগই পড়েছে। অন্যটায় যেটা সত্যিকারের পায়ের দাগ, তার আঙ্গুলগুলো মাত্র গোল গোল দাগ ফেলেছে ; সম্পূর্ণ আঙ্গুলের ছাপ পড়ে নি।

কারণ, হাঁটার সময় আঙ্গুল ও পায়ের পাতার মাঝখানে উঁচু জায়গা মাটি হতে উঁচুতে থাকে, সেই জন্য মাটিতে আঙ্গুলের সম্পূর্ণ ছাপ পড়ে না। তারপর সমস্ত পায়ের পাতার ছাপ পড়া অসম্ভব। বুড়ো আঙ্গুলের দিক হতে গোড়ালী পর্যন্ত ধনুকের মত বাঁকানো পায়ের পাতার অংশও হাঁটার সময় মাটিতে স্পর্শ করে না, কাজেই সম্পূর্ণ পায়ের দাগ পড়ে না। এর থেকেই বুঝেছিলাম ঐ পা লাগিয়ে হেঁটে গেছে। কাঠের পায়ের পাতা বীভৎস করে তৈরি করা হয়েছিল যাতে করে ঐ পায়ের ছাপ দেখে মনে সকলেরই আতঙ্ক জাগে! আর একটা কথা, মানুষ অত লম্বা হতে পারে না। আগেকার দিনে ডাকাতেরা পায়ে দুটো বাঁশের লাঠি লাগিয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ দ্রুত হেঁটে যেত, তাকে বলা হত 'রণ-পা'। আমার সন্দেহ হল এই মূর্তিও 'রণ-পা' ব্যবহার করত, তা না হলে অত লম্বা লম্বা পা ফেলা যায় না।

এখন কথা হচ্ছে—যতীনকে কেন সন্দেহ করলাম। যতীন জানত অরুণবাবুর একমাত্র পুত্র ছাড়া ত্রিসংসারে আপনার বলতে তাঁর কেউ নেই। কোন উপায়ে ওঁকে এবং ওঁর পুত্র সিতাংশুকে যদি সরান যায়, তবে অনায়াসেই সব সম্পত্তিটা বাগিয়ে নিতে পারবে যতীন। কেননা এই বাঙলার এক নির্জন গাঁয়ে কে আবার সম্পত্তির দাবী জানাতে আসবে? তাই সে সিতাংশুর পিতা অরুণবাবুকে হত্যা করে ভয় দেখিয়ে এবং তোমরা যখন এখানে এলে তখন সে এক ঢিলে দুই পাখী মারবার চেষ্টা করল। সে ভাবল চম্পককে যদি ভয় দেখিয়ে মারতে পারে, তবে তোমরা নিশ্চয়ই এখানে থাকবে না। ভয় দেখাবার জন্যও চমৎকার পন্থাটি নিয়েছিল যতীন—এই মুখোশটি দেখলেই বুঝতে পারবে। গরুড় পক্ষীর মত সরু বাঁকানো নাক, প্যাঁচার মত বড় বড় গোল চোখ, গাথার মত লম্বা লম্বা কান।—বলতে বলতে কিরীটী মুখোশটি যা সে বাগানে কুড়িয়ে পেয়েছিল টেবিলের 'পরে নামিয়ে রাখল। তারপর আবার বলে, দুর্ভাগ্য? চম্পক কিন্তু ভয় পেলে না। তখন এরা ঠিক করলে কোনমতে চম্পককে চুরি করে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবার!—তোমাদের নায়েব ছিল ওর সঙ্গী, তাকেও টাকা দিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছিল।

সিতাংশু গর্জন করে উঠল, শয়তান খুনী?—

কিরীটী ক্রুদ্ধ সিতাংশুর হাত ধরে বসিয়ে বলল, আমরা এখন ওকে পুলিশের হাতে জমা দিয়েই খালাস। পুলিশেই ওর ব্যবস্থা করবে। মদনবাবু আসুন।—

ইন্সপেক্টর মদনবাবু হাতকড়ি নিয়ে পাশের ঘর হতে বেরিয়ে এলেন। কিরীটী আগেই তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে খবর দিয়ে রেখেছিল।

এই যে মদনবাবু—ঐ সামনে দাঁড়িয়ে আপনার আসামী।—

মহিমার্ণব শ্রীযতীন রায়।

কিরীটী পায়ের পরে পা টেবিলটার ওপরে তুলে রেখে মৃদু মৃদু যাচ্ছিল, খোলা জানালা পথে দিনান্তের শেষ সূর্যরশ্মি কৃষ্ণচূড়ার গাছটার পত্রবহুল শীর্ষে শীর্ষে শেষ পরশটুকু বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—দৃষ্টি সেই দিকেই প্রসারিত।

আমি সেদিনকার দৈনিক 'রাজপথ'টার পাতা উল্টাচ্ছিলাম।

হঠাৎ একসময় কিরীটীর কণ্ঠস্বরে চোখ তুলে তাকালাম।

কিরীটী বলছিল 'পাজল' কাকে বলে জানিস সুব্রত!

কাকে বলে?—। প্রশ্ন করলাম স্মিত হাস্যে।

'পাজল'—অর্থাৎ যা চিন্তাশক্তির ঘূর্ণ্যাবার্তা রচনা করে। কিছুদিন হলো—রাত্রে শৈলেশদের ওখানে আজকাল ব্রীজ খেলতে যাই—

শৈলেশ—। ওঃ আমাদের নতুন ব্যারিষ্টার সাহেব?

হ্যাঁ—আগামীকালের উদীয়মান ব্যারিষ্টার শৈলেশ বোস।

মিঃ বাসু, বার-এ্যাট-ল। তোরা জানিস না ব্রীজ খেলায় ও ভারী ওস্তাদ একজন। পনের কুড়ি দিন খেলে দেখলাম আমাদের বিপক্ষে প্রতি রাত্রেই প্রায় চার-পাঁচটা রাবার করেছে। অদ্ভুত ক্যালকুলেশন। মনে হয় এক পিট খেলবার পরই বাকী তিন হাতের তাস ও যেন প্রত্যেকটি জেনে নিচ্ছে,—আজও শৈলেশের ওখানে ব্রীজ খেলবার নেমতন্ন আছে।

কিছুদিন ধরে আমি ব্রীজ খেলা শুরু করেছি কিরীটী সে কথা জানে, বোধ-হয় ও সে জন্যই কথাটা বললে। কিন্তু একটু আগের পাজল কথাটার সঙ্গে ওর কথার শেষাংশের সম্পর্কটা যে কি বুঝে উঠতে পারলাম না।

জানি ওকে ভাল রকমই—নিজে থেকে কিছু না বললে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন কিছুই জানা যাবে না—বলবে তো নাই—বিরক্ত হবে।

হঠাৎ এমন সময় আবার কিরীটী নিজে থেকেই বলে ওঠে, সেটাই হয়েছে আমার কয়েক দিন থেকে বর্তমান 'পাজল'। আমি শৈলেশকে কলেজ থেকে জানি—অংকে মাথা ছিল না বলেই আর্টস নিয়েছিল। তাছাড়া বুদ্ধির ব্যাপারে ও চিরদিনই একটু ভোঁতাই দেখেছি। হঠাৎ সেই শৈলেশ বিলেত ঘুরে কয়েকটা ডিনার দিয়ে বাপের পয়সায় ব্যারিষ্টারীর ছাপ নিয়ে এসে বুদ্ধিমান বনে গেল how's that। বিলেত দেশটা কি তাহলে সত্যিই মাটির নয়।

'অংকে মাথা ছিল না বলেই যে ব্রীজ খেলতে মাথা খেলবে না তাই বা তোর কেমন যুক্তি কিরীটী?—

না—ভাল ব্রীজ খেলতে হলে কেবল প্র্যাকটিসই নয়—অংক শাস্ত্র জানা দরকার। বুদ্ধি বিবেচনা ও বিচার শক্তি না থাকলে ভাল ব্রীজ খেলা চলে না। শৈলেশের কোনটাই নেই—অবশ্য যদি আমার নিজস্ব বিশ্লেষণ ঠিক হয়ে থাকে। and that is the puzzle।—ধাঁ ধাঁ।—বলতে বলতে হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে তুইও তো ব্রীজ খেলায় বর্তমানে শুনি honestly হাত পাকাচ্ছিস—চল না যাবি, শৈলেশের ওখানে আজ রাত্রে খেলতে? তোকে পেয়ে নিশ্চয়ই ও খুশী হবে।

বিশেষ কোন কাজ কর্ম নেই হাতে—বল্লাম, বেশ তো।

গাড়ী চালাতে চালাতে একসময় কিরীটী বলল, একটা কথা সু তোকে তখন বলা হয়নি। শৈলেশদের ওখানে যে ব্রীজ খেলা হয় সেটা ঠিক কিন্তু Not a game for the game's sake। মানে ঠিক নিরামিষ নয় এবং দু'দশ টাকার খেলাও নয়—এক একটা 'রাবার' মানেই ৫০০ টাকা।

বলিস কি—তাহলে বল জুয়া খেলা?—

ষ্টীয়ারিংয়ে হাত রেখে গাড়ী চালাতে সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কিরীটী মৃদুস্বরে বলে, তা একপ্রকার জুয়া খেলাই বটে? যদিও ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ আপেক্ষিক—

আপেক্ষিক?—

তা নয় তো কি?—জীবনে বেঁচে থাকবার চেষ্টামাত্রই তো জুয়া খেলা। জুয়া কে না খেলছে বল?—

কিরীটীর আজকের কথাটা শুনে যেন বিস্ময়ে একেবারে 'থ' হয়ে গেলাম। কিরীটীর মুখে কোনদিন এমন কথা শুনবো স্বপ্নেরও অগোচর। কারণ ওর সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় থেকেই একটা জিনিস বরাবর লক্ষ্য করেছি, চরিত্রের দিক দিয়ে কিরীটীর একটা লৌহকঠিন নীতি আছে যা একপ্রকার দুর্ভেদ্য বললেও চলে। নীতির

কোন বিকার নেই বটে তবে, মানসিক একটা অসাধারণ সত্যতা আছে, আছে একটা চারিত্রিক নিষ্ঠা। বস্তুত যার জন্য চিরদিন ওকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করেছি—আন্তরিক ভালবেসেছি, সেই কিরীটী—

যখনকার কথা বলছি, বালীগঞ্জ অঞ্চলে আভিজাত্য সম্প্রদায়ের সুরম্য অট্টালিকার চাপে ওদিকটা তখনও তেমন ঘিঞ্জি হয়ে ওঠে নি। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকখানা বাড়ী আর বেশির ভাগই তখন পড়ো জমি—ধানের ক্ষেত। লেক তখনও মানুষের কল্পনার বাইরে। শৈলেশের পিতা রাধামোহনবাবু কলকাতা শহরের একজন বিখ্যাত ব্যবহার জীবী ছিলেন। জীবনে তিনি প্রচুর অর্থ উপায় করেছিলেন। একমাত্র ছেলে শৈলেশ, ইচ্ছা ছিল ছেলেকে বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়ে এনে হাইকোর্টে তার পশারটা জমিয়ে দিয়ে যাবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর। ছেলেকে বিলেত পাঠিয়ে বালীগঞ্জের দিকে জমি কিনে বাড়ী তৈরী শুধু করলেন।

দেখতে দেখতে চার চারটে বছর কেটে গেল।

শৈলেশ ব্যারিষ্টারী পাশ করে কন্টিনেন্টে তখন ট্যুর করে বেড়াচ্ছে। এদিকে শৈলেশের বিলাত যাবার বছর খানেক পরেই শৈলেশের পিতা আকস্মিকভাবে একদিন হাইকোর্টের মধ্যেই পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। পুত্রস্নেহে অন্ধ পিতা, দূর প্রবাসী পুত্রকে এ দুঃসংবাদ দিয়ে ব্যস্ত করতে চাইলেন না। শৈলেশের বয়স যখন মাত্র বার বছর তখনই তার মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। রুগ্ন অসুস্থ শৈলেশের পিতা, বাড়ীতে অনেক দাসদাসী আছে বটে কিন্তু সত্যিকারের আপনার জন কেউ ছিল না। দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনের দল এসে শৈলেশের পিতার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল।

ক্রমে নতুন বাড়ীও নির্মাণ শেষ হলো—আত্মীয়রে দল রুগ্ন শয্যাশায়ী শৈলেশের পিতাকে নিয়ে—নতুন বাড়ীতে উঠে এল।

দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থেকেও কোন ত্রুটি কোথায়ও রাখেন নি ভদ্রলোক। আগের মতই সব চলতে থাকে।

দীর্ঘ চার বছর পরে শৈলেশ, যেদিন বম্বেতে এসে জাহাজ থেকে নামল—সেই দিনই দীর্ঘ অদর্শনের তীব্র ক্ষুধা বুকে নিয়েই শৈলেশের পিতার শেষ নিঃশ্বাস বায়ু-স্তরে মিলিয়ে গেল।

তারপর লোকে দেখলে ও জানলে সদা বিলাত প্রত্যাগত নব্য ব্যারিষ্টার মিঃ শৈলেশ বসু প্র্যাক্‌টিস্ শুরু করেছেন হাইকোর্টে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই অন্দর থেকে ক্রমে একজন দু'জন করে আত্মীয়ের দল অগস্ত্য যাত্রা করতে লাগল নিঃশব্দে।

অকৃপণভাবেই খরচ করে অতি আধুনিক কেতায় তৈরী হয়েছিল 'জাহ্নবী ভবন'।

বাড়ীর জাঁকজমক—শৈলেশের চালচলন দেখে বহু লোকেরই ঈর্ষার উদ্রেক যে হয় একথা সকলেই জানে।

যার ফলে পাঁচ মুখে প্রকাশ্যেই শৈলেরের ধনদৌলতের কথা আলোচিত হতো। ঘাগী উকিল ছিল শৈলেশের পিতা—বহু টাকা রেখে গেছেন, অগুন্তি। তা না

হলে এখনও এমন চালচলন বজায় রাখে কি . .রে? ব্যারিষ্টারী করে একটি কপর্দকও আজ বছর দুই শৈলেশ যে রোজগার করে নি তা সকলেই তো জানতেন—।

শৈলেশ কিন্তু বেপরোয়া।

বিলাত থেকে শৈলেশ আর কিছু শিখে আসুক আর নাই আসুক ব্রীজ খেলায় সে যে, একজন মস্ত বড় ওস্তাদ হয়ে এসেছে একথাটা কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই হঠাৎ কেমন রাষ্ট্র হয়ে গেল, বিশিষ্ট একটি মহলে।

নিত্য নিয়মিত শৈলেশের বাড়ীতে রাতের পর রাত ব্রীজের আসর বসতে লাগল মহাসমারোহে এবং সে আসরে অনেকেই হানা দিতে শুরু করলে। সে আসরে যারা গতায়ত করতো সমাজের তারা বিশিষ্ট ধনী সম্প্রদায়।

শৈলেশ—লোকটা দেখতে অত্যন্ত সুপুরুষ।

কথায়-বার্তায়, চালচলনে বিশেষ কেতা দুরস্ত।

আচার-ব্যবহারে আমীর বললেও চলে। আলাপ জমাতেও সে অদ্বিতীয়।

শীঘ্রই সে আধুনিক বিশেষ একটি বিশেষ স্থান করে নিল। ব্রীজ খেলার আসরটি কিন্তু আসলে ছিল প্রকাশ্যেই পুরোপুরি একটি জুয়া খেলার আসর এবং যারা আসতো আসরে সকলেই তা জেনেই আসত।

শুয়ে শুয়ে, হাজারে হাজারে টাকা প্রতি রাত্রে, ভোজ বাজীর মত যেন ডানা মেলে উড়ে চলেছে এক পকেট হতে অন্য পকেটে! কথাটা একান ওকান হতে হতে অকস্মাৎ কিরীটীর কানেও, কোন একটি জুয়ার আড্ডায় প্রায় হৃতসর্বস্ব এক বন্ধুর দ্বারা এলো এবং সেই বন্ধুর প্ররোচনাতেই হঠাৎ একদিন সে গিয়ে ব্যাপারটা দেখবার জন্য স্বেচ্ছায়ই আড্ডায় হাজির হলো। সোল্লাসে শৈলেশ কিরীটীকে আহ্বান জানাল ব্রীজের আসরে।

দু'চার দিন আসরে নিয়মিত হাজিরা দিয়েই একটা জিনিষ কিরীটী আবিষ্কার করলে—খেলাটা প্রায় প্রতি রাত্রেই এক দিকেই গতি নেয়। যে পক্ষেই শৈলেশ থাকে অনিবার্যভাবে সেই পক্ষেরই জিত হয়। সংক্ষেপে কিরীটী গাড়ীর মধ্যেই ব্রীজের আসরের ইতিহাসটা আমাকে শুনিয়ে বললে, বাকী ঘটনা তুই এবারে চোখ মেলে নিজে দেখবি ও মনে মনে পর্যবেক্ষণ করবি। এই যে আমরা এসে গিয়েছি—বলতে বলতে একটা গেটওয়ালা বাড়ীর মধ্যে আমরা এসে প্রবেশ করলাম।

সামনেই প্রকাণ্ড ঘোরানো পোর্টিকো—একপাশে টেনিস্ লন! পোর্টিকোর নিচে তখন খান সাত আট নানা আকারের দামী দামী গাড়ী দাঁড়িয়ে!

গাড়ী থেকে নেমে কিরীটীকে অনুসরণ করলাম।

প্রশস্ত হল ঘর—একধারে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি।

সমস্ত বাড়ীটা যেন একেবারে কবরখানার মতই স্তব্ধ। হঠাৎ গা'টা যেন কেমন ছমছম করে উঠলো।

প্রশস্ত হলঘরখানি কউচ সোফা ও সেটিতে সু সজ্জিত, মেঝেতে পুরু কার্পেট বিছানো, একটিমাত্র ডুম্বাকৃতি সিলিং থেকে ঝুলন্ত বাতি হতে যে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল অত বড় হলঘরটি আলোকিত করতে মোটেই সেটা পর্যাপ্ত নয়।

সমগ্র ঘরখানি জুড়ে আলোছায়ার যেন একটা লুকোচুরি চলেছে।

নিঃশব্দে আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম।

স্বল্পালোকিত একটা দীর্ঘ টানা বারান্দা—বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছতেই বহু লোকের মিলিত কণ্ঠের অস্পষ্ট একটা মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি কানে এসে প্রবেশ করল।

সামনেই একটি ঘরের দরজায় ঝুলন্ত পর্দার অন্তরাল থেকে মৃদু চাপা আলোর একটা ইশারা বাইরে টানা বারান্দায় এসে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে।

প্রথমে কিরীটী ও পশ্চাতে আমি পর্দা সরিয়ে নির্দিষ্ট কক্ষ মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

Good Evening every body!—কিরীটীর মৃদু সংযত কণ্ঠস্বরে মুহূর্তে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি আমাদের 'পরে এসে পড়ল।

পরিচয় করিয়ে দিই—আমার বন্ধু সুব্রত রায় মিলিয়নীয়ার। পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হলো একে একে।

পরিচয়েই বুঝলাম—এখানে যারা উপস্থিত—সকলেই অর্থসম্পন্ন ও উচ্চস্তরের বাসিন্দা।

প্রথমেই পরিচয় হলো রামগড়ের কুমার হরিরামের সঙ্গে। বছর পাঁচেক হলো বাপের মৃত্যুর পর তিনিই এখন ষ্টেটের সর্বেসর্বা। দ্বিতীয়—নিম্‌তের জমিদার সুখেন্দু রাণা! তৃতীয়—বিখ্যাত জুয়েলার গুর্জনওয়ালা শেঠ। চতুর্থ—মীরপুর ষ্টেটের সেক্রেটারী ও সর্বময় কর্তা ধনপতি ঘোষাল। এরা ছাড়া বাকী সব কেউ বিখ্যাত এ্যাডভোকেটের পুত্র, কেউ বিজনেস্‌ম্যান—কেউ ব্রেকার ইত্যাদি।

সকলেরই হাতে কফির পাত্র—ঘরের এক পাশে একটা টেবিলে 'বুফে' সাজান—নানা প্রকারের দেশী ও বিলাতী খানা সুসজ্জিত। কেউ কেউ খাচ্ছেনও কফি পানের সঙ্গে সঙ্গে। আলাপ আরো কিছুক্ষণ চললো!

তারপর সকলে উঠলো—এবারে ব্রীজ খেলার ঘরে।

এটা একটা এ্যান্টি রুম বললেও চলে—নাতি প্রশস্ত।

ঘরের মধ্যখানে একটি সুদৃশ্য চকচকে চৌকা টেবিল। টেবিলের উপরে সবুজ বনাত—তার উপরে পাতা একটি পুরু গ্লাস। টেবিলের চারপাশে আটখানা সবুজ রংয়ের চামড়ার গদী মোড়া উজ্জ্বল পালিশ করা চেয়ার।

মাথার ওপরে সিলিং থেকে ডিম্বাকৃতি সবুজ সেডে ঢাকা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলো ঝুলছে—আলোর ডুমটি এমনিভাবে লাগান, যাতে করে কেবলমাত্র টেবিলের উপরেই আলো পড়ছে—বাকী ঘরটিতে একটা আবছা আলো আঁধারী।

সমস্ত ঘরখানা জুড়ে যেন একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা।

প্রথমেই আজকের খেলার পার্টনার বাছাই করা নিয়ে একটু বাক-বিতণ্ডা হলো—তারপর সেটা সমাধান হয়ে গেল।

কিরীটী ও রামগড়ের কুমার বাহাদুর এক পক্ষে—অন্য পক্ষে নিম্‌তের জমিদার ও শৈলেশ।

বাকী সব দর্শক। খেলা শুরু হলো।

কতক্ষণ খেলা হয়েছে খেয়াল নেই—টেবিলের ঠিক মধ্যস্থলে দু'টি সুদৃশ্য রৌপ্য নির্মিত প্লেট ইতিমধ্যে এক সময় রাখা হয়েছিল—একটা তার শূন্য, অন্যটায় নোটের স্তুপ জমা হয়ে উঠেছে।

আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে খেলার গতি পর্যবেক্ষণ করছিলাম।

সত্যি! কিরীটীর কথাই ঠিক। জিত হচ্ছে বার বার শৈলেশের দলেরই এবং আরও আশ্চর্য লাগছিল প্রতিদানেই শৈলেশের হাতের তাসই যেন ভাল পড়েছে।

কেমন করে এটা সম্ভব।

অথচ তাস তো প্রতিবারেই সাফলিং চলেছে বেশ ভাল করেই। তবে একি রহস্য?

সে রাত্রির মত খেলা যখন শেষ হয়ে এসেছে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে মনে হলো সে বিশেষ কোন কারণে যেন হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

সমস্ত মুখে একটা চাপা আনন্দের জ্যোতি—কিরীটীর ঐ ধরনের আনন্দোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আমি অভ্যস্ত। কোন কঠিন সূত্রের মীমাংসায় সে পৌঁচেছে।

যাহোক একটু পরেই, সে রাত্রের মত খেলা সাঙ্গ হলো। আজ কিরীটীর ও তার পার্টনারের হার প্রায় ১৫০০ শত টাকা করে দিতে হবে—কিন্তু মনে হলো কিরীটীর তাতে তিলমাত্রও দুঃখবোধ যেন নেই।

রাত্রি প্রায় দেড়টা—আজ আর তোর বাসায় ফিরে কাজ নেই সুব্রত—চল রাতটা আমার ওখানে থাকবি।

গাড়ী চালাতে চালাতে কিরীটী আমাকে বললে!

বুঝলাম, কোন কিছু সে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চায়; তার প্রস্তাবে সম্মত হলাম।

সমগ্র শরীরের স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন কেমন একটা ক্লিষ্ট অবসাদ বোধ করছিলাম। বোধহয় তো অনেকক্ষণ জেগে আছি তাই এই অবসন্নতা। একটা লম্বা ঘুম দিতে পারলে বোধহয় শরীরের এ অবসন্নতা যেতো।

নির্দিষ্ট শয্যায় এসে শুতেই দু'চোখের পাতা অসহ্য ঘুমে যেন জড়িয়ে এল। শেষবারের মত একবার চোখ চেয়ে দেখলাম কিরীটী, নিঃশব্দে দু'টি হাত পিছনের দিকে আবদ্ধ করে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম মনে নেই—ঘুম যখন ভাঙল রাত্রি তখনও কিছুটা অবশিষ্ট আছে—খোলা জানালা পথে চোখে পড়ল, রাত্রি শেষের ধূসর আবছা আকাশের এক টুকরো।

ঘরের মধ্যে তখনও আলো জ্বলছে—এবং ঠিক আলোর সামনে টেবিলের উপরে কি একটা বস্তু যেন কিরীটী ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করছে।

ব্যাপার কি কিরীটী? ঘুমাতে যাস নি তুই?—

কিরে—ঘুম হলো?—সামান্য একটু Solluble Berbitone খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লি?

Solluble Berbitone?

হাঁ—একপ্রকার ঘুমের ঔষধ! ফারমাকোলজিতে বলে A white, crystaline powder, odourless, taste bitter. Soluble. in water.—বাকীটা বুঝতে কষ্ট আর হবে না নিশ্চয়ই।

চকিতে আমার সংক্ষুব্ধ চিন্তাজালের ওপরে যেন একটা ঝাপসা এসে পড়ল। পর পর অনেক কথাই মনের মধ্যে খেলে গেল—য়্যাঁ। বলে কি?

তবে কি তুই বলতে চাস?

কিরীটী আমার বক্তব্যকে শেষ না করতে দিয়েই বলে ওঠে, Exactly. so।

মাথার মধ্যে সমস্ত যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

সব কিছুই কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

শয্যা ছেড়ে কিরীটীর পাশে এসে দাঁড়ালাম। কিরীটী ততক্ষণে আবার তার হাতের বস্তুটি নিয়ে মনোযোগী হয়ে পড়েছে।

চেয়ে দেখি কিরীটী ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দিয়ে পরীক্ষা করছে একটা 'তাস'।

কি দেখছিস অমন করে তাসটার মধ্যে রে?

মুখ না তুলেই মৃদু হেসে কিরীটী জবাব দেয় ;

গোলাম টেক্কা রাজা ও বিবি
দেখিতে জানিলে শুধু নহে ছবি।
এক, দুই, তিন, চার, পাঞ্জা, ছক্কা
আট-নওলা-দশ ;—দিলে এক বাদ—ফক্কা।

বুঝলাম। তারপর?

চৌর্যবৃত্তিতে যে হাত আমার সাফাই বেশ—এই তাসটিই তার প্রমাণ সু—বলতে বলতে, তাসটা দেখিয়ে মৃদু হেসে ও বললে, এই তাসটা গত রাত্রে খেলার টেবিল থেকে চুরি করে এনেছি।

হঠাৎ?

কারণ এই তাসটি ভাল করে পরীক্ষা করলেই সকল রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। মূল সংকেতটি চোখে পড়বে।

তাসটা কিরীটীর হাত থেকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উল্টে পাল্টে দেখলাম। কিন্তু কিছুই রহস্যজনক তাসটার মধ্যে চোখে পড়ল না।

পেলি না কিছু?—

না—

এই নে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দিয়ে আর একবার দেখ।

আবার দেখলাম কিরীটীর নির্দেশমত ম্যাগনিফাইং গ্লাসটার সাহায্যে—তবু কিন্তু তাসটার মধ্যে তেমন বিশেষ কিছুই দর্শনীয় খুঁজে পেলাম না। বললাম, কই কিছুই

তো দেখতে পাচ্ছি না।

কিরীটী এবারে একটা কাগজের উপরে একটা নক্সা এঁকে বললে, ভাল করে চেয়ে দেখ তাসের পিছনে যে Star গুলো আছে তাদের ঠিক উপরে ও নীচে দুটি তারা বা Star রের মধ্যখানে 'এক' সাংকেতিক অক্ষরটি আছে। আজ তাস খেলবার সময় লক্ষ্য করে দেখিস প্রত্যেকটি তাসেই ঐ রকম বিভিন্ন সাংকেতিক অক্ষর বসান আছে।

দুপুরের দিকে কিরীটী ঘণ্টা কয়েকের জন্য বাইরে ঘুরে এল।

ঐদিন রাত্রেও আবার তাসের আড্ডায় গিয়ে নিয়মিত বসা হলো।

রাত্রে ব্রীজের আসন যখন ভাঙ্গলো—সময় তখন প্রায় সাড়ে বারটা। কিরীটী গাড়ী চালাচ্ছে আমি পাশে বসে।

কিছু দূর এসে হঠাৎ রাস্তার পাশে গাড়ীটা ব্রেক করে, একটা সিগার নিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করলো।

পাঁচ-দশ-পনেরো মিনিট করে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর, পর পর তিনখানা গাড়ী আমাদের আশেপাশে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল।

একখানা গাড়ীতে রামগড়ের কুমার বাহাদুর হরিনাম—দ্বিতীয়টার নিমতের জমিদার সুখেন্দু রাণা—তৃতীয় গাড়ীতে এড্‌ভোকেট সলিল বসু।

কিরীটী গাড়ী থেকে নেমে ওদের বলল, গাড়ী আপনাদের এখানেই ড্রাইভারের জিম্মায় থাকবে, আমার গাড়ীতে আপনারা সকলে আসুন।

কিরীটীর আহ্বানে সকলে এসে ওর গাড়ীতে উঠে বসল। কিরীটী গাড়ীতে স্টার্ট দিল।

বুঝলাম গাড়ী ঘুরে চলেছে শৈলেশের বাড়ীর দিকেই!

গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—দারোয়ানকে ডাকিয়ে গেট খোলান হলো।

কলিং বেল টিপতেই ভৃত্য একটু পরে এসে দরজা খুলে দিল। কিরীটীই প্রশ্ন করলে—সাহেব বল গিয়ে কুমার বাহাদুর তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান—খুব জরুরী!

ভৃত্য আমাদের সকলকে পারলারে বসিয়ে উপরে চলে গেল। মিনিট দশেকের মধ্যেই শৈলেশ নিচে নেমে এলো—পরিধানে স্লিপিং গাউন, মুখে পাইপ।

আমাদের সকলকে এতরাত্রে এভাবে আবার ফিরে আসতে দেখে সে যে বিস্মিতই হয়েছে ওর মুখ দেখেই তা বোঝা গেল।

কি ব্যাপার কি?

জবাব দিল কিরীটী ; শৈলেশ—কুমার বাহাদুরের হয়ে তোমার কাছে আমি ৫০ হাজার টাকার দাবী জানাচ্ছি।

৫০ হাজার টাকার দাবী? বিস্ময়ে ও যেন একেবারে হাঁ হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ। তুমি ব্রীজ খেলবার ছল করে অন্যায়ভাবে ওর কাছ হতে আজ পর্যন্ত ৫০ হাজার টাকা ঠকিয়ে নিয়েছ?

শৈলেশ এতক্ষণে বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পারল, বললে অন্যায় নয় বলতে

পারো, জুয়া খেলায় উনি হেরেছেন, আমি জিতেছি। জুয়া খেলার হার জিত আছেই। উনি কচি খোকাটি নন আগাগোড়াই উনি জানতেন যে জুয়ো খেলছেন। আজ যদি উনি জিততেন আমাকে কি টাকাটা ফিরিয়ে দিতেন? না আমিই চাইতাম?

Shut up you cheat। এবারে কুমার বাহাদুর গর্জন করে ওঠে ; ওর নাম জুয়া খেলা? শয়তান!

Language please কুমার বাহাদুর। এটা একজন ভদ্রলোকের বাড়ী এবং সময়টাও রাত্রি। ভদ্রআচরণ না করলে আমি বাধ্য হবো তার ব্যবস্থা করতে। নির্ভীক কঠিন স্বরে শৈলেশ জবাব দেয়।

শোন শৈলেশ!—তোমার এখানে ব্রীজ খেলাটা সত্যিকারের জুয়া খেলা যদি হতো, কিছু বলবার ছিল না কিন্তু তুমি বেশ ভাল করেই জান কি রকম চালাকী করে তুমি ব্রীজ খেল।

চালাকী কি রকম?—

তোমার প্রত্যেকখানা তাসের পিছনে সাংকেতিক অক্ষর বসান, যার সাহায্যে তুমি প্রত্যেকের হাতের তাস না দেখেও জানতে পারতে।

সাংকেতিক অক্ষর বসান?

হাঁ। কিরীটীর কণ্ঠস্বর বজ্রকঠিন।

কি পাগলের মত আবোল-তাবোল বকছো রায়?

বেশ!—চল তোমার খেলার তাসগুলো ড্রয়ার থেকে বের করবে, চল তোমার চোখের 'পরেই দেখিয়ে দেবো, কি বলতে চাই আমি।

বেশ চল।

সকলে এসে খেলার ঘরে প্রবেশ করলাম। ড্রয়ার থেকে তাস বের করা হলো, কিন্তু আশ্চর্য কোন তাসেই তন্ন তন্ন করে খুঁজেও গত রাত্রের দেখা সাংকেতিক চিহ্ন কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না।

সকলেই হতভম্ব।

কিরীটী নিজে একবার তাসগুলো দেখে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা দৃষ্টিতে তাকাল শৈলেশের দিকে, শৈলেশ। আমি কিরীটী রায়। আমার চোখে ধুলো দেওয়া তোমার সাধ্যাতীত। যে তাস নিয়ে খেলা হয়েছে, তার প্রত্যেকটিকেই প্রায় আমি নখের আঁচড় বসিয়ে দাগ কেটে দিয়েছি। বের কর সেই তাস! বের করে কোথায় রেখেছো সেই তাস?

মুহূর্তে দপ্ করে ঠিক এমনি সময় ঘরের বাতি গেল নিভে, নিঃশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঘরটা যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে।

কিরীটীর নির্দেশ মত আমিও সতর্ক হয়ে ছিলাম। কিরীটীর পকেটে টর্চ ছিল কিরীটী বোতাম টিপে টর্চ জ্বালালো।

সকলেই হতভম্ভ চকিত।

কিন্তু টর্চের আলোয় ঘরের মধ্যে কোথায়ও শৈলেশের টিকিটিরও দর্শন পাওয়া গেল না! হাওয়ার মতই যেন সে উবে গেছে ঘরের মধ্য থেকে।

সুইচ টিপে আবার ঘরের বাতি জ্বালানো হল, না সত্যি শৈলেশ ঘরের মধ্যে নেই।

কিরীটীর চোখে মুখে কিন্তু এতটুকুও উদ্বেগের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। একান্ত নির্বিকারভাবে সে টেবিলের ড্রয়ারগুলো পরীক্ষা করতে লাগল।

তিনটে ড্রয়ারের একটায় চাবি দেওয়া ; পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে তার মধ্যে থেকে একটা চাবি বেছে লাগাতেই ঘুরে গেল। এবং ড্রয়ার খুলতেই তার মধ্যে অভীপ্সিত তাস জোড়া পাওয়া গেল।

আলোর সামনে কিরীটী তাসগুলো সকলের চোখের পরে মেলে বললে, এই দেখুন প্রত্যেকটি তাসেরই পিছনে উপর নীচে সাংকেতিক অক্ষর বসান—এবং এই সংকেতের সাহায্যেই সে সকলের 'পরে খেলায় টেক্কা দিয়ে দান জিতে নিত। কিন্তু আর নয়? কাল সকালে আপনারা সকলে আমার ওখানে আসবেন, সব আমি explain করে দেবো। শৈলেশ এই ঘরের মধ্যে কোন গুপ্ত দ্বারপথে নিশ্চয়ই আত্মগোপন করেছে। এখন সেই গুপ্ত দ্বার পথ খুঁজে তাকে অনুসরণ করা বৃথা। কারণ সে নিশ্চয়ই এতক্ষণ আমাদের নাগালের বাইরে। রাতও অনেক হয়েছে। কুমার বাহাদুর, কাল সকালে আমার ওখানে আসতে কিন্তু ভুলবেন না। I will decide your case, don't worry!

সে রাত্রেই কিরীটীর ওখানে ফিরে এসে বাইরে থেকেই আমাদের নজরে পড়ল, কিরীটীর বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে।

ব্যাপার কি! এত রাত্রে তোর কাছে আবার কে এলো?

কিরীটী ঘরের দিকে অগ্রসর হতে হতে বললে, অনুমান যদি আমার মিথ্যা না হয়—তাহলে শৈলেশই আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

শৈলেশ!—

হাঁ!

সত্যি! বাইরের ঘরে ঢুকে দেখলাম মুহ্যমানের মত শৈলেশই দু'হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে সোফার 'পরে।

আমাদের পদশব্দে ও মুখ তুলে তাকাল। সমস্ত মুখখানায় যেন একটা সর্বহারার রিক্ততা! রক্তশূন্য ফ্যাকাসে।

হঠাৎ কিরীটীকে সামনে দেখে শৈলেশ উঠে এসে আবেগের সঙ্গে কিরীটীর হাত দু'টো চেপে ধরে বললে, আমাকে বাঁচাও ভাই! এমনি করে আমাকে সাক্ষাৎ অনিবার্য ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দিও না।

বোস! বোস শৈলেশ। সব কথা তোমার শুনবো। দাঁড়াও আগে কফি আনতে বলি।—

কিরীটী জংলীকে ডেকে তিন কাপ কফির আদেশ দিল।

কিরীটী ঘরে ফিরে আসতেই শৈলেশ কি যেন বলতে উদ্যত হতেই কিরীটী মৃদু হেসে বললে, First of all get your nerves strong my boy। তারপর শুনবো

তোমার কাহিনী।

একটু পরেই জংলী ট্রেতে করে ধূমায়িত তিন কাপ কফি নিয়ে এলো।

শৈলেশ তার কাহিনী শুরু করলো, তোমরা কেউ জান না—যখন আমি বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এলাম—

কিরীটী মৃদুস্বরে বললে, আমি জানি সে সব কথা শৈলেশ!

এসে দেখলে তোমার বাবা তোমার জন্য একমাত্র কলকাতার বাড়ীটা ছাড়া কিছুই রেখে যেতে পারেন নি এবং শেষের একটা বছর কেবল ঋণ করেই তোমার বিদেশের খরচ চালাচ্ছিলেন!

আশ্চর্য! কেমন করে জানলে?—

তোমার বাবার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তোমার আত্মীয় স্বজনরা তোমার বাবার চারপাশে এসে স্থায়ী আসন গেড়ে ওকে চুষতে শুরু করে দেন—

হ্যাঁ!—এবং সে সময় কোন একজন ধনী মহাজনের কাছ থেকে অত্যন্ত উঁচু হারে সুদ দিয়ে বহু টাকা বাবা কর্জ করতে বাধ্য হন—

বাইরে এমন সময় জুতোর শব্দ পাওয়া গেল! কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান জানাল, আসুন মিঃ চৌধুরী।

ঘরে এসে প্রবেশ করলেন ক্যালকাটা সি, আই, ডি পুলিশের ডেঃ সুপার মিঃ আর চৌধুরী।

ব্যাপারটা কি কিরীটীবাবু? এত রাত্রে জরুরী তলব কেন?—চৌধুরী একটা সোফায় বসতে বসতে প্রশ্ন করলেন।

আড়চোখে চেয়ে দেখলাম শৈলেশের সমগ্র মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

ইনিই আমাদের বন্ধু ব্যারিষ্টার বাসু—মিঃ চৌধুরী।

সহসা একটি অর্দ্ধস্ফুট চিৎকার করে শৈলেশ জ্ঞান হারিয়ে সোফার 'পরে এলিয়ে পড়ল।

কিরীটী তড়িৎপদে উঠে শৈলেশের কাছে গিয়ে বললে, সুব্রত—শৈলেশ Senseless হয়ে গেছে দেখছি—চট করে এক গ্লাস জল নিয়ে আয়।

আমি জল আনতে ছুটে গেলাম।

পরের দিন সকাল।

কিরীটীর বাইরের ঘরে আমরা সকলে বসে।

ইতিমধ্যে শৈলেশ অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে।

কিরীটী বলছিল ; ভাগ্যের বিড়ম্বনা। শৈলেশকে আমি খুব ভাল করেই চিনতাম। মগজে বুদ্ধি বস্তুটা যে ওর কোন দিনই তেমন খুব ধারালো নয় এ আমার ভাল করেই জানা ছিল। ব্রীজ খেলার আসরে প্রথমেই যখন জানতে পারলাম নির্দোষ আমোদের মধ্য দিয়ে বিশেষ ভাবে জুয়া খেলা চলেছে পাকাপোক্ত ভাবে—তখন থেকেই ধরবার

চেষ্টা করেছি রহস্যটা কোথায়, দু'তিনটে দিন আমাদের খেলা দেখতেই চলে গেল—কারণ নতুন খেলোয়াড়কে প্রথম থেকেই বেশ ভাল করে একটু যাচাই না করে দেখা পর্যন্ত দলে পাত্তা দিত না ওরা। এই দলের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেই দু'তিন দিন আমার চলে গেল। তারপর দেখলাম ও বুঝলাম খেলাটা প্রায় প্রতি রাত্রেই এক পক্ষীয় হয়। অর্থাৎ শৈলেশ যে দলে বসে সে দলেরই বেশীর ভাগ দিনই হয় জিত এবং এ জিত মানে প্রচুর অর্থাগম। কিন্তু যে বা যারাই খেলতে আসুক, কেবল জুয়ার নেশাতেই রাতের পর রাত ওখানে হাজিরা দিতে পারে না।

নিশ্চয়ই ওই খেলার নেশা ছাড়াও আরো কোন বড় রকমের আকর্ষণ আছে যার টানে প্রত্যহ সকলে এসে নিয়মিত হাজিরা দেয়। দেখলাম প্রত্যহ খেলা শুরু হবার আগে নিয়মিতভাবে কফি পান ও 'বুফে ডিনার চলে। মনে হলো নিশ্চয়ই প্রাত্যহিক ঐ আহার ও পান পর্বের মধ্যে কোন আকর্ষণের বস্তু আছে। খাওয়ার মধ্যে থাকতে পারে না কারণ প্রত্যহই খাবারের মেনু অদল বদল হয়, দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করলাম কফি পানটা সকলেই বেশ আগ্রহের সঙ্গেই করেন এবং কেউ কেউ দু'তিনবার পর্যন্ত কফি খান। কফির দুটো পাত্র থাকতো—একটাতে থাকতো কফির মধ্যে ঘুমের ঔষধ মিশান, দ্বিতীয় পাত্রের কফির সঙ্গে মিশান থাকতো 'বিটার' ও 'জিন' এবং কফি পরিবেশন করতো শৈলেশের প্রিয় ভৃত্য নাথথু। ঘুমের ঔষধটা হচ্ছে 'সলুউবুল বারবিটোন'। দু'পাত্রের মিশ্রিত কফি খেতে খেতে ক্রমে নেশায় পরিণত হতো কফি খাওয়াটা এবং ঐ কফির নেশায়ই ছিল আসল আকর্ষণ এইখানে নিয়মিত মিলিত হবার প্রত্যেকের! প্রত্যেকে নেশায় বুঁদ হয়ে সকলে বসতো খেলার আসরে। নেশাগ্রস্থ চোখকে ফাঁকি দেওয়া খুব সহজ, শৈলেশ তখন সেই নেশাগ্রস্ত লোকগুলোকে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে তাসের গায়ে লাল কালো অক্ষরে লিখিত উপর ও নিচে সাংকেতিক সংখ্যাগুলোর দ্বারা অপর পক্ষের তাস জেনে নিয়ে খেলতে শুরু করত। তাস সবই জানা থাকলে তাসের খেলায় জেতা বিশেষ কোন কঠিন ব্যাপার নয়। সাংকেতিক অক্ষরগুলো হচ্ছে ; টেক্কায়—Kingয়ে 'K', Queen-য়ে 'Q', Jack-য়ে 'J' তারপর যথাক্রমে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ দশের শূন্য এই পর্যন্ত ছিল শৈলেশের ডিউটি—এবারে এ ব্যাপারে যে আসল brain তার কথায় আসবো। শৈলেশ—Poor শৈলেশ was instrument only এবং লাভের এক তৃতীয়াংশের অংশের অংশীদার ছিল মাত্র।

এতক্ষণ কিরীটীর কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছিলাম—চমকে তাকালাম মুখের দিকে।

তাই এবারে আসল গল্পের মধ্যে আমরা আসছি। আগেই বলেছি শৈলেশের বুদ্ধি বস্তুটা তেমন প্রখর ছিল না এবং তার সেই মোটা বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে যিনি কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন—তিনি শৈলেশের সামনে লোভের জাল বিছিয়ে ওকে করলেন আকর্ষণ। কিরীটীকে একপ্রকার বাধা দিয়েই—

এবারে শৈলেশই বলে ওঠে ; সত্যি। আমাকে বললেন সব দেনা আমার তিনি

শোধ করে দেবেন এবং নিয়মিত আমাকে টাকা উপায়ের ব্যবস্থাও করে দেবেন। আমার তখন ভীষণ দৈন্য অবস্থা—উপবাসের প্রায় জোগাড়। তার প্রস্তাবে রাজী না হওয়া ছাড়া আমার দ্বিতীয় পন্থা ছিল না—শুধু তাই নয়, যে মহাজনের কাজে বাবার সর্বস্ব বাঁধা পড়েছিল ইনিই তিনি এবং খেলার ছলে প্রত্যেককে নেশাগ্রস্ত করে সংকেতের সাহায্যে দানের পর দান আমরা জিতে চলতাম আর দ্বিতীয়তঃ কফির সঙ্গে মদ অর্থাৎ জিনও চলতো।

I see এবং টাকার বেলায় তোমার হতো মাত্র one third share! কিরীটী মৃদু হেসে বলে।

হাঁ!—

যদি আমার না ভুল হয়ে থাকে তিনিই পার্টি যোগাড় করে আনতেন—কেমন কিনা?

হাঁ—না হলে তুমিই বল ; কি করে ঐ সব বড় বড় লোকদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটতে পারে?

খট্ খট্ করে দরজার কড়া নড়ে উঠলো!

আসুন! সুব্রত দরজা খুলে দাও।

আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই যিনি এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন, তাকে দেখে আমরা সকলেই যুগপৎ বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। মুখে মৃদু সাফল্যের হাসি; এই যে মিঃ রায়!—

চিবিয়ে চিবিয়ে উনি বললেন।

হঠাৎ মিঃ চৌধুরী সুপার, উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ; আপনাকে এ্যারেষ্ট করলাম—

What all this? রাগমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন—

আদালতেই সেটার ব্যাখ্যা হবে মিঃ—। জবাব দিলেন মিঃ চৌধুরী।

কিন্তু কেন এ্যারেষ্ট করছেন জানতে পারি কি? কণ্ঠস্বরে শ্লেষ।

এই যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটা পড়ে দেখুন তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

আমরা সকলেই উঠে এলাম প্রসারিত কাগজটার দিকে ঃ রামগড়ের কুমার বাহাদুর শ্রীহরি রামকে মাদক দ্রব্যের চোরা কারবার করার জন্য গ্রেপ্তার করা হল—

হু! কিরীটী সত্যিই অতীব ধূর্ত—ব্রীজ খেলার ধার কাছ দিয়েও যায়নি—একেবারে সোজাসুজি মাদকদ্রব্যের চোরাকারবারের অভিযোগ।

বজ্র আঁটুনি!

আসুন! আসুন! আপনার পুণ্য পদধূলি স্পর্শে আমার এ ক্ষুদ্র আলয় ধন্য হলো।

খাঁ সাহেব—আমিও আপনার সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব লাভ করে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছি।

শিবাজী এগিয়ে এলেন আলিঙ্গনেচ্ছু, দুই বাহু প্রসারিত করে আফজল খাঁর দিকে।

আফজল খাঁও এগিয়ে এলেন।

একটা দীর্ণ চীৎকার সহসা সমগ্র প্রেক্ষাগৃহখানিকে অনুরণিত করে তুলল।

শিবাজীর তীক্ষ্ণ, বিষাক্ত বাঘনখের অব্যর্থ আঘাতে আফজল খাঁর বিষ জর্জরিত অবশ দেহটা এলিয়ে পড়ল, বিশ্বাসঘাতক!...উঃ।

হাঃ হাঃ হাঃ, শিবাজীর কণ্ঠ চিরে অট্টহাসি জেগে ওঠে।

ভূলুণ্ঠিত, অব্যক্ত যন্ত্রণাকাতর, আফজল খাঁর মুখের দিকে চেয়ে শিবাজী বললেন, বিশ্বাসঘাতক আমি না তুমি খাঁ সাহেব? জাল বিছিয়েছিলে শিবাজীকে বন্দী করবে বলে। বন্ধুত্বের মুখোশ এঁটে শয়তানীর ছুরিকা শানাচ্ছিলে অতর্কিতে আমাকে আক্রমণের জন্য। ভেবেছিলে, শিবাজীর চোখে অনায়াসেই ধূলি নিক্ষেপ করতে পারবো, না?—

যবনিকা নেমে এলো।

প্রেক্ষাগৃহ ঝম ঝম করে ওঠে ঘন ঘন দর্শকদের করতালিতে।

আর সেই শব্দে এক হতভাগ্যের শেষ মরণ-কাতর, অব্যক্ত আর্তধ্বনি ডুবে গেল। কেউ জানলে না। কেউ বুঝলে না!

গ্রীণরুমে মহীতোষ নিজের মেক-আপ ঠিক করছিল আয়নার সামনে—স্মারক সুশীল ছুটে এসে বললে, মহী, সর্বনাশ হয়েছে রে? তোর ভাই—বাকী কথাটা সে আর উচ্চারণ করতে পারলে না।

কি?—মহী চমকে সুশীলের দিকে ফিরে দাঁড়ায়।

খগেন যেন কেমন করছে। স্টেজ থেকে ফিরে এসে কেমন যেন এলিয়ে পড়েছে। সমস্ত মুখ নীল হয়ে গিয়েছে! শিগ্‌গীর আয় ভাই একবার!

সেকি! কই চল ত দেখি—? মহীতোষ তাড়াতাড়ি যেখানে খগেন শুয়েছিল ছুটে গেল।

আফজল খাঁর বেশভূষায় তখনও খগেন সজ্জিত উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট বোঝা যায়—খগেনের সমগ্র মুখখানা একেবারে নীল হয়ে গিয়েছে; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম অর্ধনিমিলিত দু'টি চক্ষু।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে মহীতোষ খগেনের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যগ্র ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করে—কি হয়েছেরে খগেন?—

কোনমতে টেনে টেনে ক্লান্তক্লিষ্ট স্বরে খগেন বলে, বড্ড কষ্ট হচ্ছে মহীদা! নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। কেমন যেন—শেষ হয় না কথাটা।

খগেনের সহসা কথা বন্ধ হয়ে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও তার একপাশে কাত হয়ে পড়লো।

পূজাবকাশে অ্যামেচার ক্লাবের সখের থিয়েটারে গৈরিক পতাকা অভিনয় হচ্ছিল।

হঠাৎ এই বিভ্রাট!

তক্ষুনি একজন ডাক্তারের সন্ধানে ছুটলো—পাড়ার সুবোধ ডাক্তার দর্শকদের মধ্যেই ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি ছুটে এলেন, ক্লাবের তিনিও একজন উৎসাহী সভ্য। কিন্তু খগেনকে বাঁচান গেল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তার মৃত্যু হলো!

আনন্দের আসরে নেমে এলো মৃত্যু-বেদনার কালো ছায়া।

সুবোধ ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে বললেন, তীব্র কোনো বিষের ক্রিয়ায় খগেনের মৃত্যু হয়েছে। থানায় এখুনি সংবাদ দেওয়া উচিত কারণ স্বাভাবিক মৃত্যু এটা নয়।—থানায় সংবাদ না দিলে পরে হয়তো গেলমাল হতে পারে।—

একটু পরে—

গ্রীণরুমে মহীতোষ ও সুবোধ ডাক্তার পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে দু'জনে কথা হচ্ছিল।

দলের পাণ্ডা মহীতোষকে সুবোধ ডাক্তার কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন,—তোমার 'বাঘনখ'টা কোথায় মহী?

আশ্চর্য! সুবোধদা, এই টেবিলের 'পরে ত' সেটা ছিল কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি

না। খগেনকে যখন দেখতে যাই তখনও সেটা এখানেই ছিল।

সত্যি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বাঘনখটার সন্ধান পাওয়া গেল না।

ডাঃ সুবোধ বসুর মুখে একটা দুশ্চিন্তার ছায়া। ব্যাপারটা যেমনি চিন্তার তেমনি ঘোরালো ঃ নির্মেঘ নীলাকাশ হতে সহসা যেন বজ্র খসে পড়েছে।

পরিপূর্ণ আনন্দের সংগীতকে যেন সহসা স্তব্ধ করে দিয়েছে দানবের হিংস্র নখরাঘাত।

হুগলী জেলার ছোটোখাটো পল্লীগ্রাম একটি ঃ মহীতোষ, যতীন, খগেন ও সুশীল সবাই কলেজের ছাত্র ও একই গ্রামে বাড়ী। পূজার ছুটিতে প্রতিবারই তারা গ্রামে এসে হৈ হৈ করে থিয়েটার করে—পূজার ছুটিটা আমোদ হল্লা করে যে যার আবার কলকাতায় চলে যায় ক'টা দিন পরে।

এবারে তারা গ্রামে এসে 'গৈরিক পতাকা' অভিনয়ের আয়োজন করে এবং বিজয়ার পরের দিন নাটক যখন অভিনীত হচ্ছে ঠিক সেই সময় ঘটল এই আকস্মিক বিভ্রাট!

অ্যামেচার থিয়েটার ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক গ্রামের জমিদার যামিনী চৌধুরী—বয়সে তরুণ।

অত্যন্ত আমুদে ও মিশুকে—বাপ পিতামহের অর্থের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও নৈতিক দিক দিয়ে যামিনীবাবু অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রকৃতির লোক।

এম. এ. পাশ করেছেন—এবং লেখাপড়ার চর্চা এখনো রাখেন। রামকৃষ্ণ সংঘের শিষ্য, বিবাহ করেন নি—ছোট ভাইটিকে বিবাহ দিয়েছেন তার একটি ছেলেও আছে!

'গৈরিক পতাকা' অভিনয় করতে গিয়ে যে বিয়োগান্ত ব্যাপারটি ঘটে গেল—তার সমস্ত ঝুক্কি আজ যেন যামিনীবাবুর ওপরেই এসে পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত থানায় সংবাদ দেওয়ায় ঘটনাস্থলে দারোগাবাবু আসেন এবং তিনি অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে—মৃতদেহের ময়না তদন্ত করান।

ময়না তদন্তের ফলে জানা গেল দেহে, 'কুরারী' (কুঁচ ফল) বিষ প্রয়োগের ফলে মৃত্যু হয়েছে।

ময়না তদন্তের ফলাফলটা যেন সত্যি সকলকে একেবারে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

জমিদার যামিনী চৌধুরীকে সেদিন গোপনে থানায় ডেকে দারোগা ইউসুফ বলেছেন, 'গৈরিক পতাকা' অভিনয় হতে হতে যখন টিনের পাতের তৈরী খেলার 'বাঘনখ' দিয়ে মহীতোষবাবু খগেনবাবুকে আঘাত করেন তারপরই খগেনবাবুর মৃত্যু হয়, সকলের জবানবন্দী হতে নিঃসংশয়ে সেটাই প্রমাণ হয়েছে এবং **that must be the cause of death!**

হতভম্ব যামিনী চৌধুরী যেন কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেন না—পরে বিস্মিত কণ্ঠে বলেন ঃ এ আপনি কি বলছেন ইউসুফ সাহেব! আপনি কি বলতে চান মহীতোষ খগেনকে সেই খেলার বাঘনখের সঙ্গে বিষ মাখিয়ে ইচ্ছা করেই হত্যা করেছে?

কিছুই আমি বলতে চাই না চৌধুরী মশাই! তবে এও বোধ হয় আপনি শুনে

থাকবেন—অভিনয়ের সময় টিনের পাতের তৈরী যে 'বাঘনখটা' মহীবাবু ব্যবহার করেছিলেন সেটা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এবং থিয়েটার ঘর ও আশপাশ সব তন্ন তন্ন করে খুঁজেও, প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করেও সেটার কোন পাত্তাই মেলেনি আজ পর্যন্ত? কিন্তু—

হাঁ—শুধু তাই নয়—মৃত খগেনবাবুর পিঠের পরে কয়েকটা তীক্ষ্ণ কোন বস্তুর সাহায্যে আঁচড় কাটলে যেমন দাগ থাকে তেমনি দাগও ছিল!

কিন্তু—আপনি জানেন না বোধ হয় দারোগা সাহেব, খগেন আর মহী জেঠতুতো ভাই, একই জয়েন্ট্ ফ্যামিলিতে ওরা মানুষ। ওদের পরিবারের মত একান্নবর্তী পরিবার বড় একটা আজকালকার দিনে দেখা যায় না। তাছাড়া খগেন ও মহীর পরস্পরের মধ্যে স্নেহ ও ভালবাসারও অন্ত ছিল না। No! No—it is simply absurd. একেবারে অসম্ভব।

আপনিও বোধহয় জানেন চক্রবর্তীমশাই, আঘাত এক এক সময় এমন জায়গা থেকে আসে যেখানে কোন আঘাতের সম্ভাবনা মাত্রও ছিল না কোন দিন।

...সেই রাত্রেই যামিনী চৌধুরী মহীতোষকে ডেকে পাঠালেন।

এবং আনুপূর্বিক সব কথা মহীকে বললেন।

তুমি হয় ত জান না মহী—ইউসুফ লোকটা যেমন কমিউনাল মাইনডেড্ তেমনি শয়তান ও কুটচক্রী! ওর অসাধ্য দুনিয়ায় কোন কাজই নেই। যদিও আমি এ সব তিল মাত্রও বিশ্বাস করি না—তবু একটা কথা আমি জানতে চাই 'বাঘনখটা, কেমন করে খোয়া গেল কিছু তার জান কি?

না! 'বাঘনখ'টা কি করে যে খোয়া গেল সেটাই আশ্চর্য!

তুমি কবে কলকাতায় যাচ্ছ?

পরশু যাবো।

বেশ! কলকাতা ছেড়ে তাহলে এখন আপাততঃ কোথাও যেও না। ব্যাপার যা ঘটবার তা ত ঘটে গেছে। এখন আমাদের দেখতে হবে কি করে এই কলংক থেকে আমরা সকলে উদ্ধার পেতে পারি।

নির্দিষ্ট দিনে মহীর কলকাতায় আর যাওয়া হলো না কারণ আগের দিন সন্ধ্যার দিকেই ইউসুফ এসে ম্যাজিস্ট্রেটের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে মহীতোষকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল থানায় খগেনের হত্যাকারী সন্দেহে।

যামিনীবাবু আপ্রাণ চেষ্টা করেও দুঃসংবাদটা চেপে রাখতে পারলেন না ; কেমন করে না জানি একান ওকান হতে হতে আগুনের মতই সংবাদটা রাতারাতি সমস্ত গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল, মহীতোষ তার খুড়তুতো ভাই খগেনের হত্যাপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছে।

যামিনী চৌধুরী চেষ্টা করেও জামিন দিয়ে ওকে খালাস করে আনতে পারলেন না।

॥ দুই ॥

কিরীটী।

কিরীটী অখ্যাতনামা 'বানীভবন' মেসে তার তিনতলার ঘরখানিতে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঐ দিনকার সংবাদপত্রটা পড়ছিল।

ঐ দিনকার সংবাদপত্রে বিলাসপুর গ্রামের অ্যামেচার ক্লাবের 'গৈরিক পতাকা' অভিনয়ের মধ্যে খগেন ঘোষের আকস্মিক নিহত হওয়ার ব্যাপার ও সেই সংক্রান্তে মহীতোষের গ্রেপ্তারের কথাটা ছাপা হয়েছিল।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে যার বাংলা অর্থ ঃ চায়ের কাপে তুফান।

ব্যাপারটা অনেকটা তেমনি।

যামিনী চৌধুরীর ছোট ভাই কামিনী এককালে কিরীটীর সহপাঠী ছিল—প্রেসীডেন্সী কলেজে। সেই সূত্রে আলাপ পরিচয়ও কিছুটা আছে।

কিরীটীর অনুসন্ধিৎসু মনে ব্যাপারটা যেন কেমন দোলা দিয়েছিল—সেইদিন বেলা ১১টার গাড়ীতেই ও বিলাসপুর যাত্রা করল।

জমিদার বাড়ীটা খুঁজে নিতে ওর বেশী বেগ পেতে হলো না।

শরৎকারে হলদে রোদ-এর মধ্যে ঝিমিয়ে এসেছে।

সামনেই একটা টানা বারান্দা ঃ একটা বেতের মোড়ার ওপর বসে কামিনী চৌধুরী একটা দোনালা বন্দুক সাফ করছিল।

কলেজের ছাত্রজীবন থেকেই কামিনীর শিকারে খুব সখ।

এই বয়েসেই সে একজন পাকা ও দক্ষ শিকারী বলে নামও কিনেছে যথেষ্ট।

সাধারণ দোহারা চেহারা ঃ তীক্ষ্ণ দু'টি চোখ—ঠোঁটের ওপরে সরু গোঁফ, দাড়ি নিখুঁত ভাবে কামান।

কামিনী কিরীটীকে দেখেই চিনতে পারলে—তাড়াতাড়ি বন্দুকটা পাশে নামিয়ে রেখে সাদর আহ্বান জানাল, কিরীটী না?—

হাঁ। চিনতে পেরেছিস তাহলে?—

বিলক্ষণ! আয়—আয়—ওরে একটা মোড়া দিয়ে যা কালু।

ভৃত্য একটা মোড়া রেখে গেল।

কিরীটী কামিনীর সাদর আহ্বানে আনীত মোড়াটা অধিকার করে বসে পড়ল।

দাঁড়া—চা দিতে বলে আসি—কামিনী ভিতরে চলে গেল।

চা-পান করতে করতে কামিনী বললে ঃ তারপর কি করছিস এখন?

ব্যবসা!

ব্যবসা! কিসের রে?—

এ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মনকে কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে দেখছি how

the crime goes?

য়্যাঁ—?

হাঁ—মানুষ মাত্রেই criminal সামান্য দু' একজন ছাড়া এবং crime-য়েরও বিভিন্ন স্তর ও প্রকৃতি ভেদ আছে। আছে বিভিন্ন সংজ্ঞা। crime বলতে আমরা কি বুঝি আর কি বুঝি না? ডাকসাইটে ছাপমারা তথাকথিত একজন criminal-য়ের সঙ্গে যারা, ধরা ছোঁয়ার বাইরে অথচ সাংঘাতিক সব crime করে বেড়ায় অবাধে, সকলের চোখের সামনে দিয়ে, সেই সব criminal-দের পরস্পরের মধ্যে মূলগত বা প্রকৃতিগত পার্থক্যটা সত্যিকারের কোথায়? এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেদের যদি ক্রিমিন্যাল বলে ধরে নেওয়া যায় তবে, তাদেরও প্রথমোক্তদের সঙ্গে আত্ম ও পাপ শুদ্ধির (?) জন্য সরকারী যে সব শোধনখানা আছে অর্থাৎ সভ্য জগতে যাকে Jail বলা হয়েছে সেখানে পাঠান হবে না কেন? এই সব ব্যপারের investigation অর্থাৎ অনুসন্ধানের জন্যই রহস্য ভেদের ব্যবসা শুরু করেছি! এখন অবিশ্যি অবৈতনিক—পরে উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিয়ে তবে কাজ করবো।

ওঃ!—তুই তাহলে detective হয়েছিস বল?

সাদা ও সহজ কথায় তাই বলতে পারিস বটে তবে—ঠিক তোরা যে অর্থে গোয়েন্দাগিরি করা বলিস এটা তা নয়। যে কোন একটা ক্রাইমের ভিতর থেকে তার সত্যটি খুঁজে বের করাই হচ্ছে আমার কাজ।

তা দুনিয়ার এত প্রকারের কাজ থাকতে হঠাৎ এ বিচিত্র ব্যাপারে তোর ঝোঁক হলো কেন?

কারণ এটা রামা, শ্যামা, যদু সাধারণের জন্য নয়, এতে প্রয়োজন তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি, দুরদৃষ্টি, স্থির চিন্তা ও ধৈর্য্য, সংযম, মানসিক ও শারীরিক ক্ষিপ্রতা, যত্ন ও সু-কঠোর অধ্যবসায় সব কিছু জড়িয়ে এক প্রকারের অসাধারণ শক্তিও বলা চলে ব্যাপারটাকে যা সাধারণের নাগালের বাইরে।

পাগল?—ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান-এ, এম, এস, সি হয়ে শেষ পর্যন্ত—

যাক ভাই! ওসব কথা! ওসব তুই বুঝবি নে। এখন কেন এখানে এসেছি তাই শোন, তোদের এখানে কিছুদিন আগে 'গৈরিক পতাকা' অভিনয়ের ব্যাপারে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে কে এক মহীতোষ ঘোষ অ্যারেষ্ট হয়েছেন তারই রহস্য উদঘাটনের জন্য এখানে এসেছি। আমি তোর সাহায্য চাই।

বুঝলাম! কিন্তু মহিতোষ ত গ্রেপ্তার হয়েছে এবং দারোগা ইউসুফের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে যতদূর জানতে পেরেছি মহীতোষ বোধহয় সত্যিই দোষী!

কি রকম?—

তুই বোধহয় জানিস না ওরা জেঠতুতো খুড়তুতো ভাই! একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে। খগেনের বাপ বিনয়বাবু বছর কুড়ি হলো মারা গিয়েছেন। বলতে গেলে ঘোষ বাড়ীর যা কিছু সম্পদ ও শ্রী বিনয়বাবুর জন্যই। ১৮ বছর বয়সের সময় বিনয় বাবু সংসার ছেড়ে চলে যান, তারপর কেউ তাঁর কোনো সন্ধান পায় নি। ২০ বছর বাদে

যখন তিনি গ্রামে ফিরে এলেন তখন তিনি প্রায় লক্ষ টাকার মালিক। কোথা থেকে কিভাবে যে তিনি টাকাটা রোজগার করেছেন তা তো কেউ জানতে পারলেই না, এমন কি কোথায় কিভাবে যে তিনি টাকাটা রেখেছেন তাও কেউ জানতে পারে নি। তবে বাইরে থেকে বোঝা গেল, ঘোষ বাড়ীর অবস্থার পরিবর্তন হলো এবং শূন্য লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা হঠাৎ যেন স্বর্ণমুদ্রায় স্ফীত হয়ে উঠলো। ফিরে এসে কিছুদিন বাদে হঠাৎ বিনয়বাবু বিবাহ করলেন এবং বিবাহের বছর দুই বাদে খগেন জন্মাল। খগেনের যখন বছর দুই বয়েস তখন থেকেই হঠাৎ যেন বিনয় বাবুর শরীরে ভাঙ্গন ধরলো। বলিষ্ঠ শরীর, সুগঠিত স্বাস্থ্য যেন হু হু করে ছয় মাসের মধ্যেই হাড়সর্বস্ব হয়ে গেল—ডাক্তারের পরামর্শে তিনি দার্জিলিংয়ে চেঞ্জে গেলেন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে।

তারপর?—

স্বামী স্ত্রী সেই যে দার্জিলিং গেলেন আর ফিরলেন না—বিনয় বাবু হঠাৎ মারা গেলেন এবং তার মৃত্যুর পাঁচ দিনের মধ্যেই বিনয় বাবুর স্ত্রীও আত্মহত্যা করলেন।

বাড়ীর বহুদিনকার পুরানো চাকর জগা গিয়েছিল ওদের সঙ্গে। দিন দুই বাদে সে, পিতৃমাতৃ হারা শিশু খগেনকে বুকে করে এখানে ফিরে এল। মহীর মা শিশুটিকে বুকে তুলে নিলেন। খগেন যেমন বিনয় বাবুর একমাত্র ছেলে ছিল—মহীও বিনয়বাবুর জ্যেষ্ঠ, দীনেশবাবুর একমাত্র ছেলে।

মহীর চাইতে খগেন বছর পাঁচেকের ছোট—একই মার স্নেহে খগেন ও মহী বেড়ে উঠতে লাগল। কি যে ভালবাসা ও সৌহার্দ্দ ছিল মহী খগেনের পরস্পরের মধ্যে—ওরা যে এক মায়ের পেটের ভাই নয় কারও সে কথা বুঝবারও পর্যন্ত উপায় ছিল না। মহী আমার চাইতে বছর দু'য়েকের ছোট, আমিই তো অনেকদিন পর্যন্ত জানতে পারি নি যে, ওরা এক মার পেটের ভাই নয়। সেই মহী যে খগেনকে অমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবে—শুধু অসম্ভবই নয়। একেবারে অবিশ্বাস্য! কিন্তু ঘটনা পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে না বিশ্বাস করেও উপায় নেই।

পরের দিন প্রত্যুষে কিরীটী কামিনীকে সঙ্গে নিয়ে থিয়েটার হলটা দেখতে গেল।

পাকা ভিত—চারিপাশে কারোগেটেড্ সীটের বেড়া ও আচ্ছাদনটাও করোগেটেড্ সীটের।

মাঝখানে ষ্টেজ—দু'পাশে ও পশ্চাতে ছোট ছোট চার পাঁচটা ঘর। একটায় স্থানীয় ক্লাব ঘর ও লাইব্রেরী—অন্য গুলোর মধ্যে দুটো গ্রীন্‌রুম ও বাকী ঘরটা সাধারণত বন্ধই থাকে।

রঙ্গমঞ্চটা নেহাৎ ছোট নয়—কলকাতার পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের মত না হলেও বেশ প্রশস্ত।

মাত্র দিন দশেক আগে এইখানে নির্দোষ আনন্দের স্রোত হঠাৎ কুটিলভাবে আবর্তিত হয়ে উঠেছিল—মৃত্যুর কুৎসিত গরলে।

অজান্তে কিরীটীর মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ, ব্যথাতুর হয়ে ওঠে।

ডান দিকের একটা ছোট জানালা বন্ধই ছিল। কিরীটী জানালার কবাট দুটো খুলে

দেয়।

সামনেই একটি ঝাঁকড়া কামিনী ফুলের গাছ ঃ সাদা সাদা ফুল ফুটে আছে অজস্রঃ মধুলোভী মক্ষিকার মৃদু গুঞ্জন, বাতাসে ফুলের সুরভি বিহার।

আনমনে কিছুক্ষণ গাছটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কিরীটীর নজরে পড়ে ঘন পাতার অন্তরালে একটা লাল কাপড়ের পাড়ের অংশ হাওয়ায় ডালের সঙ্গে দুলছে। কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের গাছটার কাছে যায়। শুধু একটা লাল পাড়ই নয়—অনেকখানি বিস্ময় সেখানে লুকান ছিল পাতার আড়ালে।

একটা লম্বায় প্রায় হাত আড়াই হবে কাঁচা বাঁশের কঞ্চি—তারই একমাথায়, পাড়ের একটা দিক বাঁধা এবং পাড়ের অন্য দিকটাই ঝুলতে দেখা গিয়েছিল স্টেজের ভিতরের জানালা থেকে।

চকিতে একটা সম্ভাবনা ওর মাথায় খেলে যায়।

ফিরে আসে ও স্টেজঘরে—চারিদিকে ও ভাল করে কি যেন খুঁজতে থাকে কিছুক্ষণ ধরে।

কামিনী বাবু প্রশ্ন করে ঃ কি খুঁজছিস?

একটা সরু হাত দেড়েক লম্বা বাঁশের কঞ্চি!

তারপরই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কামিনী, তুই যেদিন ঐ ঘটনা ঘটে এখানে উপস্থিত ছিলি তো? না—

হ্যাঁ—কেন—কেন?

আফজল খাঁ বেশী খগেন বাবুকে যখন শিবাজী বেশী মহীতোষ বাবু আলিঙ্গন করতে যায় তখন মানে ঠিক সেই মুহূর্তে একটু আগে বা পরে খগেনবাবু চিৎকার করে উঠেছিলেন বলে জানিস কিছু?

কই না তো—আর হলেও আমি অন্ততঃ শুনিনি, কিন্তু কেন?—

আচ্ছা—দুর্ঘটনা ঘটবার পর ড্রপ যখন ফেলে দেয় তখন ঘণ্টা বাজান হয়েছিল?

সে এক মজার ব্যাপার—যে লোকটার হাতে ঘণ্টা বাজাবার ভার ছিল, সে একটু আগেই ঢং করে ঘণ্টাটা বাজিয়ে ফেলেছিল।—

ইউরেকা—পেয়েছি—কিরীটী হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে!

বিস্মিত হয়ে কামিনী কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কি পেয়েছিস?—

শব্দ! Just a sound!

Just a sound!—কামিনী কতকটা বোকার মতই যেন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় হর্ষোৎফুল্ল কিরীটীর মুখের দিকে।

ছোটবেলার একটা ছেলে ভুলানো গদা ধাঁধা মনে পড়ছে,—বনের থেকে বেরুল টিয়ে—সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। বল তো ধাঁধাটার উত্তর কি?—হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করে।

কামিনী চেয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।

বলতে পারলি না তো? জানি—বলতে পারবি না। থাক—চল এবারে ফেরা যাক।

পরের দিন বিকালে কিরীটী কামিনীকে বললে ঃ দীনেশ বাবুর সঙ্গে আলাপ করবো।

মহীতোষের পিতা দীনেশ বাবু লোকটি অত্যন্ত অমায়িক—কিরীটীর আসল পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে দু'জনে বসে বসে আলাপ হলো। কিরীটী জানতে পারল মৃত বিনয় বাবুর একমাত্র পুত্র খগেনই ছিল—ঘোষ বাড়ীর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী যদিও সে কথা একমাত্র দীনেশবাবু ছাড়া আর কেউই জানত না। তবে যতটা রটে ততটা নয়—লাখ টাকা নয়, হাজার ত্রিশেক টাকা নগদ ব্যাংকে আছে আর হাজার দশেক টাকায় কিছুদিন থেকে কাঁচা মালের ব্যবসা করে এখন সেই ব্যবসার মূলধন প্রায় হাজার পঞ্চাশেকে দাঁড়িয়েছে এই ২৪ বছরে।

সব কথা শুনে কামিনী বললে ; তবে যে জ্যেঠামশাই, শুনতাম বিনয় কাকার নগদ লাখ টাকা আছে?

লাখ টাকা কি এত সহজ বাবা? থাক গে সে সব কথা! বিনুর গচ্ছিত ধন শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারলাম না, এই দুঃখটাই আজ আমার মহীর দুর্নামের চাইতেও বেশী বাজছে বুকে।

খগেনবাবু ও মহীবাবুর ঘরটা একবার দেখতে পারি কি দীনেশ বাবু?—

নিশ্চয়, চলুন!

এরপর খগেনের ও মহীর ঘরে ঢুকে ঘরের সব কাগজ-পত্র উল্টে পাল্টে দেখে কিরীটী বিদায় নিল।

আরো এক সপ্তাহ পরের কথা ঃ

যামিনী বাবুর বাইরে ঘরে বসে কিরীটী, যামিনী বাবু ও কামিনী কথাবার্তা বলছিল।

কিরীটী বলছিল, মহীতোষ বাবু একেবারেই নির্দোষ এ ব্যাপারে, তার ঘাড়ে সমস্ত হত্যাপরাধটা অত্যান্ত কৌশলের সঙ্গে চাপানো হয়েছে মাত্র।

কি রকম? আপনি তাহলে ধরতে পেরেছেন নাকি কিরীটী বাবু খগেনের আসল হত্যাকারী কে? প্রশ্ন করলেন যামিনী বাবুই।

হ্যাঁ—

ঘরের মধ্যে সহসা যেন বজ্রপাত হলো।

বিস্মিত ও বিমূঢ় যামিনীবাবু যেন একেবারে নির্বোধ বনে গেলেন। যখন কিরীটী তার জামার পকেট থেকে একটা ছোট কাগজের মোড়ক খুলে তার চোখের সামনে মোড়কের ভিতরের পদার্থটি খুলে ধরলো, দেখুন তো যামিনীবাবু এটা কি?

একটা শাড়ীর লাল পাড় বলেই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু?

হাঁ, আর একটু ভাল করে পাড়টা পরীক্ষা করে দেখুন, যে শাড়ী থেকে পাড়টা

ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে, সেটা সাধারণ মিলের শাড়ী নয়। দামী শান্তিপুরী শাড়ীর পাড়। দেখুন পাড়ের নীচে জরির নকসা আছে। আর দুর্ভাগ্যই বলুন বা সৌভাগ্যই বলুন, পাড়টা এমনভাবে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে যে ধোপার চিহ্নটাও রয়ে গিয়েছে! হত্যাকারী যে বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই, কিন্তু ভগবান বিরূপ।

আপনি কি বলতে চান? খুলে বলুন কিরীটী বাবু এসবের অর্থ কী?

হঠাৎ দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে নয়টা বাজল ; কিরীটী চমকে ওঠে, উঃ রাত নটা, এখুনি না উঠলে তা নটা কুড়ির ট্রেন ধরতে পারবো না—আচ্ছা ভাই কামিনী উঠি। হাঁ। যামিনী বাবু খুনী কে আমি ধরতে পেরেছি, সমস্ত কথা বিশদভাবে লিখে দু'খানা চিঠিতে একখানা দারোগা ইউসুফ সাহেবকে ও অন্যখানা দীনেশবাবুকে ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছি, কাল সকালের মধ্যেই সব decide হয়ে যাবে। আচ্ছা চলি নমস্কার! বলতে বলতে ওদের দু'ভাইকে কোন কথা বলবার অবকাশ মাত্রও না দিয়ে দ্রুত ও স্খলিত পদেই কিরীটী ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

॥ তিন ॥

ইউসুফ দারোগা অপরিচিত হাতের লেখা একখানা চিঠি পড়ছিল। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা হবে।

সামনের টেবিলের ওপরে রক্ষিত টেবিল ল্যাম্পটার চারপাশে কতকগুলো দেওয়ালী পোকা ঘুরছে।

দেওয়ালে টিকটিকিটাও ওৎ পেতে আছে।

দারোগা সাহেব আপনাকে বিরক্ত করছি বলে সত্যিই আমি লজ্জিত। চিঠির নিচে নাম না দেখেই বুঝবেন, আত্মপরিচয় দিতে আমি ইচ্ছুক নই। আগেই বলে নিই মৃত খগেন ঘোষের হত্যা সম্পর্কে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। খগেন ঘোষের হত্যাকারী মহীতোষ নয়—সম্পূর্ণ অন্য লোক। নাম পরে বলছি—আগে খুলে বলে নিই। অভিনয়ের রাতের আগে থেকেই খুনী খগেনকে হত্যা করবার মতলব এঁটে রেখেছিল—অর্থাৎ তার কাজের প্ল্যান আগে হতেই ঠিক করা ছিল। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ধনুক বানিয়ে, তীরের ফলায় তীব্র কুরারী বিষ মাখিয়ে, সেই বিষাক্ত তীর দিয়ে বিদ্ধ করে খুনী খগেনকে হত্যা করে। ষ্টেজের পাশে যে ঝাঁকড়া কামিনী গাছটা আছে সেই গাছে বসে বসেই খুনী বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করেছিল—অব্যর্থ তার লক্ষ্য! বলতে পারেন স্বয়ং সব্যসাচীর মতই লক্ষ্যভেদে সে ওস্তাদ। এবং সব চাইতে বুদ্ধির কাজ খুনী কি করেছিল জানেন? শিবাজী বেশী মহীতোষ তাকে 'বাঘনখ' দিয়ে আঘাত করবার পর যখন খগেন অভিনয়ের প্রয়োজনে ধরাশায়ী হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তটিই তীর নিক্ষেপ করে।

অভিনয়ের ব্যাপারে সকলেই এত মশগুল ছিল যে দর্শক হতে শুরু করে অভিনেতা মহীতোষ পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত তীরটাকে কেউ লক্ষ্য করেনি। এমন কি তীর বিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খগেন চিৎকার করে ওঠে সে চিৎকারটাকেও কেউ অস্বাভাবিক বলে মনে করে নি—মঞ্চের মধ্যে অভিনেতারা তো পারেই নি এমন কি দর্শকরাও পারেনি, তার কারণ ঠিক সময়ে ঘণ্টা বাজানো হয়! অবশ্য পার্শ্বেই দণ্ডায়মান মহীতোষের বোঝা উচিত ছিল, কিন্তু মহীতোষ তা পারে নি, কারণ মহীতোষ তখন অভিনয়ে এত ব্যস্ত যে ও ভেবেছে খগেন বুঝি আসলে অভিনয়ই করছে! যাহোক খুনী তীর নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই সাজঘরে এসে মহীতোষের অবর্তমানে বাঘনখটা সরিয়ে ফেলে কাজ সমাপ্ত করে। এবং তাড়াতাড়িতেই হোক বা মনের ভুলেই হোক, যে কঞ্চিটাকে ধনুকের মত করে তীর নিক্ষেপের সময় সে ব্যবহার করেছিল, সেটাকে গাছের সঙ্গেই লটকে রেখে আসে। এদিকে খগেনকে নিয়ে যখন সবাই ব্যস্ত, সেই ফাঁকে খুনী ষ্টেজে গিয়ে তীরটা সরিয়ে ফেলে সবার অলক্ষ্যে। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন মহীতোষের বাঘনখের আঘাতে মৃত্যু হয়নি? ব্যাপারটা আগাগোড়া মহীকে দোষী দাঁড় করাবার জন্য খুনীর সাজান! মহীতোষ সম্পূর্ণ নির্দোষ।

ইউসুফ আরো গভীর মনযোগের সঙ্গে পত্রটার শেষ পড়তে থাকেন—

ওদিকে দীনের বাবুও একখানা চিঠি পড়ছিলেন।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে তিনি যেন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছেন।

দীনেশবাবু পড়তে লাগলেন।

তারপর—এখন তাহলে সত্যিকারের খুনী কে? কিন্তু সে কথা বলবার আগে একটু ভণিতা করতে চাই। ছোট্ট একটা মুখবন্ধ! আপনি হয়ত জানেন না আপনার অজ্ঞাতে আপনার মৃত ভ্রাতুষ্পুত্র খগেন একজনের সঙ্গে গোপনে Partnershipয়ে চোরাই মালের ব্যবসা, বেচা কেনা করছিল—আপনারই দেওয়া টাকায়। চমকে উঠবেন না—হাঁ যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্রই খগেন। এখন হয় তো আপনি বুঝতে পারছেন—চোরাই-মালের কারবার করেই গোপনে বিনয়বাবু ঐ অর্থ জমিয়েছিলেন। যাহোক ছেলেও বাপের পথ বেছে নিয়েছিল, এসব কথা খগেন বাবুর ড্রয়ারে একটা ডাইরী থেকেই আমি জেনেছি, যেটা সেদিন তার ঘর থেকে আমি উদ্ধার করে নিয়ে আসি আপনাদের সবার অলক্ষ্যে। আপনি যে সেদিন বলেছিলেন, একমাত্র আপনি ছাড়া উইলের কথা অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিই জনে না, তাও ভুল। খগেন জানত সে উইলে ও কথা এবং তার কাছ থেকেই হয়ত তার পার্টনারও জানতে পেরেছিল। তাই সে, খগেনকে পথ থেকে সরাবার চেষ্টা করে। খুনী বা খগেনের অংশীদার ও খগেনের মধ্যে একটা চুক্তি হয়, খগেনের ও তার নিজের সমস্ত সম্পত্তি যা কিছু সমস্তই ঐ ব্যবসায় খাটানো হবে। অর্থাৎ এককথায় ব্যবসার মধ্যেই দু'জনের যা কিছু আছে সব টাকা যাবে। কাজেই বুঝতে পারছেন দু'জনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হলে অন্যজনই সব কিছুর মালিক হচ্ছে! একথাটাও চুক্তি নামায় ছিল, যার একটা কপি

খগেনের ড্রয়ারেই পাওয়া গিয়েছে এবং দারোগা সাহেবকে পাঠিয়েও দিয়েছি আমি এ মামলার প্রমাণস্বরূপ।

ইউসুফ পড়ছিল চিঠির শেষাংশ।

এখন দেখুন ঐ দলিল—দলিলের নিচে যাদের নাম সই আছে একজন খগেন ও অন্য জন তার অংশীদার। ঐ অংশীদারই হচ্ছে খগেনের হত্যাকারী। আরো প্রমাণ পাবেন—চিঠির মধ্যে যে শাড়ীর পাড়টা পাঠিয়েছি সেটা থেকেও। আপনাদের স্থানীয় মধু ধোপাই বলবে ঐ চিহ্ন কোন বাড়ীর কাপড়ের।

হাঁ—ঐ অংশীদারের স্ত্রীর পুরাতন একটা শাড়ীর পাড়। ঐ পাড় থেকেই মধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কে খুনী, আমি ধরতে পেরেছিলাম। কিন্তু মোটিভটা ধরতে পারছিলাম না। অবশেষে খগেনের ডাইরী থেকেই মোটিভরাও খুঁজে পেলাম সেটাও এই সঙ্গে পাবেন।

এখন নিশ্চয়ই মহীতোষ বাবুকে মুক্তি দিয়ে সত্যিকারের খুনীকে গ্রেপ্তার করতে আপনার আর আপত্তি থাকতে পারে না!

খুনী এখনো সন্দেহ করেনি যে আমরা একথা জানতে পেরেছি ঃ খুনী সেই অর্থাৎ কামিনী চৌধুরী! নমস্কার!

কিরীটী রায়।

পঞ্চমুখী হীরা

॥ এক ॥

আশ্চর্যই বটে!

না হলে এও কখনো সম্ভব হয়, না হতে পারে। বাড়ীর মধ্যে লোহার সিন্দুক। সেই সিন্দুকের মধ্যে থেকে শেষ পর্যন্ত কিনা হীরাটা চুরি গেল।

পঞ্চমুখী হীরাটা চুরি গেছে!

আশ্চর্য!—সত্যি বড় বিস্ময়কর ব্যাপার!

জমিদার বলদেব রায়ের লোহার সিন্দুক হতে তাঁর পূর্বপুরুষের সম্পত্তি পঞ্চমুখী হীরাটা চুরি গেছে। বলদেব রায় চৌধুরীর শয়নঘরের পাশেই যে ছোট্ট চোরা কুঠুরী, তারই ভিতরে বিলিতী কুলুপ দেওয়া আয়রণচেষ্ট এবং সেই লোহার চেষ্টের মধ্যে এক গুপ্ত কোটরে রূপার একটা কৌটার মধ্যে সেই হীরাটা ছিল। সেই হীরা চুরি গেছে।

অভূতপূর্ব অত্যাশ্চর্য ঘটনা। হীরাটা সাতপুরুষ আগের!

অর্থাৎ সাতপুরুষ ধরে রায়চৌধুরীদের বংশে ছিল ঐ সম্পত্তিটি।

বলদেব রায়চৌধুরী অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছেন এবং মুষড়ে অবশ্য পড়বারই কথা। সাতপুরুষ ধরে সতর্কদৃষ্টি দিয়ে একটা জিনিস আগলে এনে আজ যদি সেটা চুরি যায় তবে কার না মনের বলদেব রায়ের মত অবস্থা হয়!

হতচকিত বিমূঢ় প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে নায়েব প্রফুল্ল বললেন, পুলিশে

সংবাদ দেবো বড় বাবু।

না! না—পুলিশ, পুলিশ এ ব্যাপারে কি করবে?—

তা হলে?—প্রফুল্ল প্রভুর মুখের দিকে তাকায়।

আমিও যে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না প্রফুল্ল!

পরের দিন!

প্রফুল্লবাবু বললেন, তাহলে না হয় এক কাজ করা যাক বড় বাবু! প্রইভেট ডিটেকটিভ কিরীটী রায়কে একটা খবর দেবো! আজকাল তাঁর বেশ নাম।

বলদেব রায় উদাসভাবে বললেন, কাল হতে আমার সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে প্রফুল্ল। তুমি যা ভাল বোঝ কর।...উঃ। এত দিনকার সঞ্চিত ধন, আমার পূর্বপুরুষেরা আজ স্বর্গে বসে আমার দিকে চেয়ে ঘৃণা ও লজ্জায় শিউরে উঠেছেন হয়ত? শেষের দিকে অনুতাপের বেদনায় তার গলার স্বর ভারী হয়ে উঠল। চোখের কোল বেয়ে দু ফোঁটা অশ্রু ও গড়িয়ে পড়ল।

কিরীটী ও সুব্রত যখন এসে সোনারপুর ষ্টেশনে গাড়ী হতে নামল, সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক তখন অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। ষ্টেশনে নায়েব প্রফুল্লবাবু নিজেই ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

ছোট্ট ষ্টেশনটি। লাল সুরকী ঢালা প্লাটফরম্। ষ্টেশনমাষ্টারের ঘরখানি টিনের সেড দেওয়া। সমস্ত ষ্টেশনে মাত্র গোটা তিনেক কেরোসিনের বাতি টিম্ টিম্ করে জ্বলছে।

ষ্টেশনের প্লাটফরমের একপাশে একটা ঝাকড়া কামিনী ফুলের গাছ। তাতে অজস্র সাদা ফুল ধরেছে, আশপাশের বাতাস মাতাল হয়ে উঠেছে। প্রফুল্লবাবু সেই গাছটার নিচেই একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

হীরা চুরির ব্যাপারটা আগাগোড়াই গোপন করে রাখা হয়েছিল ; একমাত্র জমিদার বাড়ীর লোক ছাড়া আর কেউই জানে না।

কিরীটী আর সুব্রত এক থার্ডক্লাস কামরা হতে নেমে, ষ্টেশনমাষ্টারের হাতে টিকিট দুটো দিয়ে ইতস্ততঃ তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলল। যাত্রী ওরা ছাড়া আর দুজন মাত্র।

নমস্কার!...

অন্ধকারে সহসা অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে দুজনেই থমকে দাঁড়াল।

আপনারাই বুঝি কলকাতা থেকে আসছেন? বলে প্রফুল্লবাবু ওদের সামনে এগিয়ে এলেন।

আপনি!

কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রফুল্লবাবুর দিকে তাকাল।

আমার নাম প্রফুল্ল সামন্ত। আমি বলদেববাবুর সদর নায়েব। নমস্কার।—আমিই আপনাকে চিঠি দিয়েছিলাম।

কিরীটী হাত তুলে এতক্ষণে প্রতিনমস্কার জানাল।

আপনাদের তো আগের ট্রেনে আসার কথা ছিল না? প্রফুল্লবাবু প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, কিন্তু একটা জরুরী কাজে আটকে পড়েছিলাম।—

সকলে কথা বলতে বলতে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল।—স্টেশনের বাইরে প্রকাণ্ড একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। অন্ধকারে বাতাসে তার পাতায় পাতায় কী একরকম অদ্ভুত সিপ, সিপ শব্দ হতে থাকে। জমিদারবাড়ীর প্রকাণ্ড মিনার্ভা গাড়ীখানা সেই গাছের নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে।

আসুন।—গাড়ীর দরজা খুলে প্রফুল্লবাবু ওদের আহ্বান জানালেন। সকলে উঠে বসল ; গাড়ী ছেড়ে দিল।

হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ী ছুটে চলল গ্রাম্য পথ ধরে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামের মেঠো পথ—উঁচু নীচু আঁকাবাঁকা।—পথের দুপাশে নানা জাতীয় বুনো গাছপালা—অন্ধকারে যেন ভূতের মত ঘাপটি মেরে বসে আছে। কোথাও গাছের পাতায় পাতায় জোনাকীর প্রদীপ জ্বলে আর নেভে, নেভে আর জ্বলে—কোথাও বাঁশঝাড়ের সরু পাতায় পাতায় রাতের হাওয়ার হিস-হিস সিপ-সিপ শব্দ জাগায়। কোথাও বন-যুঁইয়ের ও কাঠমল্লিকার তীব্র উগ্র গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে।

গাড়ি এগিয়ে চলে।—

কিরীটীই প্রশ্ন করে, সমস্ত ঘটনাটা যদি একবার আমাকে খুলে বলেন প্রফুল্লবাবু?

প্রফুল্লবাবু বলতে লাগলেন, ব্যাপারটা যে কেমন করে ঘটল, তা আজও আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। এ যেন স্বপ্নেও বিশ্বাস করা যায় না কিরীটীবাবু।—কর্তার শয়ন ঘরের সংলগ্ন পাশের ছোট্ট চোরা কুঠরীতে বিলিতি কুলুপ আঁটা আয়রণচেষ্টে সেই হীরাটা ছিল। লাটের কিস্তির টাকা দেওয়ার তারিখ সেদিন। আগের দিন সেই টাকা আমি আর কর্তাবাবু দুজনে মিলে আয়রণচেষ্টে রেখে আসি। সেদিন আমি সর্বপ্রথম হীরাটা দেখি। কানাঘুষায় শুনেছিলাম বটে জমিদারবাবুদের অদ্ভুত এক 'পঞ্চমুখী হীরা' আছে, কিন্তু চোখে দেখবার সৌভাগ্য কোন দিনই হয় নি। সেই প্রথম দেখলাম মানে কর্তাবাবুই আমায় দেখালেন।

কতদিন বলদেব বাবুর ওখানে চাকরী করছেন প্রফুল্লবাবু? হঠাৎ কিরীটী কথার মধ্যে প্রশ্ন করে।

তা বৎসর সাতেক তো হবেই!—

হুঁ! বলুন?—

প্রফুল্লবাবু আবার তার বক্তব্য শুরু করতে যাবেন হঠাৎ আবার কিরীটী বলে ওঠে—আচ্ছা ওদের যে এই বহুমূল্য পঞ্চমুখী হীরাটা আছে একথাটা তো খুবই গোপনীয় না?—

হ্যাঁ!—কিন্তু সেদিন কর্তা নিজেই টাকা রাখবার সময় রূপার কৌটা হতে হীরাটা বের করে আমায় বললেন, প্রফুল্ল, এই আমাদের পঞ্চমুখী হীরা। আমাদের এক

পূর্বপুরুষ নবাবের কাছ হতে সৎকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ এটা পেয়েছিলেন।—সত্যি এত বড় চমৎকার হীরা আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় একটা অদ্ভুত চাপা দ্যুতি যেন সেই হীরার ভিতর থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে চোখ যেন ঝলসে যায়। খুব কম হলেও হীরাটার দাম বোধ করি পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা তো হবেই। কর্তা বলতে লাগলেন, প্রফুল্ল! এই পঞ্চমুখী হীরাই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী।

তারপর আবার আমার সামনেই সেই হীরা সিন্দুকে বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে আমরা ঘর হতে বের হয়ে এলাম।

পরের দিন বেলা সাতটার সময় আমি যখন কর্তাবাবুর কাছে কিস্তির টাকা চাইতে গেলাম, কর্তাবাবু বললেন, চল, আয়রণচেষ্ট হতে বের করে তোমার টাকা দিইগে। কিন্তু আয়রণচেষ্ট খুলতে গিয়ে তার চাবিটা খুঁজে পাওয়া গেল না। তাই তো—চাবি কোথায় গেল?—ভয়ানক চিন্তার বিষয়! এখন উপায়?

কর্তাবাবুর বিছানার নীচে যেখানে সাধারণতঃ চাবি থাকে সেখানে ও অন্যান্য সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গাই তন্ন তন্ন করে চাবি খোঁজা হল, কিন্তু চাবিটা পাওয়া গেল না কোথাও।—

কর্তাবাবু একেবারে পাগলের মত হয়ে উঠলেন ; বললেন, কি হল প্রফুল্ল?—চাবি কোথায় গেল!

বললাম, তাই তো বাবু! আমিও তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার ঠিক মনে আছে তো চাবি অন্য কোথাও রাখেন নি?

না।

কাল সিন্দুকে টাকা রাখবার পরে আর কি সিন্দুক খুলেছিলেন?

না।

তারপর হঠাৎ যেন চিন্তিতভাবে বললেন, আচ্ছা প্রফুল্ল, মনের ভুলে কাল চাবিটা ও ঘরেই ফেলে রেখে আসিনি তো?

কি জানি। চলুন একবার না হয় দেখা যাক।

ড্রয়ার হতে সেই সিন্দুকের ঘরের চাবি নিয়ে দরজা খুলে ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অস্ফুট চীৎকার করে বাবু পিছিয়ে এলেন। বাবুর পশ্চাতে আমি ছিলাম।

আশ্চর্য্য হয়ে শুধালাম, কি হল?—

সর্বনাশ! একি সিন্দুক খোলা কেন! অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠেন কর্তাবাবু।

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে সিন্দুকের কাছে দুজনে এগিয়ে গেলাম।

সত্যি সিন্দুকের ডালা খোলা। কর্তাবাবু তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করবার জন্য সিন্দুকের সামনেই বসে পড়লেন।

আমি বললাম, দেখুন আগে কিছু চুরি গেছে কি না?

দেখা গেল পাঁচ হাজার করে তিন থাকে পনের হাজার টাকার নোট লাটের কিস্তির

জন্য দ্বিতীয় তাকে একটা রূপোর কৌটায় সাজান ছিল, সেটা ঠিকই আছে! দরকারী দলিলপত্র কিছুই চুরি যায় নি! আশ্চর্য—সিন্দুক খোলা অথচ কিছুই চুরি যায় নি।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, আপনিই হয়ত কাল মনের ভুলে সিন্দুক আটকাতে ভুলে গিয়েছিলেন। দেখুন তো বাবু হীরাটা আছে কিনা?

কর্তা আমার কথা শুনে তাড়াতাড়ি কৌটটা খুললেন।

সর্বনাশ!

দেখা গেল—রূপার কৌটা শূন্য! পঞ্চমুখী হীরাটা নেই।

অস্ফুট চীৎকার করে কর্তা মাথায় হাত দিয়ে একেবারে বসে পড়লেন! সত্যি কি আশ্চর্য! নগদ টাকা কড়ি দলিলপত্র সব আছে, নেই কেবল পঞ্চমুখী হীরাটা। চোর সব ফেলে রেখে কেবল হীরাটাই নিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণ কণ্ঠে কর্তা ডাকলেন।

প্রফুল্ল।...একি ব্যাপার?

কিছুই তো আমিও বুঝতে পারছি না বাবু।—

তাই তো! এ যে একেবারে ভৌতিক কাণ্ড! সমস্ত খুচরো টাকা, দলিলপত্র সব ঠিক আছে ; গেল কিনা সেই হীরাটাই শুধু। চোর মাত্র হীরাটা নিয়েই সরে পড়ল।

সুব্রত কথা বললে, সব রইলো গেল কেবল হীরাটাই! সত্যি। ভারী আশ্চর্যের কথা তো?

কিরীটী মৃদু হাসতে হাসতে বললে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই সুব্রত। যে হীরাটা চুরি করেছে তার হয়ত টাকার চাইতে হীরাটারই বেশী প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু হীরাটাও তো সে নিয়েছে নিশ্চয় টাকার জন্যই। বললে সুব্রত।

না। টাকার জন্য হীরা অপহরণ করা হয় নি। হীরার জন্যই হীরাটা অপহৃত হয়েছে।

কি বলছিস কিরীটী?

ঠিকই বলছি!

॥ দুই ॥

আরো কিছুক্ষণ পরে গাড়ী এসে জমিদারবাড়ীর গেটে প্রবেশ করল।...

প্রকাণ্ড ফুলের বাগান তার মধ্য দিয়ে প্রশস্ত কাঁকর ঢালা পথ একেবারে গাড়ী-বারান্দা পর্যন্ত চলে গেছে।

গাড়ী হতে নেমে প্রফুল্লবাবুর পিছু পিছু কিরীটী ও সুব্রত একেবারে বলদেব-

বাবুর শয়নঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

কারণ বলদেববাবু সেখানেই ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

ঘরে ঘরে তখন আলো জ্বলে উঠেছে।

হীরা চুরির পর হইতে বলদেব রায় যেন একেবারে মুষড়ে পড়েছেন!

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রফুল্লবাবু ডাকলেন—বাবু।

কে?

কিরীটীবাবু এসেছেন।

বলদেববাবু শয্যার উপর উঠে বসলেন, বললেন, আসুন, বসুন। নমস্কার।

কিরীটী ও সুব্রত দুখানা চেয়ারে উপবেশন করে। বলদেববাবু বললেন, আমার নায়েবের মুখে কিছু কিছু হয়ত শুনেছেন।...অত্যন্ত ক্লান্তি ও অবসন্নতা তাঁর কণ্ঠের স্বরে যেন প্রকটিত হচ্ছে।

তারপর একটু থেমে বলদেববাবু আবার বললেন, আমি হীরাটা চুরি যাওয়া অবধি একেবারে পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছি কিরীটীবাবু। হয়ত—হয়ত কেন নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাব হীরা যদি না পাওয়া যায়। প্রফুল্লই আপনার কথা বলায় আপনাকে ডেকে আনিয়েছি। এখন আপনিই ভরসা।

বলদেব রায়ের চোখের কোল দুটি জলে ভরে উঠল।

আপনার এ ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ হয়? কিরীটী প্রশ্ন করে।

আমার। না। তবে কিন্তু কি জানেন এ হীরার কথা ও বাড়ীর দুজন লোক ছাড়া কেউ জানেই না ; আমি আর আমার ছোট ভাই সন্দীপ। তার যখন বাইশ বছর বয়স সেই সময় বাবার সঙ্গে একদিন রাগারাগি হওয়ায় বাড়ী হতে উধাও হয়ে যায় ; মাত্র সাত দিন আগে দীর্ঘ দশ বছর বাদে সে আবার ফিরে এসেছে।

আর কেউই এই হীরার সম্বন্ধে তো জানত না?

না। ওঃ হ্যাঁ, যেদিন হীরা চুরি যায় তার আগের দিন প্রফুল্লকে সেই হীরাটা দেখিয়েছিলাম।

হীরাটা কোন্ ঘরে ছিল?—কিরীটী প্রশ্ন করল।

ঐ ঘরে।—বলদেববাবু ও প্রফুল্লবাবু একই সঙ্গে আঙ্গুল তুলে একটা বন্ধ দরজা দেখিয়ে দিলেন।

ঘরটা দেখতে পারি একবার?—

নিশ্চয়ই। প্রফুল্ল ঐ টিপয়ের উপর চাবিটা আছে, তুমিই দেখিয়ে আন। ওদের ঘরটা। বলদেববাবু বললেন।

ঘরের মধ্যে দেওয়ালঘড়ি ছাড়াও একটা হ্যারিকেন বাতি ছিল, প্রফুল্লবাবু হ্যারিকেন বাতিটা তুলে নিয়ে বললেন, আসুন।

পকেট হতে একটা ছোট শক্তিশালী টর্চ বের করে কিরীটী বললে, আলোর দরকার হবে না প্রফুল্লবাবু। টর্চ আছে।...

ঘরটা বলদেববাবুর শয়নঘরের পাশেই। ঘরটা খুবই ছোট। যাতায়াতের একটা মাত্র

দরজা। মোটা মোটা লোহার শিক দেওয়া ছোট ছোট দুটো জানালা। তারও কবাট আঁটা। সিলিংয়ের গায়ে গোটা পাঁচেক ঘুলঘুলি—বাতাস খেলবার জন্য। প্রকাণ্ড আয়রণ চেষ্টটা দক্ষিণ দিককার দেওয়ালের ধারে দাঁড় করান। মজবুত বিলিতি তালা তার গায়ে।

কিরীটী হাতের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরটা ভাল করে দেখে নিল।

এই সিন্দুকেই হীরাটা ছিল?—কিরীটী প্রশ্ন করে!

আজ্ঞে!

আচ্ছা, সিন্দুকটা একবার খুলুন তো!

প্রফুল্লবাবু বলদেববাবুকে ডেকে এনে সিন্দুক খোলালেন ; সিন্দুকটা দেখে সকলে বাইরে চলে এল।

খাওয়া দাওয়ার পর সকলে নিচের ঘরে এসে বসলেন। প্রফুল্লবাবু বললেন, কতকগুলো কথা আপনাকে জানান উচিত কিরীটীবাবু!...প্রফুল্লবাবু তখন যা বললেন তার মর্ম এই ঃ—

বাড়ীতে লোকজনের মধ্যে বলদেববাবু, তিনি অকৃতদার ; দুই ভাগ্নে প্রদীপকুমার ও সুকুমার। বলদেববাবুরা দুই ভাই! বলদেববাবুর বাবার জীবিত অবস্থাই তাঁর ছোট ভাই সন্দীপবাবু বাড়ী হতে পালিয়ে যান। তাই মৃত্যুকালে তিনি তাঁর পলাতক পুত্রের সম্পত্তির ভার বলদেববাবুর হাতেই দিয়ে যান। এখন সমস্ত সম্পত্তির সমান অংশীদার তিনজন। সন্দীপবাবু যখন বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ী হতে পালিয়ে গেলেন এবং পাঁচ বৎসরের মধ্যেও ফিরলেন না, তখন বলদেববাবুর বাবার উইল করে প্রদীপ ও সুকুমারকে এক অংশ ও দুই অংশের ভার বলদেববাবুর হাতে দিয়ে গেলেন এবং বলে যান যদি কোনদিন সন্দীপবাবু ফিরে আসেন তবে সম্পত্তির এক অংশ সন্দীপবাবু পাবেন। আর যদি একান্তই না ফিরেন তবে ঐ অংশ সমানভাবে প্রদীপ ও সুকুমারবাবু পাবেন।

দীর্ঘ দশ বৎসর পরে সন্দীপবাবু ফিরে এলেন। বলদেববাবু বহুকাল পরে ভাইকে পেয়ে সুখী হলেন। সন্দীপবাবু ফিরে আসার দিন দুই পরের কথা। একদিন প্রফুল্লবাবু সন্ধ্যার অল্প পরে কি একটা জরুরী কাজে বলদেববাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য উপরে গেছেন ; দেখলেন, বলদেববাবুর ঘরের দরজাটা ভিতর হতে বন্ধ। ঘরের ভিতর কাদের চাপা তর্কবিতর্কের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রফুল্লবাবুর কৌতূহল হল। তিনি ঘুরে ওপাশের বারান্দা দিয়ে বলদেববাবুর ঘরের পিছন দিকে গেলেন। সেখানে জানালার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বলদেব ও সন্দীপবাবুর গলা শোনা গেল।

টাকা আমি কোথায় পাব? সামনেই লাটের কিস্তি। বলদেববাবু বলছেন।

সে তুমি যেখানেই পাও, আমার দেখার দরকার নেই। আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই-ই। এতদিন তুমি একা একা সব বিষয়ে স্বত্ব ভোগ করে এসেছো দাদা। এখন ও চালাকি খাটবে না। টাকা আমায় দিতেই হবে—যেখান হতে যেমন করেই

হোক। তাতে যদি তোমার লাটের কিস্তি ভেস্তেও যায় তো যাক।

আর টাকা যদি না দিই? বলদেববাবুর স্বরে কঠোরতার আভাস।

না দিই। একি ছেলেখেলা দাদা? বলে সন্দীপবাবু হেসে উঠলেন, তারপর আবার বললেন, শোন দাদা। টাকা যখন আমার চাই-ই এবং তোমারও হাতে যখন টাকা এখন নেই তোমায় একটা উপায় বাতলে দিতে পারি ; যদি ভাল বোঝ।

কী শুনি?

আমাদের পূর্বপুরুষের পঞ্চমুখী হীরাটা সিন্দুকে আছে! সেটা বিক্রী করলে তো প্রায় ষাট-সত্তর হাজার টাকা পাওয়া যাবে।—সেটাই না হয় বিক্রী করে দাও।

এই তুই কি বলছিস সন্দীপ? বলদেববাবু বলেন।

ঠিকই বলছি! হীরাটা সিন্দুকে রেখে দিলেই বা কি লাভটা হবে শুনি।

জানিস ওটা সংসারের লক্ষ্মী।

All nonesense!

দূর হয়ে যা। মূর্খ নেশাখোর। এক পয়সাও তুই পাবি না।

নেশাখোর আমি সত্য। আর অধঃপাতের পথে নেমেছি বলেই আজ আমার এ দুর্দ্দশা। না হলে টাকা আমি পথের ধূলোর মতই দেখতাম। কিন্তু টাকা আমার চাই। শোন—বিষয়ের উপর আমার এতটুকুও লোভ নেই। বিষয় সব তোমায় আমি লিখে দিতে রাজি আছি। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার চাই এবং সেটা পরশুর মধ্যেই চাই ; আর এই আমার শেষ কথা, টাকা যদি না পাই তবে ঐ পঞ্চমুখী হীরা যেমন করে হোক নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে টাকার যোগাড় করব।...বলতে বলতে পাশের দরজা ঠেলে সন্দীপবাবু বেরিয়ে গেলেন ঘর হতে।

॥ তিন ॥

এরপর সকলেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর এক সময় হঠাৎ কিরীটীই প্রশ্ন করে।

হীরাটা চুরি যায় কবে প্রফুল্লবাবু?...

যেদিন দুই ভাইয়ে তর্কাতর্কি হয় তার পরের রাত্রে।

প্রদীপবাবু কি হীরার কথা জানতেন?

না। হীরা চুরি যাওয়ার পর শোনেন।...

আর সুকুমারবাবু?—

তিনিও।—

পরের দিন প্রত্যুষে প্রথমেই কিরীটী সন্দীপবাবুর ঘরের দিকে চলল।

সন্দীপবাবু তখন বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়ছিলেন। কিরীটী গিয়ে ঘরে প্রবেশ

করল।

ভদ্রলোকের চেহারাটা রোগা!

মুখটা ভেঙ্গে গেছে, চোখে মুখে একটা সুস্পষ্ট অত্যাচারের চিহ্ন। কিরীটীর পদশব্দে শয্যা হতে না উঠেই সন্দীপবাবু প্রশ্ন করলেন, কে আপনি, কি চান?

নমস্কার জানিয়ে পরিচয় দিয়ে কিরীটী বললে, আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম।—

সন্দীপবাবু ভ্রূ দুটো কুঁচকে বললেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু মশাইয়ের এ অধমের কাছে কি প্রয়োজন বলুন তো।

প্রয়োজন একটা আছে বৈ কি। কিন্তু আপনি প্রথম হতেই যে ভাবে চটে যাচ্ছেন এতে বলতে ভরসা হচ্চে না ঠিক।—

হ্যাঁ। আমি একটু ব্যস্ত। যা বলবার চটপট বলে ফেলুন

আপনাদের পূর্বপুরুষের আমলের পঞ্চমুখী হীরাটা চুরি গেছে শুনেছেন বোধ হয়?—

ওঃ আপনিই বুঝি সেই টিক্‌টিকি।...বলতে বলতে সন্দীপবাবু উচ্চৈস্বরে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বললেন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান মশাই। যেটা চুরি গেছে সেটা ফিরে পাওয়া যাবে বলে চুরি যায় নি।...ওসব ডিটেকটিভ গল্প উপন্যাসেই সাজে আদপে ওর কোন মানেই হয় না, বুঝলেন? হীরা তো হীরা, আপনি ও হীরার টিকিটির সন্ধানও পাবেন না। আর জিজ্ঞাসা করবেন তো হীরাচুরির ব্যাপারে আমি কিছু জানি কিনা? তার উত্তরে জানাচ্ছি না, কিছু জানি না। শুনেছেন? কিচ্ছু জানি না! এখন যেতে পারেন।

কিন্তু হীরা চুরি যাওয়ার আগের দিন রাত্রে কোন বিষয় নিয়ে বলদেববাবু মানে আপনার দাদার সঙ্গে আপনার বচসা হয়েছিল না?—সে নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে? বলে কিরীটী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সন্দীপবাবুর মুখের দিকে তাকাল।

এবারে সন্দীপবাবুও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফিরে তাকালেন কিরীটীর দিকে, কে বললে?

আমি জানি। লুকিয়ে কোন লাভ নেই। আর এও আমি জানি যে অসৎ পথে অসৎভাবে জীবন যাপন করতে গিয়ে বাইরে আপনার বিস্তর দেনা এবং সেই জন্যই বর্তমানে আপনার বিস্তর টাকারও দরকার। কেমন কিনা?—

সন্দীপবাবু কটমট করে কিরীটীর দিকে তাকাতে লাগলেন তারপর বলে উঠলেন, আপনি তো আচ্ছা অভদ্র মশাই। যান যান! আপনার নিজের অন্য কাজ থাকে তো যান। বিরক্ত করবেন না।

অগত্যা কিরীটীকে উঠতেই হয়।

ওদের ভাগ্নে সুকুমার সাধারণতঃ কলকাতাতেই হোষ্টেলে থেকে পড়ে, ছুটিতে এখানে এসেছে। ছেলেটি যেমন সাদাসিদে তেমন নিরীহ। কিরীটী সুকুমারের সঙ্গে

দুচারটি কথা বলে নিচে নেমে এল।

প্রদীপবাবু লোকটিকেও কিরীটীর নিরীহ বলেই মনে হলো।

বলদেববাবুর জন্তুজানোয়ার পোষবার খুব সখ। খাঁচা ভর্তি নানা জাতীয় পাখী, ময়ূর আর কুকুর, খরগোস প্রভৃতি। নিচে বাগানের দিকে একটা হলঘরের মত আছে, সেইখানেই পশুপাখীগুলো থাকে। একজন মালী আছে, সেই ওগুলো দেখাশুনা করে। ঘরের মাঝখানে একটা বাঁধান চৌবাচ্চা ; সেটা লম্বায় প্রায় হাত তিনেক, পাশেও হাত দুই হবে, গভীর প্রায় হাত দেড়েক। তার মধ্যে নানা জাতীয় মাছ। ঘুরতে ঘুরতে কিরীটী সেই ঘরে এসে ঢুকল। বলদেববাবু চৌবাচ্চার পাড়ে দাঁড়িয়ে জলের মধ্যে খাবার ছুঁড়ে দিচ্ছেন আর মাছগুলো টুপ টুপ করে গিলে নিচ্ছে।—

কিরীটীর পদশব্দে বলদেববাবু মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, এই যে আসুন মিঃ রায়?

কি করছেন?—কিরীটী প্রশ্ন করে।

মাছগুলোকে খেতে দিচ্ছি—এদের আমি রোজ নিজ হাতে খাওয়াই। এরা আমার বড্ড প্রিয়।

কিরীটী দেখলে লাল, নীল নানা রঙের ছোট বড় মাছ চৌবাচ্চার স্বচ্ছ জলে সাঁতরে বেড়াচ্ছে।

রাত তখন গভীর।

জমিদারবাড়ীর সকলেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে।—কিরীটী শুধু একা এখনও জেগে একটা কাগজের উপর আপন মনে হিজিবিজি দাগ কাটছে। কিরীটী আর সুব্রতকে থাকবার জন্য লাইব্রেরী ঘরটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সহসা বারান্দায় কার পায়ের শব্দ পাওয়া যায়।—চাপা সতর্ক শব্দ। পা টিপে টিপে কে বুঝি হেঁটে যাচ্ছে।—

কিরীটী সতর্ক হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি চেয়ার হতে উঠে চট করে আলোটা-নিভিয়ে বারান্দার দিককার দরজাটা খুলে, কবাটের আড়ালে কান পেতে দাঁড়াল। পায়ের শব্দ এদিকেই আসছে।—ক্রমে কাছে, আরো কাছে, স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর। কালো কাপড়ে মুড়ি দেওয়া একটা লোক অন্ধকারে সতর্কভাবে পা টিপে টিপে বারান্দা অতিক্রম করে যাচ্ছে।—লোকটা লাইব্রেরী ঘরের সামনে দিয়ে সন্দীপবাবুর ঘর ছাড়িয়ে বারান্দা দিয়ে নিচে বাগানে নামবার ঘোরান সিড়িটার দিকে চলে গেল।

ঘর হতে বের হয়ে কিরীটীও চুপি চুপি লোকটার পিছু নিল।

রাত্রির অন্ধকারে বাগানটা থম থম করছে। গাছপালার শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। ঝিঁঝির একটানা ঝিঁঝি শব্দ বিশ্রী একঘেয়ে লাগছে।—কালো আকাশের গায়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তারাগুলো মিটি মিটি জ্বলছে।

কালো কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা সেই মূর্তিটা ধীরে ধীরে বাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে বলদেব রায়ের পশুপাখীর ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিরীটীও গিয়ে ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করে। অন্ধকারে আবছা—কিরীটী দূর হতে লক্ষ্য করতে লাগল।—কিছুক্ষণ পরে জল কাটার ছপ ছপ শব্দ পাওয়া গেল। অন্ধকারে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি সেই জলের চৌবাচ্চায় নেমে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।—লোকটি কি খোঁজে? মাছ ধরছে কি! হাঁ। তাই—যেসব মাছ ধরা পড়েছে সেগুলো মাঝে মাঝে আঁধারে ছটফট করে ওঠে।—মূর্তিটা আবার মাছগুলোকে ছেড়ে দেয়। এই ভাবে অনেকক্ষণ ধরে খোঁজার পর বোধহয় একটা মাছ ধরে সেটা একটা কোঁচার মধ্যে পুরে লোকটি চৌবাচ্চা হতে উঠে পড়ল। লোকটা পুনরায় সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা দিয়ে সুকুমারের ঘরে গিয়ে ঢুকে ভিতর হতে দরজাটা আটকে দিল।

পরের দিন সকালে বলদেববাবুর ভাগ্নে সুকুমারকে আর কোথাও পাওয়া গেল না। একটা চিঠি পাওয়া গেল—শুধু!

বড়মামা!

আমি চললাম।—কোথায় যাচ্ছি বা কেন যাচ্ছি তা জানালাম না। আমার খোঁজ করো না।

—হতভাগ্য সুকুমার।

এই কটি কথাই মাত্র চিঠিটাতে লেখা।

বলদেববাবু চিঠিটা হাতে করে কিরীটীর খোঁজ করতে করতে তাঁকে এসে পশু-পাখীর ঘরে আবিষ্কার করলেন। কিরীটী একদৃষ্টে মাছের চৌবাচ্চাটার সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছিল।

এই যে রায় মশাই আসুন।—

কি দেখছেন?—

আপনার মাছগুলো।—বলতে বলতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা রায় মশাই। চৌবাচ্চায় কটা মাছ ছিল আপনার মনে আছে?

নিশ্চয়ই—একটা বড় দশটা ছোট, কেন বলুন তো?—

না এমনি। কিন্তু আমাকে খুঁজছিলেন কেন বললেন না?

সুকুমার পালিয়েছে—

সে কি।—

হাঁ, এই দেখুন—

চিঠিটা বলদেববাবু কিরীটীর হাতে দিলেন। কিরীটী চিঠিটা দুবার পড়ল তারপর চিঠিখানি আবার বলদেববাবুর হাতেই ফিরিয়ে দিল।

॥ চার ॥

ঘণ্টাখানেক বাদে কিরীটী সোজা প্রফুল্লবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলো, প্রফুল্লবাবু?

কে। মিঃ রায়। কি খবর?

কিরীটী বললে, দুপুরের গাড়ীতেই আমি যাব প্রফুল্লবাবু, সেই রকম বন্দোবস্ত করে দিন।—

প্রফুল্লবাবু যেন কতকটা আশ্চর্য হয়েই কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন। কিরীটী বুঝতে পেরে হেসে বললে, ভয় নেই। আপনাদের হীরা পাওয়া গেছে।—

পাওয়া গেছে? বিস্ময়ে প্রফুল্লবাবু একেবারে যেন নির্বাক হয়ে গেলেন। সুব্রতও ওর মুখর দিকে তাকায়। এমন সময় একজন ভৃত্য ঘরে প্রবেশ করে বললে, নায়েব মশাই, ছোট বাবু এখুনি দশটার ট্রেনে চলে যাবেন ; কি একটা জরুরী কাজের জন্য আপনাকে একটি বার ডাকছেন—শীঘ্র চলুন।

ভৃত্যের কথায় কিরীটী চমকে ফিরে তাকাল।

কে চলে যাবেন? ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করে কিরীটী।

ছোট বাবু—সন্দীপবাবু! জবাব দিলেন প্রফুল্ল।

শীঘ্র বলদেববাবুকে একটিবার ডাকুন, প্রফুল্লবাবু। আর চলুন আমরা সকলে ছোট বাবুর ঘরে যাই।

সকলেই এসে সন্দীপবাবুর ঘরে জড় হয়েছেন—বলদেববাবু, প্রফুল্লবাবু, কিরীটী ও সুব্রত।—

সন্দীপবাবু যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

বলদেববাবুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে কিরীটী বললে, আপনার হীরার সন্ধান মিলেছে বলদেববাবু।—

কই!—কই!—বলদেববাবুর কণ্ঠে একরাশ উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা ঝরে পড়ল।—

সন্দীপবাবু বিরক্তি মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, আপনার ও আরব্যপন্যাসের আলাদীনের গল্প শুনবার মত সময় আমার নেই, আমার ট্রেন ধরতে হবে ; জরুরী! বলতে বলতে তিনি সুটকেশ ও বিছানার দিকে একটু এগিয়ে গেলেন।

ক্ষিপ্রগতিতে সরে এসে ডান পা-টা সন্দীপবাবুর সুটকেসের উপর তুলে দিয়ে বজ্রনির্ঘোষে কিরীটী বললে, হাঁ যাবেন বৈ কি। আর আরব্যপন্যাসের গল্প অনেক সময় শুনতে ভাল না লাগলেও শুনতে হয়। জানেন না একটা চলতি কথা আছে, Facts are stranger than fictions.

সন্দীপ ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন, এসবের মানে কী?

মানে অতি সহজ ও সরল। পঞ্চমুখী হীরাটা ফিরিয়ে দিয়ে আপনি যেখানে খুশী যেতে পারেন, তাতে আমার এতটুকু আপত্তিও নেই মশাই জানবেন।

মুহূর্তে যেন সন্দীপবাবুর মুখখানা ছাইয়ের মতই সাদা হয়ে গেল—সামনে যেন

ভূত দেখছেন। পরক্ষণেই সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে ব্যঙ্গ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, বলেন কি আপনার কি ধারণা হীরাটা তাহলে আমিই চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছি।

না। আপনি হীরা চুরি করেন নি বটে, তবে চোরের উপর বাটপাড়ি করে পালাচ্ছেন একথা সত্য। আপনার ঐ সুটকেশ খুলুন দেখুন হীরা পাওয়া যা. কিনা?

সহসা বলদেববাবু একলাফ দিয়ে সুটকেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে সুটকেশটা খুলে ফেলে হাতড়াতে হাতড়াতে একটা সিগারেটের খালি টিনের কৌটার মধ্যে হীরাটা পাওয়া গেল।

বলদেববাবু সোৎসাহে বলে উঠলেন, পেয়েছি! পেয়েছি এবং পরক্ষণেই সন্দীপবাবুর দিকে ছুটে এসে রুখে দাঁড়ালেন, বললেন, চোর, বদমাস, হীরা চুরি করে পালাচ্ছিলি তোকে আজ খুনই করব।

বলদেববাবু দুহাত দিয়ে ভাইয়ের গলা টিপে ধরতে গেলেন, কিন্তু কিরীটী বাধা দিল, বলল, দাঁড়ান! ওকে বৃথা দোষ দিচ্ছেন, চোর তো উনি নন। উনি শুধু নিমিত্তের ভাগী, চোরের উপর বাটপাড়ি করতে গিয়ে—

তবে?—

শুনুন। সন্দীপবাবুর প্রথম হতে কোন দিনও হীরাটার উপরে লোভ ছিল না। হীরাটা যেদিন চুরি যায় সেদিন সন্দীপবাবু দুর্ভাগ্যবশতঃ সবই টের পান। কেননা তার পক্ষে সেটা অসম্ভব ছিল না। তাঁর শোবার ঘরের বাথরুমের সঙ্গেই হচ্ছে সিন্দুকের ছোট কুঠুরী, তিনি হয়ত বাথরুমে গিয়েছিলেন।

টাকার বিশেষ প্রয়োজন তাই দাদার কাছ হতে টাকা কেমন করে পাওয়া যেতে পারে সে চিন্তায় সে রাত্রে তিনি হয়ত বা জেগেই ছিলেন। পাশের ঘরে চাবি দিয়ে সিন্দুক খোলার শব্দে তিনি উৎকর্ণ হয়ে উঠেন। চোর বলদেববাবুর ঘরের ভিতর হতে হীরা চুরি করে বলদেববাবুর বাথরুমের ভিতর ঢুকে বারান্দা দিয়ে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে বাগানে যায়। সন্দীপবাবু তাকে অনুসরণ করেন। চোর সোজা বাগান দিয়ে বলদেববাবুর পশুপাখীর ঘরে গিয়ে ঢোকে এবং মাছের খাবারের মধ্যে হীরাটা পুরে সেটা মাছের চৌবাচ্চায় ফেলে দেয়। একটা মাছ খাবারের সঙ্গে সেটা গিলে ফেলে। চৌবাচ্চার মধ্যে নানা আকারের মাছ আছে। ছোট মাছের পক্ষে সেটা গিলে খাওয়া সম্ভব নয়। একটা লাল রঙের বড় মাছ ছিল, সেটাই হীরাটা গিলে খায়। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই সন্দীপবাবু দেখেন তারপর পর পর দুই রাত্রি সন্দীপবাবু সেই মাছটি ধরবার চেষ্টা করেন এবং তৃতীয় রাত্রে অর্থাৎ কাল সেই মাছটা ধরে এনে তার পেট কেটে হীরাটা বের করে নেন। কিন্তু তিনিও একটু চালাকী খেলেন ; তাঁর ঘর হতে তিনি সুকুমারের ঘরে যান এবং তার জামা কাপড় পরে জলে নেমে মাছ ধরেন, যাতে ভিজে জামা কাপড় সুকুমারের ঘরে পেলে আসল চোরের সন্দেহটা সুকুমারের উপর গিয়ে পড়ে! রাতারাতি সুকুমারকে মৃত্যুভয় দেখিয়ে তাকে দেশত্যাগী হতে বাধ্য করেন, যাতে তার উপর কোন সন্দেহই আর পড়তে বাকী না থাকে,—পাকাপোক্ত ভাবে বেচারী সুকুমারের উপরেই সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়ে!

মজা হয়েছে এইখানেই—আসল যে চোর সে চাইছিল আবার সন্দীপবাবুর ঘাড়ে সব সন্দেহটা চাপাতে!

সকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে কিরীটীর কথাগুলো শুনছে।

প্রফুল্লবাবু প্রশ্ন করলেন, তবে আসল চোর কে?

বিদ্যুৎগতিতে ফিরে দাঁড়িয়ে সম্মুখে আঙ্গুলি নির্দেশ করে কঠিন কঠোর কণ্ঠে কিরীটী বললে, আসল হীরা চোর—দুষ্কর্মের হোতা আপনাদের সকলের সামনে হীরার মালিক স্বয়ং বলদেববাবুই। আবেগে উত্তেজনায় কিরীটীর সর্বশরীর থরথর করে ঘন ঘন কম্পিত হচ্ছে—এর চাইতে ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধহয় সকলে এতটা চমকে উঠতো না।—কিরীটী বলতে থাকে—

হীরা আসল যে কে চুরি করেছে সেটা এখানে প্রথম দিন ষ্টেশনে নেমে প্রফুল্লবাবুর মুখে সব কথা শুনেই বুঝতে পেয়েছিলাম এবং এও বুঝেছিলাম চোরের 'পর বাটপাড়ী হয়েছে, নচেৎ আমার খোঁজ না করে বলদেববাবু পুলিশকেই সংবাদ দিতেন।

তারপর বলদেববাবুকে লক্ষ্য করে কিরীটী বলতে লাগল, আপনারা হয়ত ভাবছেন কেমন করে জানলাম! সেও খুব সহজেই! হীরাটার প্রতি প্রফুল্লবাবুর বলদেববাবুর অহেতুক দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যাপারটার exposed everything. প্রফুল্লবাবুকে আগের দিন হীরাটা দেখিয়ে রেখে, নিজে ভালমানুষটি সেজে খুব চাল চেলেছিলেন রায় মশাই! কিন্তু আপনার এটা খেয়াল হল না যে, সত্যি যদি আপনার হীরাটা চুরি যেত আপনি তাহলে প্রফুল্লবাবুর হাতে সব ছেড়ে দিয়ে এমনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারতেন না। ঘরে আপনি একা সে রাত্রে শুয়েছিলেন, ভিতর হতে দরজা বন্ধ ছিল, সিন্দুকের চাবি পর্যন্ত আপনার কাছে, কে আপনার ঘরে ঢুকতে পারে বলুন তো? রাস্তা কোথায়? যেতে হলে হয় সন্দীপবাবু কিংবা সুকুমারবাবুর যেতে হয়...কিন্তু সেও তো অসম্ভব, অথচ তাদের ঘর পাশাপাশি থাকার দরুণ সন্দেহটা তাদের ঘাড়েও বেশ চাপান যেতে পারা যায়। আর একটা কথা—সন্দীপবাবুর টাকারই দরকার ছিল। তিনিই যদি চুরি করতেন তবে কিস্তীর যে পনের হাজার টাকা ছিল, সেটা নিয়েই ত সরে যেতে পারতেন, হীরা তিনি নিতে যাবেন কেন? তাতে যে অনেক হাঙ্গামা হবে তা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। শেষটায় অবিশ্যি বাধ্য হয়েই শুধু হাতে ফেরার চাইতে হীরাটা চুরি করা শ্রেয় মনে করেছিলেন।...দুটো ভুল করেছিলেন রাই মশাই! প্রথমতঃ অহেতুকভাবে প্রফুল্লবাবুকে হীরাটা দেখিয়ে, দ্বিতীয়তঃ হীরাটা সরিয়েও টাকাগুলো as it is সিন্দুকে রেখে দিয়ে। আচ্ছা নমস্কার, এখন আসি। হীরা আপনাদের ফিরে পেলেন, দু ভাইয়ের মধ্যে এখন বোঝাপড়া করুন। আর আমার ফিসটা ইচ্ছা হয় পাঠিয়ে দেবেন—এস সুব্রত দেরী হলে ট্রেন ধরা যাবে না। চলুন প্রফুল্লবাবু।—

সুব্রতর হাত ধরে কিরীটী ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

প্রফুল্লবাবু ওদের অনুসরণ করলেন।

মৃত নক্ষত্র

॥ এক ॥

শুনেছিস কিরীটী, নক্ষত্র মৃত।

ঝড়ের মতই যেন অসিত সোম এসে ঘরে ঢুকে কথাটা বলে হাঁপাতে লাগল।

সোফার উপরে শিথিল ভঙ্গিতে বসে কিরীটী গল্প করছিল, অকস্মাৎ যেন সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করল, কি বললি অসিত?

নক্ষত্র সেন নিহত হয়েছে। পুনরায় অসিত সোম কথাটা বললে।

সত্যি বলছিস?

হ্যাঁ—সেখান থেকেই তো আসছি—বলাকার আশেপাশে একেবারে কৌতূহলী জনতা গিস গিস করছে।

আকস্মিক ঘটনায় আমিও বিস্মিত কম হইনি।

কিরীটীর কলেজ লাইফের প্রথম দিকে কিছুদিনের জন্য সহপাঠী ছিল ঐ নক্ষত্র সেন এবং গত মহাযুদ্ধের পর হঠাৎই যেন রাতারাতি ত্রিপলের ব্যবসা করে নক্ষত্র সেন কলকাতা শহরের ধনিক সম্প্রদায়ের অন্যতম বলে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল।

বলাকা তারই নবনির্মিত বাড়ির নাম।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সোফার পাশেই ত্রিপয়ের উপরে রক্ষিত ফোনটা তুলে নিয়ে কিরীটী যেন কার সঙ্গে কথা বলছে।

কিরীটী ফোনটা রেখে দিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার রে কিরীটী? এবারে আমিই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধালাম।

বুঝতে পারছি না ঠিক, তবে ওদেরও ধারণা নক্ষত্র সেনকে কেউ হত্যাই করেছে।

বলতে বলতে কিরীটী অন্দরের ও বাইরের ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটার দিকে অগ্রসর হল।

বেরুচ্ছিস নাকি?

হ্যাঁ—একটু ঘুরে আসি—

কিন্তু কোথায়? নিশ্চয়ই বরাহনগরে?

তাই। যাবি নাকি?

চল।

কিরীটীর সঙ্গেই তার গাড়িতে বের হয়ে পড়লাম।

কাশীপুর পুলিশ আউটপোস্টটা বাঁয়ে রেখে সোজা যে রাস্তাটা পূব থেকে পশ্চিমে চলে গিয়েছে বরাবর গঙ্গাতীরের দিকে, নক্ষত্র সেনের 'বলাকা' সেইখানেই একেবারে গঙ্গার বুকে।

গঙ্গার বুকে কথাটা এতটুকুও কিন্তু অত্যুক্তি নয়। সত্যিই গঙ্গার বুকে থেকে যেন সাদা দুধের মত ধবধবে দুটি পক্ষ বিস্তার করে নক্ষত্র সেনের বলাকার উড্ডীন ভঙ্গিটি।

প্রচণ্ড একটা জিদ আর প্রচুর অর্থব্যয় ছিল নক্ষত্র সেনের অদ্ভুত পরিকল্পনা তার ঐ বাড়ি 'বলাকা'র পিছনে। প্রথমতঃ গঙ্গার ধারের জায়গা ক্রয় ব্যাপার নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে দীর্ঘ আট মাস বহু অর্থব্যয় করে মামলা চালাতে হয়েছিল, তারপর পাথর ও বহু টন সিমেন্ট ঢেলে ভিত তৈরী হয়েছিল বলাকার—একেবারে যাকে বলে গঙ্গাবক্ষে।

সবটাই নক্ষত্র সেনের নিজস্ব পরিকল্পনা। শহর নয় অথচ শহর থেকে বেশী দূরেও নয়—মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে একেবারে গঙ্গার কোলে বাড়ি তৈরী করার পশ্চাতে ছিল নক্ষত্র সেনের কবি মনটি।

অবিকল বিস্তৃত-পক্ষ উড্ডীন ভঙ্গির একটি বলাকাই যেন বাড়ির গঠনটি!

বাইরেটা শ্বেতশুভ্র, ভিতরের দেওয়ালও তাই। আর মেঝে আগাগোড়া সাদা মার্বেলে মোড়া।

অনুরূপ সাদা মার্বেল পাথরের সিঁড়ির বরাবর নেমে এসেছে একেবারে গঙ্গাবক্ষে।

নক্ষত্রর আমন্ত্রণেই ইতিপূর্বে চার-পাঁচবার 'বলাকা'য় এসেছি আমরা।

অতএব বলাকা আমাদের অপরিচিত নয়।

নক্ষত্রের বয়স চল্লিশের ঊর্ধ্বে হলেও আজও সে অকৃতদারই ছিল। একক। সংসারেও আপনার বলতে দ্বিতীয় কোন প্রাণী ছিল না।

একমাত্র সন্তান মা বাপের। মা বাপ তার কৈশোরেই গত হয়েছিল। দূর সম্পর্কীয় এক মামার আশ্রয়ে মানুষ।

লেখাপড়াও বেশীদূর করে নি।

বি এস-সি থার্ড ইয়ারে পড়তেই অর্থাভাবে পড়াশুনা আর চালাতে সক্ষম না হয়ে এক জার্মান সাহেবের ত্রিপলের ফ্যাক্টরীতে সুপার ভাইজার হিসাবে ঢুকেছিল ঠিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বছর তিনেক পূর্বে।

চেহারাটি ছিল নক্ষত্রর একটি সত্যিকারের মূলধন।

লম্বায় প্রায় ছয় ফুট হবে। গোরাদের মত টক্‌টকে রঙ। পুরুষোচিত পেশল দেহের গঠন। বিস্তৃত বক্ষপট। প্রশস্ত ললাট। নাকটা সামান্য চাপা। দুটি চক্ষুর তারা পিঙ্গল।

বরাবর কলেজের নাম্বার ওয়ান অ্যাথলেট ছিল। সেই কারণেই চিরদিন একটু যেন দুঃসাহসীই ছিল। ত্রিপল ফ্যাক্টরীর জার্মান সাহেবের নজরে প্রথম থেকেই পড়ে গিয়েছিল নক্ষত্র।

চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নক্ষত্র মামার আশ্রয় ছেড়ে এসে উঠেছিল এক অখ্যাত নামা সস্তা দরের ভাঙা মেস বাড়িতে।

জীবনধারণের জন্য একান্তভাবে যেটুকু নেহাত না হলে নয় সেটুকু বাদে বাকী সবই সঞ্চয় করত। ঐ ভাবেই বছর তিনেক কেটে গেল।

তারপর এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

যুদ্ধ বাধার মাস আষ্টেকের মধ্যেই চারিদিকে পরিস্থিতিটা যখন বেশ ঘন ঘোর হয়ে এসেছে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে কলকাতা শহরে ভিনদেশী অর্থাৎ জার্মান ও জাপানী ব্যবসায়ীদের অবস্থাটা বেশ শঙ্কাজনক ও অনিশ্চয়তার টলটলায়মান, যে সময়ে যার যার তল্পিতল্পা গুটিয়ে যা হাতে পাওয়া যায়, সেই নিয়ে নিজ নিজ দেশের দিকে পালাতে ব্যস্ত—সেই সময়ই একদিন ত্রিপল ফ্যাক্টরীর জার্মান স্বত্বাধিকারী তাঁর নিজস্ব ঘরে নক্ষত্রকে ডেকে পাঠান।

সেন, কারবার আমি বিক্রয় করে দিয়ে চলে যাব দেশে, খদ্দের দেখে দিতে পার? তবে ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে, নচেৎ জানাজানি হয়ে গেলে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হবে।

ভাল খরিদ্দার হয়তো পাওয়া যেত কিন্তু তাড়াহুড়োয় সে রকম মনোমত খরিদ্দার পাওয়া কষ্ট। সাহেবও ওদিকে অধীর হয়ে উঠেছে।

একদিন আবার সেনকে সাহেব ডেকে পাঠাল, সেন, তুমি না হয় আমার ফ্যাক্টরীটা কিনে নাও!

নক্ষত্র বলে, অত টাকা আমি কোথায় পাব সাহেব! এতদিন তো সাধারণ সুপার-ভাইজার ছিলাম তোমার এখানে! এইতো সবে বছরখানেক অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়েছি—

সাহেব ক্ষণকাল যেন কি ভাবল, তারপর বলল, বেশ, কত টাকা আছে তোমার?

তা কুড়িয়ে চেয়েও ধার কর্জ করে হয়তো হাজার দশেক কোনমতে টেনে টুনে যোগাড় করতে পারি—

সাহেব আবার দিন দুই ভাবল। তারপর তৃতীয় দিনে আবার ডেকে বললে, ঠিক আছে সেন, ঐ দশ হাজারই দাও তুমি, আমি সবকিছু লিখে দিয়ে যাব।

নক্ষত্র তো কথাটা বিশ্বাসই করতে পারে না। স্বপ্ন না রসিকতা! কিন্তু স্বপ্নও নয় রসিকতাও নয়, শেষ পর্যন্ত ঐ দশ হাজার টাকার বিনিময়েই ত্রিপল ফ্যাক্টরীটা চলে এল নক্ষত্রের হাতে।

তারপরের ইতিহাস মাত্র ছয়টি বৎসরের। যুদ্ধের দিনের ইতিহাস। নক্ষত্র মাত্র ঐ ছয় বৎসরেই লক্ষাধিক টাকার মালিক হয়েছিল—মুখে সে কথাটা না বললেও আমরা জানতাম।

আরও এক বৎসর বাদে ঐ বলাকার সৃষ্টি।

চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পুরুষের পক্ষে এমন কিছু একটা বয়সই নয়। তার উপর যার আছে স্বাস্থ্য ও অর্থসম্পদ।

তাই বুঝি অকৃতদার নক্ষত্রকে নিয়ে তথাকথিত ধনী সমাজে আলোচনা ও কৌতূহলের অন্ত ছিল না। কৌতূহলটার অবিশ্যি আরো একটি কারণ ছিল।

মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যা রাত্রে তার সাদা রঙের কনভার্টিবল বিরাট বুইকে বসে আসত তার বলাকায় অপরূপ সুন্দরী এক তরুণী। এবং মধ্য রাত্রে নক্ষত্রই পৌঁছে দিয়ে আসত নিজের গাড়িতে করে নিজেই ড্রাইভ করে।

অবিশ্যি মাত্র মাস ছয়েক হবে নবাগত ঐ তরুণীর যাতায়াত শুরু হয়েছিল বলাকার।

॥ দুই ॥

বেলা তখন বোধকরি গোটা দশেক হবে। শীতকাল বলেই বেলা এমন কিছু তখনো মনে হচ্ছিল না।

বলাকার সম্মুখ ভাগেই গঙ্গা এবং পশ্চাতে তার সদর ও প্রধান প্রবেশ পথ। গঙ্গার ধার ধরে যে সড়কটা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে সেটা 'বলাকা'র পশ্চাতেই গেটের সামনে। ডাইনে একটা বিরাট পুরাতন বটবৃক্ষ।

বাঁয়ে খানিকটা অগ্রসর হলে পরপর দুটো ইঁট, চুন সুড়কির আড়ত।

আমরা যখন গিয়ে বলাকার সামনে পৌঁছলাম, কৌতূহলী জনতার ভিড় ও উঁকি-ঝুঁকিটা কিছুটা কমে এলেও যা অবশিষ্ট ছিল তাও কম নয়।

'বলাকা'র গেটের সামনে জনা দুই লালপাগড়ী ও একজন জমাদার এবং রাস্তার এদিক-ওদিকে জনা দুই লালপাগড়ী। একপাশে দাঁড়িয়ে একটা পুলিশের জীপ।

সৌভাগ্যক্রমে জমাদার ব্রিজনন্দন আমাদের পূর্বপরিচিত হওয়ায় বলাকায় প্রবেশের আমাদের কোন অসুবিধা হল না।

বলাকা দেড়তলা বাড়ি। সামনে দেড়তলা, পশ্চাতের অংশ অর্থাৎ রাস্তার উপরের অংশ একতলা।

ঘর কিন্তু কিচেন, গ্যারাজ ও সার্ভেন্টস রুম বাদ দিয়ে ছখানা। ছখানি ঘর বিভিন্ন সাইজের। মধ্যখানে একটি হলঘর ও সামনে বারান্দা এবং তারই দুইপাশে এবং মধ্যস্থিত গোল ঘরকে কেন্দ্র করে প্রসারিত ভুজের মত ঘরগুলি।

সমস্ত বাড়িটার পশ্চাৎ ভাগে দেড় মানুষ সমান প্রাচীর, তার উপরে কাঁটা তার দেওয়া বাইরে থেকে সেই প্রাচীর টপকিয়ে অন্দরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য।

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সামনের সোফাসেট ও ফুলগাছের টবে সুসজ্জিত বারান্দাটি অতিক্রম করবার মুখেই কাশীপুর থানার ও. সি. রতিকান্ত মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মুখোমুখি।

রতিকান্তও আমাদের পূর্বপরিচিত।

বছর চারেক পূর্বে টালিগঞ্জ থানার ও. সি. ছিল।

বেঁটে গোলগাল চেহারা অনেকটা নাড়ুগোপাল প্যাটার্নের। সমস্ত মাথা-জোড়াই প্রায় টাক। ভারী একজোড়া গোঁফ।

॥ তিন ॥

রতিকান্তকেই অনুসরণ করে আমরা এসে গোল ঘরে প্রবেশ করলাম। সমস্ত গোল ঘরটি এমন চমৎকারভাবে সাজান যে নক্ষত্রের রুচি ও শিল্পবোধের অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে উপায় নেই।

গোল ঘরের দেওয়ালে গোলাকৃতি টিউব লাইটগুলো তখনো জ্বলছিল। বারেক সেদিকে দৃষ্টিপাত করে কিরীটী আমার পিছনে পিছনে রতিকান্তকে অনুসরণ করে। এবারে আমরা সকলে প্রবেশ করলাম এসে ২নং দক্ষিণমুখী ঘরটার মধ্যবর্তী খোলা দরজা পথে।

সেই ২নং ঘরেই একটা রাইটিং টেবিলের সামনে দামী রিভলভিং গদি-আঁটা একটা চেয়ারে দক্ষিণ পূর্বমুখী উপবিষ্ট অবস্থায় নক্ষত্রের মৃতদেহটা ছিল।

মাথাটা বাঁ দিকে ও দেহটা চেয়ারের পিছনে হেলে রয়েছে। মৃতের সম্মুখ ভাগটা দেখা যাচ্ছে না। ঘরে পা দিয়েই কিরীটী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

তার চোখের দিকে তাকাতেই বুঝলাম তার চিরাচরিত অত্যন্ত সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিঃশব্দে অকুস্থানটি পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে লক্ষ্য করছে।

আমি নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহের একেবারে সামনাসামনি দাঁড়ালাম।

পরিধানে দামী ক্রীজ করা অ্যাশ কালারের ট্রপিক্যাল লংস, গায়ে ডবল কাপের সাদা সিল্ক টুইলের শার্ট। গলায় লুজ নট্‌টাই। পায়ে দামী চকচকে ডার্বি সু।

টাই ও বক্ষস্থলের অংশটা রক্তে একেবারে ভিজে গিয়েছিল, বোধহয় এখন শুকিয়ে গিয়েছে।

পায়ের কাছেই পড়ে আছে একটা দামী ঝর্ণা কলম মেঝের কার্পেটের উপরে।

সামনের টেবিলে কিছু কাগজপত্র ও ফাইল এবং একটি খোলা স্টেট ব্যাঙ্কের চেক্ বই।

আরো একটু এগিয়ে টেক্ বইটার দিকে তাকালাম। 'অর্ডার' চেক্ বই। 'অর্ডার' কথাটা কেটে 'বেয়ারার' করা। 'পে'র জায়গায় লেখা 'সেলফ'।

কুড়ি হাজার টাকার চেক।

নামের প্রথম অক্ষর বড় হাতে 'এন' পর্যন্তই লেখা তার পর কিছু নেই! সই করা সম্পূর্ণ হয়নি।

কিরীটীও ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে মৃতদেহের সামনে।

বাঁ দিক্কার ঠিক কণ্ঠার নিচেই গুলি করা হয়েছে। কিরীটী মৃতদেহের আরো সামনে এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে বললে, ক্লোজ রেঞ্জ থেকেই গুলি করেছে। উন্ডের চারপাশে জামায় কার্বন স্পষ্ট পড়েছে—হুঁ ডেফিনিটলি এ কেস অফ মার্ডার। ইউ আয় রাইট্ রতি।

আরো একটা কথা আছে রহস্যভেদী।

রতিকান্তর কথায় মুখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল কিরীটী ওর মুখের দিকে।

মার্ডার করা হয়েছে নক্ষত্র সেনের নিজস্ব পিস্তল থেকেই গুলি ছুঁড়ে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, পিস্তলটা বাইরের বাগানে সূর্যমুখী গাছগুলোর নীচে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছে—এই দেখ—বলতে বলতে রুমালে সযত্নে জড়ান ছোট একটা আমেরিকান অটোমেটিক সাইলেন্সারযুক্ত পিস্তল বের করে রতিকান্ত কিরীটীর চোখের সামনে ধরল।

হুঁ। পিস্তলটাও তা হলে পেয়েছ?

পেয়েছি বৈকি! আর এক ছয় চেম্বারের ম্যাগাজিন থেকে একটি গুলিই নেই। বাকীগুলো দেখ এর চেম্বারেই আছে।

এ পিস্তলটা যে নক্ষত্রেরই তুমি জানলে কি করে রতি? কিরীটী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

বছর দুই ধরে আমিই নক্ষত্রবাবুর অনুরোধে ওর লাইসেন্স রিনিউ করে দিয়েছি; এটা আমার তাই বিশেষ ভাবেই পরিচিত। রতিকান্ত বললে।

হুঁ! তা হলে ওর একটা পিস্তল ছিল।

শুধু ছিলই না, অনেক রাত্রে মধ্যে মধ্যে ফিরতেন বলে জানতাম আমি। পিস্তলটা নক্ষত্র সেন বেশীর ভাগ সময় পকেটেই ক্যারী করতেন।

কাল নক্ষত্র কত রাত্রে বাড়িতে ফিরেছে জান কিছু? কিরীটী দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল।

ভৃত্য রঘুয়ার মুখে শুনেছি কাল নাকি ফিরেছিলেন অনেক রাত্রে।

কত রাত্রে?

রঘুয়া তো বললে তা প্রায় রাত পৌনে একটা হবে।

কাল কখন নক্ষত্র বাড়ি থেকে বের করে শেষবার অত রাত্রে ফেরবার আগে জান কিছু? রঘু কি বলে?

বেরিয়েছিলেন শুনলাম সকাল বেলা, আর মাঝখানে ফেরেন নি। ফিরেছিলেন একেবারে সেই রাত পৌনে একটায়।

একাই অতরাত্রে ফিরেছিল বোধ হয়?

হ্যাঁ, একাই—

কাল সকাল থেকে মানে নক্ষত্রর বাড়ি বের হয়ে যাবার পর রাত পৌনে একটা পর্যন্ত কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে বা—

হ্যাঁ, সন্ধ্যার কিছু পরে ইদানীং যে মেয়েটি ওর ওখানে যাতায়াত করছিল সেই—বাসবিকা দেবী এসেছিল—তা সেও, রঘুয়া বলল, রাত দশটা পর্যন্ত নাকি নক্ষত্র সেনের জন্যে অপেক্ষা করে করে চলে গিয়েছিল।

আর কেউ আসেনি?

না।

বাড়িতে লোকজন কে কে?

ঐ ভৃত্য রঘুয়া, নেপালী ড্রাইভার, বাহাদুর, ঠাকুর হরিধন আর মালি রামকানাই।

এরা প্রত্যেকেই অনেক দিন ধরেই বোধ হয় এখানে বহাল কাজ করছে?

রঘুই অনেকদিনকার—বাকী সব দেড় বছর দুবছর। রতিকান্ত বলতে লাগল।

কিরীটী আর কোন প্রশ্নাদি করল না।

অতঃপর ঘুরে ঘুরে সমস্ত বাড়িটা দেখতে লাগল। ভিতর দেখা শেষ হলে বাইরের বাগানে গেল। প্রথমেই গেলো দক্ষিণ মুখো বাগানে।

নানা প্রকারের গোলাপ ও দুষ্প্রাপ্য সিজন ফ্লাওয়ারের সমাবেশে ছোট বাগানটি জুড়ে যেন একটা মনোরম বর্ণবৈচিত্র্য। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা বড় গোলাপ ঝোপের সামনে এসে কি নজরে পড়ায় নীচু হয়ে সেটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল।

চেয়ে দেখলাম বস্তুটা আর কিছুই নয়, একটা সুদৃশ্য ছোট মোষের সিং-এর তৈরী নস্যির কৌটো।

নস্যির কৌটোটার স্ক্রু ক্যাপ্ খুলতেই উগ্র একটা চেনা চেনা গন্ধ নাকে এসে ঢুকল। কিরীটী দেখলাম নস্যির কৌটোটা নাকে তুলে ঘ্রাণ নিচ্ছে।

বার দুই ঘ্রাণ নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কৌটোটা আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললে, বল তো সুব্রত গন্ধটা কিসের?

গন্ধটার ভাল করে ঘ্রাণ নিলাম কয়েকবার, পরিচিত উগ্র গন্ধ কিন্তু ঠিক ধরতে

পারি না কিসের গন্ধ।

কী? ধরতে পারলি?

উঁহু!

দে—

কিরীটীর প্রসারিত হাতে কৌটোটা তুলে দিলাম! কৌটোটা পকেটে রাখতে রাখতে এবারে বললে; মাস্‌ক্—কস্তুরী।

হুঁ। তাই জানা জানা মনে হচ্ছিল বললাম।

ইমিটেশন বা সিনথেটিক্ নয় রিয়েল কস্‌তুরী, তাই গন্ধটা এত উগ্র। বড় কস্টলি নেশা।

নেশা! বিস্ময়ে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম।

হ্যাঁ, এ দেখছি শান্তশীলেরও উপরে যায়। কস্তুরীর নেশার মধ্যে লাকসারী আর অর্থ দুই-ই প্রমাণিত হয়।

আরো কিছুক্ষণ তারপর সমস্ত বাড়িটার আশপাশ ঘুরে ঘুরে দেখে কিরীটী বিদায় নেবার পূর্বে রতিকান্তের দিকে তাকিয়ে বললে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে রতি, তোমাদের ঐ বাসবিকা দেবীটি ছাড়াও সাম আদার থার্ড পারসন এ বাড়ির সকলের অলক্ষ্যে ও অজান্তেই কাল রাত্রে বলাকায় এসেছিল। আশেপাশের এ তল্লাটে লোকজনদের কাছে একটু খোঁজখবর নিতে পার?

তোমার তাই মনে হয়?

হ্যাঁ।

বেশ দেখব। তবে আমার কিন্তু মনে হয়—

কি?

ওই রঘুয়া বা বাহাদুরেরই কাজ এটা।

কেন তোমার এ ধারণা হোল বলতো?

নইলে ওর যে পিস্তল আছে বাইরের লোক জানবে কি করে? লোকটা তো কারো সঙ্গে মিশতই না। অত্যন্ত সেলফ সেন্টার্ড ছিল! তা ছাড়া—এ ধরনের চাকর বাকরদের দ্বারা মার্ডার অনেক হয়েছে।

তা হয়তো হয়েছে! কিন্তু মোটিভটা কি?

মোটিভ আবার কি, বার্গলারী—

কিন্তু কোন ঘরের মধ্যেই তো তেমন বার্গলারীর কোন নিদর্শন পেলাম না। ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত নক্ষত্রের কোটের বুক পকেটের পার্সে প্রায় হাজার টাকার নোট ছিল, হাতে এখনো দামী সোনার রিস্টওয়াচটা পরেই রয়েছে—বলে বার দুই মাথাটা নেড়ে যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই কিরীটী শেষের কথাগুলো বলল, না, ঐভাবে অতর্কিতে হত্যার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই অন্য কিছু ছিল। ভাল কথা, বাসবিকা দেবীর ঠিকানাটা জান রতি? সংগ্রহ করতে পেরেছ?

হ্যাঁ, শুনলাম ল্যান্সডাউন রোডে থাকে।

নম্বর কত?

তা জানি না তবে রঘুয়া বলছিল তার বাড়িতে নাকি ফোন আছে।

॥ চার ॥

ফোন গাইড্ থেকে শ্রীমতী বাসবিকা রায়ের ঠিকানাটা খুঁজে পেতে অবশ্যই কষ্ট পেতে হয় নি। পরের দিনই সকাল সাড়ে নটা নাগাদ আমি রতিকান্ত আর কিরীটী বাসবী ভবনে গিয়ে হানা দিলাম। চারতলা একটা ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলার একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে বাসবিকা দেবী। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে নির্দিষ্ট দরজার গায়ে কলিং বেল টিপলাম। একটু পরেই একটা নেপালী আয়া এসে দরজা খুলে প্রশ্ন করল, কিসকো মাঙতে?

বাসবিকা দেবী আছেন? ইউনিফর্ম পরিহিত রতিকান্ত এগিয়ে গিয়ে প্রশ্নটা করল।

হ্যায়—

বল, আমরা দেখা করতে চাই।

আয়া আমাদের সুসজ্জিত বাইরের ঘরে বসিয়ে পর্দা তুলে ভিতরে চলে গেল খবর দিতে।

বসবার ঘরটি বেশ ছিমছাম করে সাজান ;

একপাশে ত্রিপয়ের উপরে একটা কাঁচের সুদৃশ্য ভাসে একগুচ্ছ টাটকা রজনীগন্ধা। আর তার পাশে একটি সুন্দর বেকালাইটের রেডিও সেট।

পরমুহূর্তেই ঘরে এসে প্রবেশ করল বাসবিকা রায়।

পাঞ্জাবী মেয়েদের মত ঘাঘরা পায়জামা ও ছোট হাতা পাঞ্জাবি গায়ে, গলায় একটা আকাশ-নীল রঙের ওড়না বুকের দুপাশ দিয়ে ঝুলছে! পায়ে রবারের চপ্পল। কেশ বেণী-বন্ধ।

বাসবিকা ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই একটা উগ্র পরিচিত গন্ধের ঝাপটা এসে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল।

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম গন্ধটা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করতেই।

চমক ভাঙল রতিকান্তর কণ্ঠস্বরে, কাশীপুর থানা থেকে আসছি আমি! আপনিই তো বাসবিকা রায়?

হ্যাঁ, কিন্তু—

অনুমান করতে পারছেন বোধ হয় কেন এসেছি, সোজা স্পষ্টভাবেই রতিকান্ত তার বক্তব্য গোড়া থেকেই যেন শুরু করে দেয়, বলাকার নক্ষত্র সেনের মার্ডার কেসটার অনুসন্ধানের ব্যাপারেই কিছু জিজ্ঞাসা আছে আমার আপনাকে।

কি রকম? বাসবিকার কণ্ঠস্বর বেশ সপ্রতিভ।

কথা বললে এবারে কিরীটী, আপনি তো নক্ষত্র সেনের সঙ্গে বিশেষ ভাবেই পরিচিতা ছিলেন বাসবিকা দেবী—

বিশেষ বলতে আপনি ঠিক কি বলতে চান বুঝতে পারছি না। তবে পরিচয় ছিল তার সঙ্গে আমার, বাসবিকা বললে।

সে পরিচয় কতদিনের? আবার প্রশ্ন করল কিরীটীই।

তা কিছুদিন হবে—

নক্ষত্র সেন যে রাত্রে নিহত হন সে রাত্রে সন্ধ্যার পর গিয়ে আপনি বলাকায় রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন তাই না?

ঘড়ি ধরে অত সময় তো মনে রাখি নি তবে কিছুক্ষণ বোধ হয় অপেক্ষা করেছিলাম। শান্ত কণ্ঠে বললে বাসবিকা। কোন রকম উত্তেজনার লেশমাত্রও বা এতটুকু নার্ভাসনেসও যেন নেই সে কণ্ঠস্বরে।

নক্ষত্র সেনের মৃত্যুর ব্যাপারটা কখন জেনেছেন আপনি?

ইট ওয়াজ রাদার সারপ্রাইজিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ শকিং যদিও—আজ সকালেই সংবাদপত্রে পড়লাম।

সংবাদপত্রে নিউজটা পড়বার আগে কিছুই জানতেন না?

সিওরলি নট।

সে রাত্রে বলাকা থেকে বের হয়ে আপনি কোথায় যান?

হোয়াই! স্ট্রেট টু মাই হাউস আই কেম ব্যাক।

ডোন্টমাইন্ড, অনেকেরই কিন্তু ধারণা নক্ষত্র সেনের সঙ্গে নাকি আপনার কোর্টশিপ চলছিল।

অল রট! ননসেন্স—

আপনি তাহলে কথাটা স্বীকার করেন না?

সিওরলি নট্।

ঐ ব্যাপারটা স্বীকার না করলেও এটা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবেন না যে প্রায়ই বলাকায় রাত্রের দিকেই আপনি যেতেন এবং বহু মধ্যরাত্রে সেখান থেকে ফিরতেন, আর নক্ষত্র সেনই আপনাকে অত রাত্রে নিজে ড্রাইভ করে এসে পৌঁছে দিয়ে যেতেন। আরো একটা জিনিস আমি নক্ষত্র সেনের শয়নকক্ষের ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে পেয়েছি, বলতে বলতে একটা মেয়েদের চুল ডোনেট করবার রিং কাগজের মোড়ক খুলে বের করে বাসবিকার চোখের সামনে ধরতেই পুনরায় সেই ক্ষণপূর্বের উগ্র গন্ধটা নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করল।

শেষোক্ত ঘটনায় বাসবিকা যেন হঠাৎ কেমন দপ করে নিভে যায় সহসা।

মুহূর্তকাল বোবা দৃষ্টিতে বস্তুটার দিকে তাকিয়ে কিরীটীর মুখের দিকে নিঃশব্দে চোখ তুলে তাকাতেই কিরীটী এবারে শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বললে, এ বস্তুটি যে আপনার এটা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না। আর আপনার মত কোন এক অবিবাহিতা তরুণীর এই ধরনের কোন প্রসাধন দ্রব্য যদি কোন অবিবাহিতা পুরুষের শয়নকক্ষের

ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে পাওয়া যায় আর সেখানে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে কারো ধারণা হয় সেটা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক নয়। কি বলেন?

নিঃশব্দে এবারে মৃদু হাসল বাসবিকা। এবং সেই হাসি হাসি মুখে বললে, ওটা যে আমারই তার কোন প্রমাণ আছে কি?

আছে বৈকি! আপনার যে বিশেষ গন্ধটি প্রিয় সেই 'মাসক'—কস্তুরীর গন্ধই এ থেকে বেরুচ্ছে।

সহসা মনে পড়ল আমার, সত্যিই তো ঐ উগ্র গন্ধটাই তো বাসবিকা ঘরের মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করেছিল!

কিন্তু কিরীটী আর কথা বলল না। সহসা রতিকান্তকে নিঃশব্দে চোখের ইঙ্গিত করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা চলি বাসবিকা দেবী, ভবিষ্যতে হয়তো আবার দেখা হতে পারে। নমস্কার—

সেদিন ঐ ধরনের এক নাটকীয় পরিস্থিতির পর অকস্মাৎই কিরীটী দ্বিতীয় আর কোন প্রশ্নাদি না করে আমাদের নিয়ে বাসবিকার ফ্ল্যাট থেকে চলে এসেছিল। পরে বুঝতে পেরেছিলাম অতর্কিতে একটা আঘাত দিয়ে বাসবিকাকে সমূলে নাড়া দেওয়াই কিরীটীর উদ্দেশ্য ছিল।

এও কিরীটীর এক ধরনের কৌশল।

তারপর দুটো দিন কিরীটী আর বাড়ি থেকেই বের হল না।

চুরুট আর পেশেন্স এই দুটো নিয়েই মেতে রইল।

করিতকর্মা থানা অফিসার বন্ধুবর রতিকান্ত অবিশ্যি চুপ করে বসে ছিল না। ঝড়ের গতিতেই যেন সে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল, এবং কিছু কিছু নতুন সংবাদ সে সংগ্রহ করেছিল ঐ হত্যা ব্যাপারকে কেন্দ্র করে।

সংবাদটির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ডিকি নামে কোন এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান টিকিট চেকার মধ্যে মধ্যে নক্ষত্র সেনের অফিসে তার সঙ্গে দেখা করতে আসত।

দ্বিতীয় বাসবিকার সংসারে এক পঙ্গু মা ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রাণী ছিল না। এবং সে কোন এক সওদাগরী অফিসে স্টেনোর চাকরি করত। সামান্য স্টেনোর চাকরি করে ল্যান্স ডাউনের অমন সুন্দর সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে যেমন বসবাস করা ও তার মত লাকসারী জীবন যাপন করাও যায় না, তেমনি উদ্বৃত্ত অর্থটা যে কোথা থেকে তার আসত তাও কেউ জানত না।

তৃতীয়, ঘটনার রাত্রে বারোটা সাড়ে বারটা নাগাদ স্থানীয় এক ছোকরা—প্রাণতোষ ক্লাব থেকে রিহার্সাল দিয়ে বলাকার সামনের পথ ধরে ফেরবার সময়ে সাহেবী পোশাক পরিহিত এক দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে বলাকার পাশেই বিরাট বটগাছটার সামনে যে গ্যাস পোস্টটা তার নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল একটি বাইসিকল হাতে।

চতুর্থ, রতিকান্ত রঘুয়া আর বাহাদুর দুইজনকেই তদন্ত সাপেক্ষে অ্যারেষ্ট করে আপাততঃ কারারুদ্ধ করেছিল।

॥ পাঁচ ॥

ঘটনার প্রায় দিন দশেক বাদে এক সন্ধ্যায় কিরীটীর ফোনে জরুরী আহ্বান পেয়ে ও টালিগঞ্জ ভবনে প্রবেশ করে দেখি, বেরুবার জন্য কিরীটী প্রস্তুত।

কোথায়ও বেরুচ্ছিস নাকি?

হ্যাঁ, চল—একবার বলাকাটা ঘুরে আসি।

এই অসময়ে?

অসময় আবার কি! এই তো সবে সন্ধ্যা।

বলাকার গেটের সামনে এসে দাঁড়াতেই অপরিচিত, নবনিযুক্ত এক দীর্ঘকায় শিখ দারোয়ান আমাদের গতিরোধ করল, কিসকো মাঙতা?

সঙ্গে বলাই বাহুল্য রতিকান্তকে থানা থেকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল।

রতিকান্তই এবারে বললে, তার অপূর্ব নিজস্ব জগাখিচুড়ি হিন্দী বাংলায়, ভিতর মে কে হ্যায়, উসকো খবর দাও, দারোগা সাহেব থানাসে আয়া—

থানা আর দারোগা কথা দুটির নাম মাহাত্ম্য আছে। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হল। শিখ দারোয়ান 'ঠারিয়ে' বলে ভিতরে চলে গেল।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, রতিকান্ত সেদিন প্লেন ড্রেসেই ছিল।

মিনিট পনেরর মধ্যেই নতুন একজন ভৃত্য এসে সঙ্গে করে আমাদের নিয়ে গিয়ে গোলঘরে বসাল।

আরো মিনিট দশেক বাদে ডান পাটা একটু যেন টানতে টানতে গোলঘরে এসে একজন প্রবেশ করল : আগন্তুকের পরিধানে ঢোলা পায়জামা ও কিমোনা। পায়ে চপ্পল। হাতে ধরা একটি পিকাডিলি সিগারেটের টিন ও ম্যাচ।

মুখে একটি জ্বলন্ত সিগ্রেট। বয়স তেত্রিশ—চৌত্রিশের বেশী হবে না। রোগাটে ঢ্যাঙ্গা চেহারা। এক মাথা রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল। মুখের চেহারাটা রুক্ষ। ভাঙ্গা গাল, ঈষৎ কোটরগত চক্ষু ; দীর্ঘ অত্যাচারের চিহ্ন যেন মুখখানিতে সুস্পষ্ট। ডান পাটা ঈষৎ টানতে টানতে আগন্তুক আমাদের সামনা-সামনিই একটা সোফায় এসে বসল। নমস্কার—কথা বললে কিরীটাই! এতক্ষণ সে নিঃশব্দে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল, আগন্তুককে।

আপনাকে তো ইতিপূর্বে কখনো দেখি নি এখানে?

না। বরাবর আমি পাটনাতেই থাকতাম। চাপা কর্কশ গলায় কথাটা বললেন আগন্তুক।

আপনি কি নক্ষত্র সেনের—

হ্যাঁ, তার আপন মামাতো ভাই!

ও। তা আপনার নামটা—

বঙ্কুবিহারী চৌধুরী।

আপনি কি তা হলে মৃত নক্ষত্র সেনের সব কিছুর বর্তমান ওয়ারিশন?

তা ছাড়া আর কে হবে বলুন! আমরা ছাড়া তো দুনিয়ায় ওর আর কেউ ছিল না।

কথা বললে এবারে রতিকান্ত, আপনার ডান পাটা কি—

হ্যাঁ, বছর চারেক আগে অস্টিও মালাইটিসের অপারেশনের পর থেকেই ঐ অবস্থা আমার। বেটা ডাক্তার অপারেশন করেছে না তার মাথা করেছে, একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে সারাটা জীবনের জন্য। তিক্ত কটু কণ্ঠে কথাগুলো বললে বঙ্কুবিহারী।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে একটা জুতোর খট্ খট্ শব্দ শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় যে প্রাণীটি এসে আমাদের চোখের সামনে গোলঘরে প্রবেশ করল, তাকে দেখে আমি অন্তত সত্যিই চমকে উঠেছিলাম। এবং লক্ষ্য করলাম সেও ঐ সময় আমাদের ত্রয়ীকে ঐখানে দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল। বঙ্কুবিহারী কিন্তু ততক্ষণে তাকে কলকণ্ঠে সম্বর্ধনা জানায়, এস বাসবী, এত দেরী হল যে?

বাসবিকা বঙ্কুবিহারীর সাদর সম্বর্ধনার কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে সোজা দৃঢ়পদে ভিতরের দিকে চলে গেল পরমুহূর্তেই।

বাসবিকার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে বললে, আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, আপনাকে তা হলে আর বিরক্ত করব না। আপনার বান্ধবী হয়তো আপনার জন্য ওঘরে অপেক্ষা করছেন। পরে এক সময় না হয় এসে আপনার সঙ্গে আলাপ করা যাবে। চলি, নমস্কার। চল হে রতি, আয় সুব্রত।

তিন জনে আমরা গোলঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

রাস্তায় বের হয়ে কিরীটী বললে, চল হে রতি, এবারে একবার পার্কসার্কাস যেতে হবে।

পার্কসার্কাস?

হ্যাঁ, চলই না।

পার্কসার্কাসের এক বিরাট পুরাতন বাড়ির বিভিন্ন ফ্ল্যাটগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে বহু পরিবার। তারই দোতলার এক ফ্ল্যাটের সামনে এসে কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ালাম।

কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে কর্কশ পুরুষ কণ্ঠে প্রশ্ন এল, কে?

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলোয় যে মূর্তিটিকে ঠিক দরজার কবাটের উপরে দণ্ডায়মান দেখলাম অমন রোমশ বা দানব সদৃশ কুৎসিত পুরুষ ইতিপূর্বে জীবনে কখনো আমি দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

শুধু রোম প্রাচুর্যেই নয়, মুখাবয়বেও লোকটা বানর সদৃশ।

ঢ্যাঙ্গা লম্বা? চোপসানো গালের উপরে 'ব' দ্বীপের আকারে অতি কুৎসিত ভাবে জাগানো হনু! চাপা নাক, পুরু ওষ্ঠ, বড় বড় দাঁত, ছোট কপাল, ছড়ানো সুদৃঢ় চৌকো চোয়াল। আজানুলম্বিত বাহু। পরিধানে ছিল কোমরে চওড়া বেল্ট-আঁটা নীল রংয়ের একটা লংস। ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নিরাভরণ। এবং সমস্ত ঊর্ধ্বাঙ্গ থেকে হাতের কব্জি

কালো ঘন লোমে একেবারে আবৃত বললেও এতটুকু অত্যুক্তি হবে না।

লোকটার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটা বোঁটকা গন্ধের সঙ্গে মিশ্র 'মাস্ক'—কস্তুরীর উগ্র গন্ধের একটা ঝাপটা যেন আমার নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করেছিল।

চাপা নাকের বড় বড় ফুটো দেখলাম একেবারে নস্যিতে যেন ঠাসা।

কিরীটীই প্রথমে প্রশ্ন করল ইংরেজীতে, তুমিই বোধ হয় মিঃ ডিকি!

ইংরাজীতে কর্কশ কণ্ঠে ডিকি জবাব দিল রোমশ ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে, ইয়া—বাট হু আর ইউ?

কিরীটীর চোখের ইঙ্গিতে এবারে রতিকান্তই এগিয়ে এসে বললে, কাশীপুর থানার ও. সি. আমি—তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা ছিল।

সরি, আই হ্যাভ নট্ গট এনি টাইম! অন্য সময় এসো।

কাশীপুরের নক্ষত্র সেনের মার্ডার কেসের তদন্তের ব্যাপারে আমি এসেছি, তোমাকে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, সময় তোমাকে দিতে হবে।

কিন্তু আমি বললাম তো আমার সময় নেই। এখুনি আমাকে ডিউটিতে বেরতে হবে।

তা হলেও তোমাকে সময় দিতে হবে। পুলিশজনোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে আবার কথাটা বললে রতিকান্ত।

আমি থাকি পার্কসার্কাস আর তোমার মার্ডার হল কাশীপুরে, তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক থাকতে পারে বুঝতে পারলাম না! তা ছাড়া, আই নেভার হার্ড দ্যাট ব্লিং কিং নেম ইভ্‌ন্ ইন মাই লাইফ—

সহসা ঐ সময়ে কিরীটী এগিয়ে এসে পকেট থেকে বের করল বলাকার বাগানে কুড়িয়ে পাওয়া নস্যির কৌটোটা এবং সেটা ডিকির দৃষ্টির সামনে ধরে বললে, এটা নিশ্চয়ই কার চিনতে পারছ মিঃ ডিকি?

অকস্মাৎ ফুঁ দিয়ে ঘরের একটি মাত্র আলো নিভিয়ে দিলে যেমন মুহূর্তে সমস্ত কিছু অন্ধকার হয়ে যায়, ঠিক যেন তেমনই ডিকির ক্ষণপূর্বের সমস্ত ঝাঁঝটা দপ করে নিবে গেল। কয়েক মুহূর্তে সে একটি কথাও বলতে পারে না।

বোবা দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে কিরীটীর প্রসারিত হস্ত মধ্যে ধৃত নস্যির কৌটোটার দিকে চেয়ে থাকে। আই হোপ ইউ কুড রিকগনাইজ ইট! চিনতে পেরেছ এটা কার?

তাছাড়া এও আমি জানি নক্ষত্র সেনের সঙ্গে তোমার বেশ ভাল আলাপই ছিল কারণ মধ্যে মধ্যে তার অফিসে তুমি যেতে যদিও জানি না এখনো কেন,—

বাট—

উহুঁ—আই হ্যাড্ নট্ ইয়েট ফিনিসড্ মিঃ ডিকি। এই নস্যির কৌটোটি আমি কুড়িয়ে পেয়েছি বলাকারই বাগানে! এবং এটার মালিক যখন তুমিই তখন ব্যাপারটা উইথ রিজিনস এই দাঁড়াচ্ছে নাকি যে নক্ষত্র সেন যে রাত্রে মার্ডার হন সে রাত্রে কোন এক সময় তুমি বলাকায় গিয়েছিলে?

আমি স্বীকার করছি নক্ষত্র সেনের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল—উই ওয়ার প্যালস—গভীর বন্ধুত্ব ছিল আমাদের পরস্পরের মধ্যে—

ইজ ইট সো? ইউ ওয়ার বোথ প্যালস—কিরীটী বললে।

হ্যাঁ—কিন্তু সে রাত্রে আমাদের ডিউটি রেজিস্টার খুলে দেখতে পার আই ওয়ার সন ডিউটি অন দাসপুর এক্সপ্রেস—আমি সে রাত্রে আউট অফ ক্যালকাটা ছিলাম। হেড কোয়ার্টারে আমি ছিলামই না।

দেন ইউ হ্যাভ গট ইওর অ্যালিবি! মৃদু কণ্ঠে রতিকান্ত বললে।

কিন্তু কিরীটী বললে, সে তো প্রমাণ সাপেক্ষ এই কৌটোটি যে তোমার সে তো ঠিকই।

॥ ছয় ॥

সে সন্ধ্যা রাত্রে বিস্ময়কর নাটকের শেষের মুহূর্তটি তখনো যে বাকি ছিল। এবং সেই মুহূর্তটি যে একেবারে ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পারি নি।

বুঝতে পারে নি কিরীটীর ঐ রাত্রে পাক সার্কাসে ডিকির ডেরায় অভিযান সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত। মাঝখানের কটা দিন কিরীটী একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিল না। তলে তলে সে ঐ রাত্রের নাটকের পাত্রপাত্রীদের চরম একটি নাটকীয় মুহূর্তে সমাবেশ করবার জন্য সর্বপ্রকার প্রস্তুতিই সেরে রেখেছিল পূর্বাহ্নে।

ডিকি! কি ব্যাপার, এত জরুরী ফোন কল?

অকস্মাৎ মেয়েলি কণ্ঠের প্রশ্নে আমি ও রতিকান্ত চমকে ফিরে তাকাতেই দেখি পশ্চাতে ইতিমধ্যে স্বল্পান্ধকার সরু প্যাসেজটার মধ্যে কখন এক সময় শ্রীমতী বাসবিকা এসে দাঁড়িয়েছে।

ডিকি তো যেন আকাশ থেকে পড়ে ঐ সময় বাসবিকাকে সামনে দেখে।

সে তাড়াতাড়ি বলে, হোয়াট ননসেন্স ইউ আর টকিং মাই ডিয়ার।

বাসবিকা কিন্তু ততক্ষণে আমাদের ত্রিমূর্তিকে ঐ সময় ঐখানে আকস্মিক ভাবে আবিষ্কার করে একেবারে বোবা।

কিরীটী কথা বলল ঐ সময়, ইট ওয়াজ নট মিঃ ডিকি বাসবিকা দেবী। আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম।

আপনি!

হ্যাঁ। কিন্তু এখানে এই প্যাসেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে তো আমাদের সব কথা হতে পারে না বাসবিকা দেবী। চলুন, মিঃ ডিকের ঘরে বসেই আলোচনাটা করা যাবে।

কিরীটী যেন বিহ্বল হতচকিত ডিকি ও বাসবিকাকে এক প্রকার জোর করেই অতঃপর ডিকির ঘরের মধ্যে ঠেলে দেবার চেষ্টা করল।

আমরাও বলা বাহুল্য তার পিছনে পিছনে ঘরে গিয়ে ঢোকবার জন্য পা বাড়ালাম।

কিন্তু ডিকির ভিতরে ভিতরে এতক্ষণ যে জান্তবৃত্তিটা কোন মতে নিজেকে রোধ করে রেখেছিল, সেটা যেন আর রোধ রাখতে সে পারল না।

অকস্মাৎ একটা অগ্নুৎপাতের মতই সেটা উৎসারিত হয়ে এল।

ডিকি একটা জান্তব গর্জন করে উঠল, নো, নেভার! আই সে আউট! আউট অফ মাই ফ্ল্যাট ইমিডিয়েটলি ইউ অল—আউট।

কিরীটী কিন্তু এতটুকুও বিচলিত হল না ডিকির গর্জনে। সে শান্ত কণ্ঠে বললে, তাহলে তুমি ভুলই করবে মিঃ ডিকি। আমি চেয়েছিলাম নিঃশব্দে ব্যাপারটা চুকিয়ে দিতে, তোমার স্বরূপটাকে তোমার চার পাশের পরিচিত জনদের সামনে উদ্ঘাটিত না করতে, তা তুমি যদি না চাও—ওয়েল—

নো, নো—গেট আউট—

মিঃ ডিকি!

গো টু হেল ইউ ব্লাইটার—ইউ সোয়া—

ডিকির মুখের কথা শেষ হল না, চকিতে কিরীটীর লৌহ কঠিন মুষ্টির একটি নক আউট গিয়ে ডিকির নাক ও ওষ্ঠের উপর পড়তেই সে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, ও গট্—

কিন্তু পরক্ষণেই ডিকি কিরীটীর উপরে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করতেই কিরীটীর আর একটি মুষ্টিঘাত এবারে গিয়ে পড়ল ডিকির চোয়ালে।

জন্তুর ঔষধ চাবুক! আঘাত ছাড়া হিংস্র জন্তুকে কখনো বশে আনা যায় না। জন্তু ডিকিও এবারে বুঝি বশে এল।

রক্তাক্ত ওষ্ঠ ও নাকটা পকেট থেকে একটা নস্যি মাখা রুমাল বের করে তার সাহায্যে মুছতে লাগল ডিকি। ইতিমধ্যে ডিকির গর্জনে আশপাশ থেকে দু-চারজন উঁকি-ঝুঁকি দিতে শুরু করেছিল।

কিন্তু কিরীটী তাদের কৌতূহল মেটাবার আর অবকাশ দিল না। সকলকে যেন অতঃপর নাউ লেট আস গো ইনসাইড' বলে এক প্রকার ঠেলেই ডিকির ঘরে নিয়ে ঢুকিয়ে ভিতর থেকে দরজার কবাট দুটো ভেজিয়ে দিল।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে দু-মিনিটের বেশীও বুঝি লাগে নি।

এত দ্রুত, এত আকস্মিক সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল।

নাউ মিঃ ডিকি, কেন তুমি মধ্যে মধ্যে যেতে নক্ষত্রের কাছে বলবে কি? কিরীটী প্রশ্ন করে।

আমি তো তোমাকে বলেছিই, উই ওয়ার প্যালস—

হ্যাঁ, তোমরা যে প্যালস ছিলে তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে সেটা চীনা পাড়ায় হোটেলের গোপন কোকেনের নেশার আড্ডায়—তাই না! কি, জবাব দিচ্ছ না যে? কিরীটী প্রশ্ন করে।

মন্ত্র পড়া সাপের মতই তখন হিংস্র প্রকৃতির ডিকি একেবারে নিশ্চুপ নিঃঝুম!

আর বাসবিকা দেবী! ঘুরে দাঁড়াল চকিতে পরমুহূর্তে কিরীটী অদূরে স্থাণুর মত দণ্ডায়মান বাসবিকার দিকে এবং বলতে লাগল, তুমি দোহন করেছ সেই হতভাগাকে তোমার রূপের আকর্ষণে আর ডিকি নেশা যুগিয়ে গোপনে মাস্কসেনটেড নস্যি যুগিয়ে, একত্রে দুদিক থেকে। কিন্তু সে রাত্রে দুজনাই তোমরা বলাকায় কেন গিয়েছিলে এবারে বলবে কি?

বাসবিকা একেবারে চুপ! যেন পাথর।

মিঃ ডিকি, তুমি বলবে?

ডিকি কোন জবাব দিল না, কেবল মধ্যে মধ্যে রক্তাক্ত রুমালটা দিয়ে নাকটা ও ঠোঁটে ক্ষত স্থানটা মুছতে লাগল। কিরীটী নির্বাক ওদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শান্ত কণ্ঠে বললে, আজকের রাতটার মত তোমাদের সময় দিয়ে গেলাম। বলতে বলতে নিজের হাত ঘড়িতে সময়টা একবার দেখে নিল, রাত তখন পৌনে নয়টা কাল সকালে ঠিক বার ঘণ্টা পরে পৌনে নয়টায় এখানে আমরা আবার আসব, তার মধ্যে আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাক ভালই, নচেৎ জেনো কাল তোমাদের দুজনকেই নক্ষত্র সেনের হত্যার অপরাধে অ্যারেস্ট করা হবে। চল রতি।

আমরা কিরীটীর নির্দেশে স্থান ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হলাম। সকলের পশ্চাতে ছিল কিরীটী। সে দরজা পর্যন্ত এসে পুনরায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, যাবার আগে একটা কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য মনে করছি—পালাবার চেষ্টা করলে ভুলই করবে কারণ সর্বক্ষণ তোমাদের দুজনারই পিছনে পিছনে ছায়ার মত আমাদের লোক রয়েছে।

॥ সাত ॥

ফিরতি পথে বাড়িতে বসে কিরীটী বলছিল, নস্যির মধ্যে মাস্ক—কস্তুরী উগ্র গন্ধ পেয়েই প্রথমে আমার সন্দেহ জাগে মনে। কস্তুরী কস্টলি নেশা। কথাটা ভাবতে ভাবতেই আর একটা সম্ভাবনা মনের মধ্যে আমার উদয় হয়, ঐ কস্তুরী গন্ধের সঙ্গে আরো কিছু নেই তো। সেই সন্দেহেই নস্যিটার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করতে গিয়ে জানতে পারি ওর মধ্যে কোকেনও আছে। কোকেন আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত সন্দেহ বিশেষ একটি ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। ইউ নো, রতিকান্ত সেই জন্যই তোমাকে ফোনে আবার বলাকা ভাল করে সার্চ করে দেখবার জন্য অনুরোধ জানাই।

রতিকান্ত বললে, তোমার ফোন পেয়েই বলাকা সার্চ করতে গিয়েই তো নক্ষত্র

সেনের লেখবার টেবিলের ড্রয়ারে সেই রুপার কৌটোর মধ্যে নস্যি পাই। তার পর আবার তোমার নির্দেশেই রঘুয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি ইদানীং নক্ষত্র সেন পান খেতে শুরু করেছিল নস্যি দিয়ে।

হ্যাঁ, পুওর নক্ষত্র জানত না, স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে ঐ নস্যির মধ্যে দিয়েই তাকে কোকেনের মারাত্মক নেশা ধরানো হয়েছে। এবং সে ঐ নেশার মধ্য দিয়ে এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের কবলে ফেঁসেছে—সে যাক ঐ নস্যির সঙ্গে কোকেনের আবিষ্কার ছাড়াও আরো দুটি ব্যাপার যা আমার মনকে সন্দিগ্ধ করে তোলে—নক্ষত্রর সঙ্গে ইদানীং বাসবিকার ঘনিষ্ঠতা ও তার অফিসে ডিকির যাতায়াত! নেশার সঙ্গে ঐ দুটি পুরুষ ও নারী—বিউটী ও বীস্টের সম্পর্ক আছে একটা, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই আর আমার ছিল না, কিন্তু কেবলমাত্র ঐটুকু সম্পর্ক নিয়েই মন আমার ভরল না কারণ তখনো চেকের ২০ হাজার টাকার সেলফ ড্রয়িং-এর ব্যাপারটার কোন মীমাংসাই করতে পারছিলাম না। অবশেষে গোপনে ঐ ডিকিও বাসবিকার উপরে দৃষ্টি রেখে ও তাদের পরস্পরের দীর্ঘদিনের প্রীতির ব্যাপারটার সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রবলেমের অঙ্কের দুই-দুইয়ে চার মিলে গেল।

আমি এবারে বললাম, আমার কিন্তু প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল কিরীটী ব্যাপারটা আগাগোড়াই একটা ব্ল্যাক মেলিং-এর ব্যাপার।

ব্ল্যাক মেলিং এর মধ্যে অবশ্যই ছিল, কিন্তু নক্ষত্রের মৃত্যুর কারণ সবটাই নয়। কিরীটী বললে।

তবে?

দেয়ার ইজ সামথিং মোর। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বললে।

তাহলে কি ডিকি নক্ষত্রকে হত্যা করেনি? প্রশ্নটা অতঃপর না করে যেন আমি আর পারলাম না।

না। ঐ ধরনের জান্তব প্রকৃতির মানুষদের সাইকলজিটা বিচিত্র। ওরা হিংস্র ও বর্বর এবং মুহূর্তে আক্রমণও করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হত্যা করবার ক্ষমতা ওদের নেই। এবং সেইখানেই ওদের সঙ্গে ঐ শ্রেণীর বনের জন্তুর জান্তব বৃত্তির সঙ্গে তফাত। আসলে হত্যাকারীর হাতের ও একটি ইনস্ট্রুমেন্ট হয়েছিল মাত্র নক্ষত্র হত্যার ব্যাপারে।

তবে হু ইজ দি পারসন?

কালই জানতে পারবে।

তুমি জান? রতি প্রশ্ন করল।

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বললে কেবল, জানি।

আমাকে গাড়িতে বসতে বলে কাশীপুর পুলিস আউট পোস্টের কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রতিকান্তর সঙ্গে কথা বলতে বলতে অফিসের দিকে এগিয়ে গেল। এবং প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরে এল।

ফিরতি পথে সমস্ত পথটাই গাড়ির ব্যাকে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে চুরুট টেনে কাটিয়ে দিল কিরীটী। একটি কথাও বললে না।

আমিও বিরক্ত করলাম না। বুঝতে পারছিলাম অনেকখানিই আজ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল কিরীটী যেটা একান্তভাবেই তার স্বভাব বিরুদ্ধ।

আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল কিরীটী। এবং যাবার আগে বিদায় সম্ভাষণও জানাল না।

পরের দিন ভাল করে তখনো অন্ধকার কাটে নি। ক্রিং ক্রিং ক্রিং ফোনটা বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিলাম, কে?

কিরীটী কথা বলছি।

মুহূর্তে যেন সজাগ হয়ে উঠলাম, শুধালাম কি ব্যাপার?

তোর গাড়ি নিয়ে সোজা আমার এখানে চলে আয়, গাড়িটা আমার স্টার্ট নিচ্ছে না।

আসছি—

দেরি করিস না কিন্তু—

কিরীটীর ওখানে যখন গিয়ে পৌঁছালাম ঘড়িতে তখন সাড়ে পাঁচটা। প্রকৃতি জুড়ে তখন আবছা আলো-আঁধারীর খেলা চলেছে।

কিরীটী প্রস্তুত হয়ে তার বাড়ির গেটের সামনেই দাঁড়িয়েছিল ; আমি গাড়ি থামাতেই সে তাড়াতাড়ি আমার গাড়িতে উঠে বসে বললে, চল—

কোথায়। কোন দিকে?

কাশীপুর—বলাকা। রাস্তা এখন খালিই পাবি, স্পীডে চালা।

যতটা সম্ভব স্পীডে গাড়ি চালালাম।

ঠিক পৌনে ছটায় বলাকার সামনে এসে থামলাম। বলাকার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রতিকান্ত। গাড়ি থেকে নামতে নামতে কিরীটী বললে, একটু লেট হয়ে গিয়েছে বোধ হয় রতি। ইজ এভরিথিং ও-কে?

হ্যাঁ।

চল—

কথাটা বলে সোজা বলাকার সামনের দিকে অর্থাৎ গঙ্গার দিকে ঘুরে চলতে লাগল কিরীটী। আমরা দুজনে নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলাম।

গঙ্গায় তখন জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস। বলাকার সামনের সিঁড়ি ডুবে গিয়েছে জলে।

কোথায় নৌকা? কিরীটী শুধাল রতিকান্তকে।

ঐ যে—

দেখলাম একটা ছোট পানসি গঙ্গার কিনারে বাঁধা। আর ঠিক তার পাশেই একটা মোটর লঞ্চ ঢেউয়ে দুলছে। সেই পানসিতে চেপে এসে আমরা বলাকার সামনে সিঁড়িতে নামলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বললে, ঠিক এই ভাবেই সে রাত্রে হত্যাকারী বলাকায় প্রবেশ করেছিল। সে রাত্রেও গঙ্গায় জোয়ার ছিল!

বলতে বলতে কিরীটীর দেখাদেখি আমরাও দক্ষিণ প্রান্তের ঘরের গরাদহীন জানলা-পথে টপকে বলাকায় প্রবেশ করলাম। এবং সেই ঘর ও গোলঘরের মধ্যবর্তী খোলা দরজাটার একপাশে সকলে সরে দাঁড়ালাম কারণ গোলঘরে তখন আলো জ্বলছিল—এবং মানুষের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল।

একটি কণ্ঠস্বর চিনতে আমাদের কষ্ট হয় না। বাসবিকার কণ্ঠস্বর।

সে যেন কাকে প্রশ্ন করছে উত্তেজিত কণ্ঠে, চৌধুরীর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। কোথায় সে বল এখনি!

চাপা নারীকণ্ঠে জবাব এল জানি না—বলেছি তো!

ভাল চাও তো এখনো বল, পাশের ঘরেই ডিকি অপেক্ষা করছে! ডিকিকে যদি লেলিয়ে দিই, আর সে যদি তাকে খুঁজে বের করতে পারে, জেনো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

সে চলে গিয়েছে কাল সন্ধ্যাবেলাতেই—দ্বিতীয় নারীকণ্ঠে জবাব এল।

তুমি কে?

আমি তার স্ত্রী।

ন্যাকামি পেয়েছে। চৌধুরীর স্ত্রীর—সে তো বিয়েই করেনি।

তবে কি আমি মিথ্যা বলছি!

ওসব সত্য মিথ্যা জানি না! আর মাত্র ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দেব, এর মধ্যে যদি না বল সে কোথায়, ঠিক জেনো এখনি গিয়ে কাশীপুর থানায় সব প্রকাশ করে দেব। কষ্ট করব আমরা আর উনি সবটুকু মিষ্টি খাবেন—

মুহূর্তে কোথা থেকে কি হল বুঝলাম না। একটা অর্ধস্ফুট যন্ত্রণাকাতর চিৎকার ও কি একটা ভারী বস্তু পতনের শব্দে পাশে চেয়ে দেখি কিরীটীর হাতে উদ্যত পিস্তল।

কিরীটীই পিস্তল চালিয়েছে।

পরক্ষণেই খোলা দরজা পথে কিরীটী যেন লাফিয়ে গোলঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।

ঘরে ঢুকে দেখি লাল চওড়া পাড় গরদের শাড়ি পরিহিতা অবগুণ্ঠিতা এক নারী হাত চেপে বসে আছে, পাশেই মাটিতে পড়ে একটা পিস্তল। সেই নারীর কাপড়ে ও হাতে রক্ত।

বাসবিকা তার সামনে পাথরের মতই দাঁড়িয়ে।

মুহূর্তের জন্য বুঝি বাসবিকা বিহ্বল হতচকিত হয়ে পড়েছিল ঘটনার আকস্মিকতায় ও সেই সঙ্গে আমাদের তিনজনকে ঐ মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে। পরক্ষণেই সে ঘর ছেড়ে চলে যাবার চেষ্টা করতেই কিরীটী বললে, পালাবার চেষ্টা বৃথা বাসবিকা দেবী—

পাশের ঘরে ঐ সময় ডিকির তর্জন গর্জন শোনা গেল।

কিরীটী বললে, পাণ্ডে, ওকে তোমরা এ ঘরে নিয়ে এস!

কিরীটীর নির্দেশে তখনি তিনজন ষণ্ডা গোছের লাল পাগড়ি বন্দুকের ছুঁচালো বেয়োনেট ঘিরে ডিকিকে নিয়ে গোলঘরে এসে ঢুকল।

রতিকান্ত ঐ সময় বললে, ভদ্রমহিলার হাতে বোধ হয় তোমার গুলি লেগেছে কিরীটী।

কিরীটী প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে বললে, ভদ্রমহিলা নয়—ভদ্রমহোদয় উনি।

ভদ্রমহোদয়! চমকে প্রশ্ন করে রতিকান্ত।

হ্যাঁ—মহিলার ছদ্মবেশে বলাকার চার পাশের প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে ঘাটে বাঁধা লঞ্চে করে পালাবার পরিকল্পনাটি ওর চমৎকারই হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য ওর, ব্যাপারটা পূর্বাহ্নেই আমি অনুমান করায় শেষ পর্যন্ত প্রায় তীরে এসে ওর তরী ডুবল।

কিন্তু—

ওর মেয়েলী কণ্ঠস্বরের কথা বলছ? তা উনি যে একজন যাত্রাদলের নাম করা ফিমেল পার্টি অভিনেতা।

কি স্যার, বিষ্ণু অপেরায় ফিমেল পার্টই আপনি করেন না? বলে আহত স্তব্ধ দণ্ডায়মান নারীমূর্তির দিকে তাকাল কিরীটী।

কিন্তু লোকটা কে?

গুণ্ঠন মোচন করলেই দেখতে পাবে কে? সুব্রত—গুণ্ঠনটা ওর তুলে ধর তো।

অনুমান অবিশ্যি তখন আমিও করেছিলাম ব্যাপারটা। তাই গুণ্ঠন তুলতেই বঙ্কুবিহারী চৌধুরীকে দেখে অন্য সকলের মত চমকাইনি।

একি, বঙ্কুবিহারীবাবু? রতিকান্ত বললে।

হ্যাঁ—নক্ষত্র সেনের হত্যাকারী! কিরীটী বললে।

॥ আট ॥

বঙ্কুবিহারীই নক্ষত্র সেনের হত্যাকারী ব্যাপারটার মধ্যে বিস্ময় ছিল বৈকি! কোথায় পাটনা আর কোথায় কলকাতা।

পরের দিন বলাকার একটা নক্‌শা কাগজে এঁকে সেটা আমাদের সকলের সামনে রেখে কিরীটী বুঝিয়ে দিচ্ছিল সে রাত্রে কিভাবে নক্ষত্র সেনকে হত্যা করে। অবশ্যই পাটনা থেকে এসে নয়, কলকাতায় থেকেই।

কিরীটী বলছিল, সে রাত্রে নক্ষত্রের হত্যার ব্যাপারে ডিকি ও বাসবিকার কোন যোগাযোগ ছিল না ঠিক, তবে ডিকি হত্যার সময় অকুস্থানে উপস্থিত ছিল। এবং

বাগানের দিককার ঘর থেকে ডিকি টাকার জন্য যখন নক্ষত্রের বসবার ঘরে প্রবেশ করছে নক্ষত্রের অজান্তেই, সেই শব্দে চেকটা লিখতে লিখতে অর্ধপথে থেমে গিয়ে নক্ষত্র ঐ দিকে তাকাতেই হত্যাকারী তাকে গুলি করে। আচমকা ঐ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে ডিকি ভয়ে সেখান থেকে পালায় দিক্‌বিদিক শূন্য হয়ে। জান্তব প্রকৃতির ডিকির মধ্যেও আদিম রিপুটাই সেই মুহূর্তে প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং পালাবার সময়ই সে নিশ্চয়ই দেখতে পায় হত্যাকারীকে। বলাই-বাহুল্য, হত্যাকারী সেদিনও নারী বেশেই ছিল।

নারী-বেশে? রতিকান্ত প্রশ্ন করল।

কিরীটী বললে, হ্যাঁ। ধরা পড়ার দিন যেমন নারীর ছদ্মবেশে তাকে পেয়েছিলাম! কিন্তু সে কথা যাক। যে ব্যাপারটার প্রথম দিকে কোন মীমাংসাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না সেটা হচ্ছে নক্ষত্র সেনের টেবিলের উপরে প্রাপ্ত অর্ধসমাপ্ত সেই 'সেলফ' চেকটা। ব্ল্যাকমৌলংহ যদি ব্যাপারটা হয়, তা হলে ব্ল্যাকমেলার নক্ষত্র সেনকে হত্যা করলে মূর্খতার পরিচয় দেবে! নিজের এত বড় ক্ষতি সে নিশ্চয়ই করবে না। কাজেই ব্ল্যাকমেলার যে এ ক্ষেত্রে সেনকে হত্যা করে নি সে সম্পর্কে ঐ চেকের ব্যাপারটা থেকেই আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

ব্ল্যাক মেলিংয়ের ব্যাপারটা প্রথম থেকেই বোধ হয় তুমি সন্দেহ করেছিলে? রতিকান্ত শুধাল।

হ্যাঁ—সে তো হাতের কর গণনার মত সহজ ছিল অনুমান করা ব্যাপারটা। নক্ষত্র সেনের মত একজন ঐ বয়সেও অবিবাহিত, বিত্তশালী লোক—মধ্যে মধ্যে রাতসঙ্গিনী সুন্দরী নারী, তার উপর অত রাত্রে গৃহে ফিরে এমন কি পোশাক পর্যন্ত না ছেড়ে টেবিলে গিয়ে এত টাকার সেলফ চেক্ লেখা—এর মধ্যে ব্ল্যাকমেলিংয়ের ইঙ্গিতটা তো সুস্পষ্টই! আর তাই তো প্রথমটায় খটকা বেধেছিল, ব্ল্যাকমেলিংয়ের মধ্যখানে আবার কোন্ উদ্দেশ্যে নিয়ে তৃতীয় ব্যক্তি হত্যাকারীর আকস্মিক আবির্ভাব ঘটল। কাজেই অন্য খাতে চিন্তা করতে শুরু করলাম। রতিকান্ত, তোমাকে বললাম বলাকা আবার ভাল করে সার্চ করবার জন্য। তুমি নক্ষত্র সেনের কোকেন মিশ্রিত নস্যির কৌটোটি ছাড়া আর কিছুই পেলে না। আমি কিন্তু খুশী হলাম না। গোপনে এক রাত্রে নৌকাযোগে কাশীপুর গিয়ে বলাকায় প্রবেশ করে আবার সব সার্চ করলাম। কিন্তু আমিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু পেলাম না। অবশেষে আবার তার রাইটিং টেবিলের জিনিষপত্র ঘাটলাম। এবং এবারে হতাশ হলাম না। একটা চিঠি পেলাম মুখ-ছেঁড়া খামের মধ্যে। খামটা ছিল তখনো নক্ষত্রর শেষ ব্যবহৃত যে স্যুটের কোটটা ঐ ঘরের মধ্যে হ্যাংগারে ঝোলানো ছিল তারই বুক পকেটে। আশ্চর্য আমি ও রাত সব কিছু তচ্‌নচ্ করেও ঐ কোটটাই একটিবার দেখি নি। রতি তো প্রথম থেকেই কোটটা নেগলেক্ট করেছে আমিও প্রথমটায় করেছিলাম। সেই খামের মধ্যে এই চিঠিটা ছিল। বলতে বলতে একটা চিঠি আমাদের দৃষ্টির সামনে পকেট থেকে বের করে কিরীটী সম্মুখের টেবিলের উপর যেমন 'বলাকা'র নক্‌শাটা

ছিল তারই উপরে রাখল।

রতিকান্তই চিঠিটা তুলে নিল। সে পড়তে লাগল আমিও সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেললাম চিঠিটা। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি। এবং চিঠির কাগজ অর্থাৎ লেটার পেপারটা কম দামের একটা কাগজ ও তার মাথার দিকটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

চিঠিতে লেখা—

নক্ষত্র, তোমার কলঙ্কের সুযোগ নিতেও আমি চাই না, ভিক্ষেও আমি নেব না কারণ কোনটাতেই পেট ভরে না। আর ওকথা তো এক্ষেত্রে উঠতেই পারে না। বাসবী যখন তোমাকেই চায় তাই হোক।—ইতি বঙ্কু।

চিঠির তারিখটা প্রায় দিন পনের আগের। খামের উপরে ডাকঘরের ছাপ দেখেই বোঝা যায় পোষ্ট ও ডেলিভারি দুটোই কলকাতা থেকে। অতএব—কিরীটী বলতে লাগল, তখন বঙ্কুবিহারী ও বাসবিকার উপরেই আমার দৃষ্টি পড়ল। বাসবিকার সন্ধান পেতে দেরি হল না। বাসবিকার আবির্ভাব কলকাতা শহরে মাত্র মাস চারেক পূর্বে। চিরদিন সে পাটনাতেই ছিল এবং পাটনাতেই সে লেডি টিকিট চেকার ছিল রেলওয়ের। ডিকির সঙ্গে পরিচয় সেইখানেই তার। পাটনাতে বাসবিকা অনেককেই জ্বালিয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ঐ বঙ্কুবিহারী! বঙ্কু বছর দুই ধরে যাত্রার দল ছেড়ে দিয়ে পাটনাতে ছোটোখাটো প্রসাধন দ্রব্যের দোকান খুলেছিল। বাসবিকা আসত সেই দোকানে, সেইখানেই দু'জনার আলাপ। বঙ্কুর অন্টিও মালাইটিসের কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। রেলওয়ে অ্যাকসিডেন্টে তার পা'টা পঙ্গু হয় আর সেই কারণেই রেলওয়ের কাছ থেকে সে হাজার পঁচিশ টাকা কম্‌পেনশন পায়। সেই মূলধন নিয়েই সে পাটনায় ব্যবসা শুরু করে। নক্ষত্র একবার পাটনায় যায় এবং বঙ্কুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ই প্রকৃতপক্ষে বাসবিকার সঙ্গে নক্ষত্রের আলাপ। অর্থলোভী বাসবিকা সহজেই বিত্তশালী নক্ষত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আসলে কিন্তু বাসবিকার আকর্ষণটা ছিল বঙ্কুবিহারী বা নক্ষত্র কারো প্রতিই নয়, সে আকৃষ্ট ছিল ডিকির প্রতি। ডিকির জন্তুর মত চেহারা ও জান্তব প্রকৃতিটাই একটা উগ্র আকর্ষণ জাগিয়েছিল বাসবিকার মনে। নারী চরিত্রের এও এক ধরনের পিকিউলিয়ার সাইকোলজি। ফলে বাসবিকাকে কেন্দ্র করে নক্ষত্র, বঙ্কুবিহারী ও ডিকির মধ্যে বিচিত্র প্রেম, হিংসা, আক্রোশ সব কিছুর একটা ট্র্যায়াংগেল গড়ে উঠল। আর সেই ট্রায়াংগেলের মধ্যেই একদিন রোপিত হল বর্তমানে হত্যার বীজ।

বলতে বলতে কিরীটী থামল।

হস্তধৃত পাইপটায় নতুন করে টোবাকো ভরে অগ্নিসংযোগ করে কিরীটী তার কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের বর্ণনা শুরু করল।

সে বলতে লাগল ডিকির প্ররোচনায় বাসবিকা তার রূপ ও নেশা দিয়ে শোষণ করেছিল ইতিমধ্যেই নক্ষত্রকে। অতএব তাদের ক্ষতি হয় নি কিছু, ক্ষতি যা হয়েছিল তা বঙ্কুবিহারীর। বেচারী সত্যি সত্যিই মনে মনে বাসবিকাকে ভালবেসেছিল আর সেই হতাশ প্রেমের জ্বালাতেই শেষ পর্যন্ত তাকে চরম পথ নিতে হল। সে দেখলে বাসবিকা

যেমন অর্থলোভী তাতে করে তার বর্তমান অবস্থায় কোনমতেই বাসবিকাকে করায়ত্ব করতে পারবে না। চাই অর্থ। প্রচুর অর্থ। নক্ষত্রর একমাত্র ওয়ারিশন সে। অতএব নক্ষত্রকে যদি সরাতে পারে তো একসঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত ঐশ্বর্য ও নারী বাসবিকা দুই-ই তার করতলগত হবে। সে চলে এল কলকাতায় এবং যাতে তাকে নক্ষত্র কোনরূপ সন্দেহ মাত্রও না করে তাই ঐ পত্রাঘাত নক্ষত্রকে। মাস মাস নক্ষত্র ডিকি ও বাসবিকাকে কুড়ি হাজার টাকা করে দিত। নক্ষত্রর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেই তার নজির আছে। কিন্তু কুড়ি হাজার টাকা সামান্য নয়—নক্ষত্রর পক্ষে সেটা হজম করা সম্ভবপর হচ্ছিল না তাই সে সেদিন ডিকি ও বাসবিকা দু'জনকেই বলাকায় রাত্রে আসতে বলেছিল শেষবারের মত টাকা দিয়ে একটা শেষ মীমাংসা করবার জন্য। সেই দিনই সকালবেলা বঙ্কুবিহারী নক্ষত্রর গৃহে আসে ও তার অনুপস্থিতিতে নক্ষত্রর পিস্তলটি নিয়ে সরে পড়ে। মধ্যরাত্রে আবার সে এল বলাকায়। ডিকিকে চেক দেবার জন্য নক্ষত্র ডেকে পাঠায়। ডিকি পরে সবই স্বীকার করেছে! চেক দেবার আগে ডিকি আসতে নক্ষত্র যখন অসর্তকভাবে তাকায়, সেই সময় ডিকির পশ্চাৎ থেকে বঙ্কু ফায়ার করে। গুলি ঠিক লক্ষ্যভেদ করে। ডিকি ব্যাপারটায় হতভম্ব হয়ে চট্‌পট সেখান থেকে সরে পড়লেও পরে সে ও বাসবিকা আসল ব্যাপারটা অনুমান করতে পারে এবং আমি সে রাত্রে পাকসার্কাসে ডিকির ফ্ল্যাটে গিয়ে কৌশলে পূর্বাহ্নেই ফোনে বাসবিকাকে সেখানে আনিয়ে ওদের সন্দেহটা বদ্ধমূল করে দিয়ে আসি। অতঃপর আমি জানতাম ডিকি ও বাসবিকা বঙ্কুবিহারীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবে সেই অনুমানের উপরে নির্ভর করেই রাত্রে ওদের সময় দিয়ে এসেছিলাম বার ঘণ্টার মধ্যে সব কিছু কবুল করবার জন্য। অনুমানের উপরে নির্ভর করে অগ্রসর হলেও ক্যালকুলেশন আমার যে নির্ভুল হয়েছিল সে তো তোমরা দেখছই। বঙ্কুবিহারীও ব্যাপারটা সন্দেহটা করায় দুর্ধর্ষ ডিকির হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় সে রাত্রে গা ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করছিল। কিন্তু সকলের মাথার উপরে যিনি বসে আছেন তাঁর সূক্ষ্ম বিচারে ভুল হয় না, শেষ পর্যন্ত বঙ্কুবিহারীকে তার গুরু অপরাধের দণ্ড মাথা পেতে নিতেই হল। ইতি নক্ষত্র পর্ব।

কিরীটী কথা শেষ করে পুনরায় পাইপটায় অগ্নিসংযোগে তৎপর হল।

বসন্ত রজনী

॥ এক ॥

কিরীটী আমার কথায় হো হো করে হেসে ওঠে।

হাসছিস—বললাম আমি, লোকটার চেহারার দিকে তাকালে কিন্তু মনে হয় না—কোল্ডব্লাডে লোকটা মার্ডার করতে পারে।

যেহেতু লোকটার চেহারাটা তোর নয়ন তৃপ্তিকর হয়নি—প্রথম দৃষ্টিতেই লোকটার চেহারা তোর বিচ্ছিরি লেগেছে এইটাই তো তোর একমাত্র যুক্তি সুব্রত।

আমি কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলি, না, না—ঠিক তা নয়—

তাই। অবিশ্যি অস্বীকার করব না যে, এমন চেহারা কারো কারো আছে যার দিকে তাকানো মাত্র মনে হয়, লোকটা বুঝি যে কোন ক্রাইম অনায়াসেই করতে পারে। এমন কি হত্যাও। মন ঘিনঘিন করে ওঠে। অথচ মজা হচ্ছে খোঁজ নিলে হয়ত দেখা যাবে—সম্পূর্ণ বিপরীত। যা মনে হয়েছে আদৌ তা নয়। প্রকৃতিতে লোকটা হয়ত যেমন শান্ত, তেমনি নিরীহ, তেমনি ভীতু।

কালীপ্রসাদ সরকারকে আমি চিনি—অনেক দিন থেকে চিনি। অমন নিরীহ—অমন গোবেচারা লোক বড় একটা দেখা যায় না। তাছাড়া লোকটা পরম বৈষ্ণব—মানুষ মারা তো দূরে থাক, একটা মাছিও কোনদিন মারতে পারবে কি না সন্দেহ।

আমি আর কোন জবাব দিই না। কারণ জানি, জবাব দিলেও কিরীটীর এতটুকু পরিবর্তন তো হবেই না—উপরন্তু সে তার থিয়োরী আরো জোরালো কণ্ঠে

প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করবে। আমাকে নস্যাৎ করে দেবে—তার চাইতে সামনে সাগরের দিকে চেয়ে থাকতে বেশ লাগছে। পুরীর সাগরসৈকত স্বর্গদ্বারের কাছাকাছি দু'জনে বসেছিলাম। সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়েছে, কিন্তু অস্ত গেলেও সাগরের বুক থেকে, আকাশ থেকে আলোটা যেন মুছেও মুছে যায়নি। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে তখনো যেন একটা আলোর রেশ সঙ্গীতের রেশের মতই শেষ হয়েও শেষ হয়নি।

কথাটা আমিই বলেছিলাম, লোকটা যখন তোর সঙ্গে কথা বলছিল, ওর মুখের দিকে চেয়ে আমার যেন মনে হচ্ছিল—

বালুবেলার উপর কাত হয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে কিরীটী পাইপটা টানতে টানতে বলে, কি মনে হচ্ছিল সুব্রত?

লোকটা বোধহয় কোল্ডব্লাড মার্ডার করতে পারে—

আর সঙ্গে যে লোকটিকে দেখলি মিঃ দোলগোবিন্দ শিকদার—ওর সম্পর্কে তোমার স্টাডিটা কি সুব্রতবাবু—

বুঝলাম, কিরীটী ঠাট্টা করছে—আমার মন্তব্যটা ওর মনঃপুত হয়নি।

আমি অবশ্য কোন জবাব দিই না।

ক্রমে ক্রমে সেই আলোর শেষ রেশটুকু আকাশ থেকে, প্রকৃতি থেকে মুছে যায়। অন্ধকার নামে চারিদিকে। অন্ধকারে সমুদ্রের ঢেউগুলোর মাথায় মাথায় শ্বেত ফেনার পুঞ্জ যেন হিংস্র জন্তুর ধারালো দাঁতের মত মনে হয়। একটানা গর্জনে মনে হয় যেন কোন অবরুদ্ধ জন্তু প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসছে।

কি জানি কেন লোকদুটোর চেহারা কিন্তু মন থেকে কোন মতেই আমি মুছে ফেলতে পারি না।

কালীপ্রসাদ সরকার আর দোলগোবিন্দ শিকদার।

সে সময় সমুদ্রসৈকতে বায়ুসেবনার্থী অনেক বয়সের অনেক স্ত্রী-পুরুষ ছিল এবং তাদের সেই ভিড়ের মধ্যেও ওদের দু'জনকে দূর থেকে দেখেই—ওদের দিক থেকে চট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারিনি।

দু'জনেরই পরিধানে স্যুট ছিল। একজনের দামী স্যুট—কোন নামকরা টেইলার্স শপের তৈরী। অন্যজনের বোধ করি সাধারণ কোন দোকান থেকে কেনা রেডিমেড স্যুট। একটু ঢিলে ঢলঢলে।

পরনে দামী স্যুট ছিল কালীপ্রসাদ সরকারের। লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে হবে বলেই মনে হয়। বেশ মোটা চর্বিযুক্ত ভারী দেহের গড়ন। রীতিমত কালো গায়ের বর্ণ। ভারী ঈষৎ চৌকো মুখ। মোটা রোমশ ভ্রূ। কানদুটো বেশ বড় এবং কান ভর্তি চুল।

স্যুট-পরা থাকলেও টাই না থাকায় খোলা সার্টের ফাঁক দিয়ে বুকের যে অংশটুকু দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল—সেটা রীতিমত রোমবহুল।

বোঝা যায় মানুষটা অত্যন্ত রোমশ। গায়ে বুকে খুব বেশী লোম। হাসলেই উপরের মাড়ির অনেকটা বের হয়ে পড়ে ও সেই সঙ্গে প্রকাশ পায় ঝকঝকে মোটা মোটা এক সারি এলোমেলো দাঁত।

আর হাতের থাবা ও আঙ্গুলগুলোই বা কি—যেমন চওড়া তেমনই মোটা মোটা ও বলাই বাহুল্য রোমশ।

লম্বায় লোকটা কিন্তু খুব বেশী নয়—পাঁচ ফুট দুই থেকে তিন ইঞ্চির বেশী কিছুতেই হবে না—অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে বেঁটেই লোকটা! দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন ঠিক একটা ভাল্লুক থপথপ করে হাঁটছিল।

আর তার সঙ্গী।—কম দামের ঢিলে ঢলঢলে পোশাকের মধ্য দিয়েও যেন তার রূপ—তার সৌন্দর্য ফুটে বের হচ্ছিল। সত্যিই লোকটা সুন্দর। লম্বাই বলতে হবে। গায়ের রং বেশ ফর্সা।

বেশ ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ এবং সামনে এসে দাঁড়াবার পর দেখেছিলাম কটা চক্ষু-তারকা। মাথার চুলও সামান্য কটা। গায়ে যেমন ঢিলে ঝলমলে পোশাক ছিল, পায়ে অনুরূপ একটি সস্তা দামের ডার্বি সু।

কিরীটী ঐ যুগল মূর্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই, কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, ঐ কালো মোটা লোকটিকে যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে।

চিনিস?

হুঁ। চেনা-চেনা—ও মনে পড়েছে—হ্যাঁ—ওর নাম কালীপ্রসাদ।

কালীপ্রসাদ!

হ্যাঁ—মনে পড়ছে কালীপ্রসাদ সরকার—অসম্ভব ব্রেণ ছিল ম্যাথেমেটিক্সয়ে—অঙ্কে দুর্দান্ত মাথা ছিল।

তোর চাইতেও বেশী? আমি বলি।

বেশী মানে বলতে পারিস অঙ্কে ছিল কালী আমার দাদা।

বলিস কি?

হ্যাঁ।

ইতিমধ্যে লোকদুটি আমাদের কাছাকাছি, প্রায় বলতে গেলে হাত দুয়েক ব্যবধানের মধ্যে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এসে গিয়েছে!

কিরীটীই প্রথমে কথা বলে, কালীপ্রসাদ না?

কে?

থমকে দাঁড়ায় কালীপ্রসাদ। ভ্রূ কুঁচকে তাকায় কিরীটীর দিকে। মনে হলো যেন খুব প্রসন্ন হয়নি ভদ্রলোক!

কালীপ্রসাদ সরকার ত—

হ্যাঁ—কিন্তু আপনাকে—

চিনতে পারছিস না, তাই না?

হ্যাঁ, মানে—

কিরীটী রায়কে মনে পড়ে, প্রেসিডেন্সী—

এতক্ষণে কালীপ্রসাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, মাই গড—আমাদের রহস্যভেদী কিরীটী রায়?

চিনেছিস?

আলবাৎ—তোকে চিনব না কি রে?—দুর্জনেরা যে যাই বলুক কিন্তু তোকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা কার বল। তা তুই এখানে?

কাজকর্ম নেই হাতে—বসে বসে গাঁটে গাঁটে বাত ধরছিল তাই—

সমুদ্রসৈকতে—তা বেশ—বাত সারবে হয়ত নোনা হওয়ায়।

হু, সেই আশাতেই ত এলাম।

তা উনি তোর সঙ্গে—কালীপ্রসাদ সুব্রতর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে চোখের ইঙ্গিতে।

আমার বন্ধু সুব্রত।

নমস্কার—হাত তুলে কালীপ্রসাদ সরকার নমস্কার জানায় আমায়।

আমিও নমস্কার জানাই।

কিরীটীই এবারে জিজ্ঞাসা করে, তোর সঙ্গে উনি কে—ওঁকে তো চিনলাম না।

আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু—নামকরা মুক্তার ব্যবসায়ী—পার্ল মার্চেন্ট—দোলগোবিন্দ শিকদার। হঠাৎ বেড়াতে বেড়াতে সমুদ্রের ধারে এই কিছুক্ষণ আগে এখানে দেখা হয়ে গেল।

অতঃপর দোলগোবিন্দর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল কালীপ্রসাদ।

তারপর কি করছিল? কিরীটীই কালীপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে, বলতে গেলে একটা যুগ পরে দেখা।

বিজনেস—মানে ব্যবসা।

কিসের ব্যবসা?

জুয়েলারীর—হীরা জহরতের।

তাহলে শেষ পর্যন্ত অঙ্ক-শাস্ত্র, ম্যাথেমেটিক্স ছেড়ে ঐ জুয়েলারীর ব্যবসা করতে গেলি?

উপায় কি বল। আমাদের তিন জেনারেশন ধরে ঐ জুয়েলারীর ব্যবসা—তুই ত জানতিস ভাই।

তা জানতাম। কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বলে।

পরে রাত্রে কিরীটীর মুখে আরো শুনেছিলাম কালী সরকারের সঙ্গে নাকি ওর কলেজ জীবনে কিছুটা হৃদ্যতাও ছিল। তারপর অবিশ্যি কর্মজীবনে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে।

তা বেশ—উঠেছিস কোথায়? কিরীটী হঠাৎ শুধায়।

সি-সাইড হোটেলে।

মানে ঐ যে নতুন হোটেলটা তৈরী হয়েছে বছর খানেক হলো বীচের গা ঘেঁষে

একেবারে।

হুঁ। ওই হোটেলের ব্যবস্থাটা দেখলাম বেশ ভাল, তাই ওখানেই উঠলাম। তা তুই কোথায় উঠেছিস।

মিহিরবাবুর পুরী ভিউ হোটেলে।

॥ দুই ॥

পরের দিন সূর্যোদয় দেখব বলে অন্ধকার থাকতে থাকতে আমরা দু'জনেই উঠেছি এবং কোন মতে দু'জনে গায়ে জামাটা চাপিয়ে সূর্যোদয় দেখব বলে বের হয়ে পড়ি হোটেল থেকে। রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে এবং পাতলা অন্ধকারের একটা পর্দা সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে যেন থিরথির করে কাঁপছে। তার মধ্যে অস্পষ্ট ঝাপসা সমুদ্র দেখা যায় যতদূর সামনের দিকে দৃষ্টি চলে ততদূর পর্যন্ত। একটানা গর্জন করে চলেছে এবং ঢেউ পড়ছে আর অকূল উচ্ছ্বাসে তীরভূমির ওপরে এসে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেনায় লুটিয়ে পড়ছে পারাবারহীন সমুদ্রের জলরাশি।

অনেকেই সূর্যোদয় দেখবার জন্য বের হয়েছে—তাদের ঝাপসা ঝাপসা মূর্তিগুলো দেখা যায় এদিক ওদিক।

ভিজে নরম বালির উপর দিয়ে দু'জনে পুব মুখো এগিয়ে চলি। একটানা সমুদ্রের গর্জন বাতাসে মর্মরিত হচ্ছে। একটা ক্রুদ্ধ দৈত্য বন্দী হয়ে যেন অবিশ্রাম মাথা খুঁটে চলেছে।

আধ মাইলটাক এগিয়েছি, হঠাৎ ঝাপসা ঝাপসা আলো-আঁধারিতে দূরে নজর পড়ল—তীরে একেবারে জল ঘেঁষে অনেকগুলো লোক। এক জায়গায় যেন গোল করে অনেকগুলো লোক ভিড় করছে, হয়ত জেলেরা মাছ ধরছে বা মাছ ধরবে—তাই ভিড়।

কিন্তু যত কাছে এগোই, সমুদ্রের একটানা গর্জনকে ছাপিয়ে মৃদু একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি কানে আসে আমাদের।

পূর্ব গগনে সূর্য তখন দেখা দিয়েছে। ঠিক যেখানে আকাশ ও জলে মেশামিশি সেই আকাশ ও জলের মিলনরেখাটি ছুঁয়ে কেকেনদুটির সঙ্গে।

আরো কয়েক পা এগুতেই ব্যাপারটা আমাদের চোখে পড়ল ঃ একটি দেহ সমুদ্রের বালুবেলায় পড়ে আছে আর তাকে ঘিরে দু'-তিনটি নুলিয়া আর দশ পনের জন পুরীর চেঞ্জার।

গুঞ্জনটা তাদেরই কণ্ঠে। বিস্ময়ের গুঞ্জন।

কি ব্যাপার মশাই, পার্শ্ববর্তী একজনকে জিজ্ঞাসা করি আমিই।

মারা গেছে।

কে মরল!

কে জানে, জলে ডুবে মারা গেছে।

জলে ডুবে?

তাই মনে হয়। নুলিয়ারা মাছ ধরতে গিয়েছিল, অনেক দূরে মৃতদেহটা ভেসে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে তুলে এনেছে।

সমুদ্রতীরে ব্যাপারটা একটা নতুন কিছু নয়, বিস্ময়েরও কিছু নয়, মধ্যে মধ্যে রাক্ষুসী সমুদ্র দু' একজনকে যে গ্রাস করে না তা নয়।

হয়ত তেমনি একজন কেউ—

হঠাৎ ঐ সময় কিরীটীর বিস্ময়স্ফুরিতকণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়, একি—এ যে দেখছি আমাদের কালী সরকার।

কালী সরকার! সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার মৃতদেহের দিকে দৃষ্টিপাত করি, দু'পা আরো এগিয়ে যাই। তাইত—মিথ্যা তো নয়, কালী সরকারই তো।

সমুদ্রসৈকতে ভোরের আলোটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তখন। সেই আলোয় বালুবেলায় শায়িত মৃত কালী সরকারের দেহটার দিকে তাকিয়ে যেন আমরা কয়েকটা মুহূর্ত বোবা হয়ে থাকি। চিত করে শোয়ান বালুবেলার উপর কালী সরকারের মৃতদেহটা।

চোখের পাতা বিস্ফারিত—বিস্ময়ের দৃষ্টি যেন স্থির হয়ে আছে নিষ্পলক স্থির দুটো চোখের তারায়।

মাথায় চুল এলোমেলো। পরিধানে পায়জামা ও পাঞ্জাবী। খালি পা। আর বাঁ হাতে সোনার ব্যান্ডে রিস্টওয়াচ বাঁধা। ইতিমধ্যে ভিড় দেখে সেখানে আরো লোক জমতে শুরু করেছে।

সবাই বিস্মিত হতচকিত—একই প্রশ্ন সকলের। তার মধ্যে কেউ কেউ সমবেদনাও প্রকাশ করে।

অনেকক্ষণ খুব কাছে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কালী সরকারের মৃতদেহটা দেখবার পর হঠাৎ নীচু হয়ে কি যেন লক্ষ্য করতে থাকে কিরীটী।

তারপর উঠে দাঁড়ায়। মৃদু কণ্ঠে বলে, হুঁ—

কিরে?

দেখ—লক্ষ্য করে দেখ ভাল করে কালীর গলায়—

কী, বলে তাকাতেই আমারও নজরে পড়ল। কালো একটা আধ ইঞ্চি মত, সরু ফিতের মত একটা দাগ গলায় ঠিক চিবুকের নীচে।

হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন আবছা একটা কালো ফিতে গলায় জড়ান। প্রথমে তাৎপর্যটা মনের মধ্যে উদয় হয়নি। কিরীটীর দ্বিতীয় কথার সঙ্গে যেন মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ ঝলক দেয়।

স্ট্রাঙ্গুলেশন নয় ত!

কিরীটী স্বগতোক্তির মতই যেন ফিস ফিস করে কথাটা উচ্চারণ করে। কিন্তু তৎসত্বেও কথাটা কানে আমার প্রবেশ করেছিল।

সত্যিই ত—সঙ্গে সঙ্গে মনে দেখা দেয় সন্দেহটা ঃ গলা টিপে হত্যা করে কেউ

কালীকে সমুদ্রের জলে রাতারাতি ভাসিয়ে দেয়নি ত। সম্ভবতঃ তাই এবং তাহলে ত ব্যাপারটা নিষ্ঠুর একটা হত্যা। কালী সরকার তাহলে নিহত হয়েছে। হঠাৎ কিরীটীর হাতের স্পর্শে ফিরে তাকাই!

কি?

চল—

ভিড় ছেড়ে দু'জনে খানিকটা এগিয়ে এলাম বালুর উপর দিয়ে হেঁটে। সূর্যোদয় আর দেখা হয়নি। ইতিমধ্যে সূর্যদেব অনেকটা উঠে গিয়েছে জল-শয্যা ছেড়ে।

কিরীটী দেখি হন হন করে ক্রমশঃ সমুদ্রতীর ছেড়ে পাড়ের দিকে হেঁটে চলেছে। পাড়ে উঠে শহরের দিকে চলেছে।

কোথায় চলেছিস।

বিজয় মহান্তীর ওখানে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বিজয় মহান্তীর সঙ্গে মাত্র পরশুই ঘটনাচক্রে আলাপ হয়েছে। ওখানকার থানার ও সি।

রিক্সাওয়ালার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে গোলমাল হওয়ায় কিরীটী সাইকেল রিক্সাওয়ালাটাকে ধরে নিয়ে সোজা থানায় গিয়েছিল।

সেইখানেই বিজয় মহান্তীর সঙ্গে আলাপ।

লোকটি বেশ ভদ্র ও অমায়িক এবং কিরীটীর পরিচয়টা আমি দিতেই আমাদের সেকি সাদর অভ্যর্থনা।

কি সৌভাগ্য আমার—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে যে কি খুশী হলাম। তারপরই প্রশ্ন করেছিল, বেড়াতে নিশ্চয়ই এসেছেন মিঃ রায়, পুরীতে—

হ্যাঁ—এবং সমুদ্রদর্শন—কিরীটী জবাব দিয়েছিল ঃ বেড়ান গৌণ—সমুদ্র দর্শনটাই মুখ্য।

আসবেন কিন্তু মাঝে মাঝে।

কিরীটী প্রত্যুত্তরে হেসেছিল মৃদু, কোন জবাব দেয়নি।

আমি ত জানি, এতকাল খুন-জখম-চুরি-বাটপাড়ি এবং সেই কারণে থানা পুলিশ ঘেঁটে ঘেঁটে ওর ঐ সবের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। পারতপক্ষে আজকাল ঐসব স্থানে ও যেন পা দিতেই চায় না।

তাহলে সেদিন থানা থেকে বের হয়ে হোটেলের দিকে যেতে যেতে বলেছিল কিরীটী, মিঃ কাগতাড়ুয়া মনে হলো বেশ সজ্জন ব্যক্তি—আর এদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা হয়—তাও নয়—ঘটে কিছু বুদ্ধি ধরে।

কাগতাড়ুয়া—সে আবার কোথা থেকে এলো।

কেন রে—মহান্তী সাহেবকে কাগতাড়ুয়ার মতই দেখতে মনে হলো না?

সত্যিই ত। বিজয় মহান্তীর চেহারাটা মানসপটে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কাগতাড়ুয়াই বটে। লম্বা দেহের অনুপাতে মাথাটা যেন বড়ই। বিশাল একজোড়া কনক-চাঁপা গোঁফ। সরু সরু হাত পা। ঝলঝলে একটা স্যুট পরিধানে। আবলুস কাঠের

মত কালো গাত্রবর্ণ।

মিথ্যা বলেনি কিরীটী—ক্ষেতের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখলে কাগতাড়ুয়াই মনে হবে।

থানার কম্পাউন্ডে প্রবেশ করতেই বাঁ দিকে মহান্তীর কোয়ার্টারের সামনে নজরে পড়ল—মহান্তী তার কোয়ার্টারের সামনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

পরনে একটা সবুজ লুঙ্গী—গায়ে একটা গেঞ্জী, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। আমাদের এত সকালে থানায় আসতে দেখে মহান্তী যেন একটু অবাকই হয়।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানায়, আসুন, আসুন কিরীটীবাবু—এত সকালে—কি সৌভাগ্য—

বাইরের বারান্দায় চেয়ার পাতা ছিল। আমরা সেখানেই বসি।

বসুন—চায়ের কথাটা বলে আসি ভিতরে—হন্তদন্ত হয়ে মহান্তী ভিতরে চলে গেল। চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা সার্ট গায়ে চাপিয়ে ফিরে এসে আমাদের মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললে, এদিকে বেড়াতে বের হয়েছিলেন বুঝি? তা এ সময়টা সমুদ্রতীর ছেড়ে ঘিঞ্জির মধ্যে এই শহরের দিকে—

আপনাকে একটা খবর দিতে এলাম মহান্তী সাহেব—কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলে।

খবর—কী খবর?

সমুদ্রের মধ্যে একটা মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছিল, নুলিয়ারা মাছ ধরতে গিয়ে তুলে এনেছে।

মহান্তী হেসে ফেলে এ্যাক্সিডেন্ট—দুর্ঘটনা! এ তো এখানে সমুদ্রে হয়ই। নতুন কিছু নয়। তারপরই হঠাৎ যেন থেমে গিয়ে কিরীটীর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলে, আপনি কি সেইজন্যই এসেছেন মিঃ রায়?

হ্যাঁ। কারণ ব্যাপারটা আমার ধারণায় সাধারণ কোন একটা এ্যাক্সিডেন্ট নয়।

তবে?

মনে হচ্ছে ইট'স এ কেস অফ মার্ডার। লোকটাকে হত্যা করে, তারপর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে!

আপনার তাই ধারণা?

হ্যাঁ। অবিশ্যি হত্যাকারী হয়ত ভেবেছিল নিঃশব্দে হত্যা করে রাতের অন্ধকারে একবার যদি মৃতদেহটা সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়া যায়—তার কার্যসিদ্ধি হবে এবং হত্যার সমস্ত প্রমাণ সমুদ্রের জলে ধুয়ে মুখে দেবে। কিন্তু—

মহান্তী কিরীটীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

কিরীটী বলে, কিন্তু বেচারীর বোধহয় বিধি বাম। সমুদ্র ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছেই—মৃতদেহটা বেশী দূরে টেনে না নিয়ে গিয়ে আশেপাশেই কোথাও ভাসছিল যার ফলে নুলিয়াদের নজরে পড়ে গেল, আর সেই সঙ্গে—

কি সেই সঙ্গে?

মহান্তী তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে। কিরীটী মৃদু হেসে বললে, কিরীটী রায়ের উপস্থিতি পুরীতে—কিন্তু সেজন্যও ঠিক নয় মহান্তী সাহেব। আমি এসেছি বিশেষ করে কথাটা আপনাকে জানাতে—আই নো দ্যাট ম্যান—লোকটাকে আমি জানি।

কাকে—কাকে জানেন আপনি মিঃ রায়?

যে নিহত হয়েছে।

সত্যি?

হ্যাঁ—লোকটার নাম কালী সরকার। কলকাতা শহরের একজন নাম করা ধনী জুয়েলার।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। ভাইয়ে ভাইয়ে গণ্ডগোল হয়ে এখন অবিশ্যি শুনেছিলাম বৎসর খানেক আগে—সব পার্টিশন হয়ে আলাদা আলাদা হয়ে গিয়েছে—পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে পার্টিশন।

জাস্ট এ মিনিট মিঃ রায়, মহান্তী বাধা দেয় ঐ সময়, ওরই ভাইরা কি—রাখাল সরকার, বৃন্দাবন সরকার, গোকুল সরকার—

হ্যাঁ—কালী, রাখাল, বৃন্দাবন, গোকুল আর দুর্গা সরকার। একদা কালীর সঙ্গে প্রেসিডেন্সীতে বছর দুই পড়েছিলাম। ম্যাথামেটিক্সয়ে খুব মাথা ছিল ঐ কালীর।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ—আর দেখতে লোকটা, মানে চেহারাটা লোকটার একটা বনমানুষও ভিলেনের মত হলেও খুব শান্ত নিরীহ প্রকৃতিরই ছিল বলেই জানতাম।

কথাগুলো বলতে বলতে কিরীটী আড় চোখে আমার দিকে তাকাল।

তাহলে ত একবার উঠতে হচ্ছে।

হ্যাঁ—চলুন একবার ঘুরে আসবেন।

॥ তিন ॥

কালী সরকারের মৃতদেহটা নিয়ে আসা হলো পৌনে দশটা নাগাদ।

কিরীটী থানায় আবার মৃতদেহটা ভাল করে পরীক্ষা করল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখলাম।

কিরীটীর সন্দেহ মিথ্যা নয়! গলার দাগটা সত্যিই সন্দেহজনক এবং মনে হয় না অনেকক্ষণ মৃতদেহটা সমুদ্রের জলে ছিল। খুব বড় জোর ঘণ্টা দেড়েক বা দুই। তার বেশী নয় এবং মৃতদেহে রাইগার মার্টিস তখনো সেট-ইন করেনি।

তাতেই অনুমান হয় রাত বারটার পরে কোন এক সময় নিহত হয়েছে লোকটা সম্ভবতঃ।

তাহলে মিঃ রায়, আপনি নিঃসন্দেহ—লোকটাকে হত্যাই করা হয়েছে! মহান্তী কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে আবার প্রশ্নটা করে।

হ্যাঁ মহান্তী সাহেব। অবিশ্যি লোকটার মৃত্যুর কজ, অর্থাৎ কারণ ট্র্যাঙ্গুলেশান শ্বাস রোধ হয়ে, না জলে ডুবে সেটা সঠিকভাবে ময়নাতদন্তের দ্বারাই একমাত্র প্রমাণিত হবে। তবে—

তবে?—

মৃতদেহ পরীক্ষা করে ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে যা মনে হচ্ছে—ব্যাপারটা দুর্ঘটনা নয়—নিষ্ঠুর হত্যা। সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু আপনি এত ডেফিনিট হচ্ছেন কি করে?—

কারণ প্রথমতঃ ধরুন—যদি এ্যাক্সিডেন্টই হতো অর্থাৎ ড্রাউনিংই লোকটার মৃত্যুর কারণ হতো, সে নিশ্চয় স্নান করতে গিয়েই হতো কেমন কিনা?

হ্যাঁ—সেটাই স্বাভাবিক।

তাই যদি হয় ত লোকটা নিশ্চয়ই পায়জামা পাঞ্জাবী গায়ে ও হাতে ঘড়ি, বিশেষ করে অমন দামী একটা ঘড়ি বেঁধে নিশ্চয়ই সমুদ্রস্নান করতে যেতো না! আই থিংক ইউ উড এগ্রি উইথ মি অন দ্যাট পয়েন্ট মিঃ মহান্তী।

হ্যাঁ।

আসুন এবার দ্বিতীয় পয়েন্টে আমার ঃ মৃতদেহ দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না—অন্তত দেড় ঘণ্টা থেকে দু'ঘণ্টা মৃতদেহটা জলে ছিলই—এবং আমরা যতদূর জেনেছি নুলিয়ারা ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ মৃতদেহটা জলে ভাসতে দেখে তুলে আনে ডাঙ্গায়—তাই যদি হয় এবং লোকটা যদি স্নান করতে গিয়েই ডুবে গিয়ে মরে থাকে নিশ্চয়ই সে রাত তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ সমুদ্রস্নান করতে যায়নি—অবিশ্যি যদি না লোকটার মাথায় কোন গোলমাল থেকে থাকে। কালই কথা বলেছি আমরা লোকটার সঙ্গে। কিন্তু সে রকম কিছুই ত মনে হয়নি। অতএব—

এযে আদার পয়েন্ট মিঃ রায়? এবারে মহান্তীই প্রশ্নটা করে।

আছে—আমার তৃতীয় পয়েন্ট ঃ যদি এ্যাক্সিডেন্ট-এর কথা বাদ দিয়ে ভাবি লোকটার আত্মহত্যার কথা—সেটা অবিশ্যি আমাদের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি বলা সম্ভব নয়—আরো প্রমাণ ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন। তবে একাটা কথা আমি জানি, কালী সরকার খুব ভাল সাঁতারু ছিল—কাজেই সেটা ত আমরা উড়িয়ে দিতে পারছি না।

তা ঠিক।

নাউ—দি ফোর্থ—মৃতের গলার দাগটা লক্ষ্য করুন মিঃ মহান্তী, ঠিক মনে হবে কোন কিছু ফিতে বা বা দড়ির মত গলায় বেঁধে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে।

কিন্তু—

অবিশ্যি সেটাও ময়নাতদন্তের ফলাফলের উপরই অনেকটা নির্ভর করছে

নিঃসন্দেহে। আপাততঃ এই পয়েন্টগুলোর ওপরে নির্ভর করেই ত আপনি তদন্ত শুরু করতে পারেন মিঃ মহান্তি—

তা পারি—এবং তদন্ত ত করবই—তবে একটা কথা মিঃ রায়—

বলুন।

ঘটনাচক্রই বলুন আর যাই বলুন আপনি যখন এখানে উপস্থিত আছেনই, আপনার সাহায্য এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই পাবো আশা করতে পারি।

মোষ্ট গ্ল্যাডলি! আপনাকে আমার যথাসাধ্য, আমি শুধু নয়, আমরা দুজনেই আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবো মিঃ মহান্তি।

ভারী খুশি হলাম।

শুনুন মিঃ মহান্তি—আমি জানি কালী সরকার সি-সাইড হোটেলে উঠেছিল—

সি-সাইড হোটেল মানে—হারাধন অর্থাৎ হরডন বিশ্বাসের হোটেলে!

বিজয় মহান্তিই তখন সংক্ষেপে পরিচয় দেয় ঐ হারাধন বিশ্বাসের লোকটা ও তার স্ত্রী রেণুকা বিশ্বাসের। লোকটা ক্রিশ্চান—জাতে জেলে—গঞ্জাম জেলাতেই বাড়ি। এক পাদ্রীর কৃপায় ক্রিশ্চান হয়, তাঁরই দয়ায় লেখাপড়া শিখে চাকরি করছিল রেলেতে—তারপর ওর পালনকর্তা পাদ্রী ফারলোর মৃত্যুর পর তার ফুলের স্টল ও নার্সারি উইলে পেয়ে চাকরি ছেড়ে দেয় এবং বছর খানেক হলো ঐ হোটেল খুলেছে এখানে এসে—কলকাতার ব্যবসা বেচে দিয়ে।

হোটেলটা ত বেশ চমৎকার—অনেক টাকা ঢালতে হয়েছে মনে হয়—কিরীটী বলে।

তা হয়েছে বৈকি—পাদ্রীর নার্সারী ও ফুলের স্টল বিক্রীর টাকা দিয়েই নাকি এখানে এসে হোটেলটা খুলেছে।

হুঁ। ভাগ্যবান বলতে হবে।

তা ভাগ্যবান বৈকি। তাছাড়া মিসেস বিশ্বাস—

মিসেস বিশ্বাস কি—

শি ইজ এ্যান এ্যাসেট।

কি রকম?

দেখলেই বুঝবেন—চলুন না—উঠুন—হোটেলেই ত এখন যাবো।

চলুন।

সি-সাইড হোটেলটি অনেকখানি জায়গা নিয়ে এবং অনেক টাকা খরচ করে তৈরী হয়েছে দেখলেই বোঝা যায়।

একেবারে বলতে গেলে বীচের উপরে যে রাস্তা সেই রাস্তার উপরেই। বিরাট গেট। তারপরই খানিক খোলা জায়গা। হোটেলের বাসিন্দাদের ছেলেমেয়েদের খেলবার ব্যবস্থা আছে সেখানে নানা ধরনের। তারপরই দোতলা বিল্ডিংটি।

ভিতরে প্রবেশ করলে বোঝা যায় ইংরাজী অক্ষর 'ই'-র প্যাটার্ণে তৈরী বাড়িটা। উপরে ও নীচে ছোট বড় মিলে প্রায় ত্রিশটা ঘর।

ফোর সিটেড—ডাবল সিটেড—সিঙ্গেল সিটেড ও পুরো ফ্যামিলি থাকবার মত সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই হোটেলটিতে আছে।

চার্জও একটা খুব বেশী নয়।

ম্যানেজার-প্রোপ্রাইটার মিঃ হরডন বিশ্বাস নীচের তলায় এক কোণে একেবারে খানতিনেক ঘর নিয়ে থাকেন।

লোকজনের মধ্যে সে নিজে, তার স্ত্রী রেণুকা বিশ্বাস ও একটি বেকার শ্যালক—রেণুকার ভাই ঃ রামানুজ।

তার পদবী যাই থাক, সবাই রামানুজ বলেই জানে তাকে। রামানুজই হোটেলের সুপারভাইজার ও কেয়ার টেকার!

রামানুজই আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে ম্যানেজারের ঘরে বসাল, কাম—কাম—ওয়ান্ট রুম—সিঙ্গল—ডবল—ভেরি চিপ স্যার—ভেরি চিপ। রামানুজের বয়স ২৮/৩০-এর বেশী হবে না। অনর্গল ভুল ইংরাজী বলা তার মুদ্রাদোষ একটা।

তবে সত্যিই সুশ্রী। লম্বা ঢ্যাঙ্গা চেহারা। টকটকে রঙ—কটা চুল—কটা চোখ। পরিধানে একটা শ্ল্যাক—হাওয়াই সার্চ চিত্র-বিচিত্র এ্যামেরিকান টাইপের এবং পায়ে হাওয়াই চপ্পল। মুখে ধুমায়মান সিগ্রেট।

বসুন, মিঃ বিশ্বাস মনে হয় থানাতেই 'গন'! এক্ষুনি আসবেন—কামিং সুন। কথাটা শুনে আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি।

মহান্তি বলে, মিসেস বিশ্বাস নেই?

হ্যাঁ—কিচেনে আছে—কল হার?

হ্যাঁ, তাকে খবর দিন।

রামানুজ চলে গেল এবং মিনিট দশেক পরেই রেণুকা বিশ্বাস এসে ঘরে ঢুকল ঃ নমস্কার মিঃ মহান্তী—কি খবর—মিঃ বিশ্বাস ত থানাতেই গিয়েছেন আপনার কাছে। দেখা হয়নি?

না—তার আগেই আমরা বের হয়ে পড়েছি।

একটু চায়ের কথা বলে আসি—

না, না—আপনাকে এই দুপুরে ব্যস্ত হতে হবে না—আপনি বসুন মিসেস বিশ্বাস—

মৃদু হেসে মিসেস বিশ্বাস একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

পরে পরিচয় জেনেছিলাম মহান্তিরই মুখে ঐ দিনই—মিসেস বিশ্বাসের। মিশ্র রক্তে জন্ম।

ওর মা ছিল আদিবাসী সাঁওতাল আর বাপ একজন স্কচ মিশনারী ডাক্তার। জন্মস্বত্বে কিন্তু স্কচ বাপের সব বৈশিষ্টই পেয়েছিলেন মহিলা।

॥ চার ॥

বেঁটেখাটো গড়ন রেণুকা বিশ্বাসের এবং বয়স চল্লিশের নীচে নয়।

কিন্তু বয়েস হলেও বুঝবার উপায় নেই, কারণ ছেলেপিলে না হওয়ায় দেহের গড়ন বেশ আঁট-সাট এবং যৌবন যেন সমস্ত দেহে ছড়িয়ে আছে এখনো।

রীতিমত ফর্সা গাত্রবর্ণ। রামানুজের মতই কটা চুল, কটা চোখ। পরিধানে কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েদের মত ড্রেস করে একটি ভাল শাড়ি পরা। মাথায় চুল পরিপাটি করে আঁচড়ান। খোঁপায় একটি ফুল গোঁজা। হাতে চার গাছা করে সোনার চুড়ি।

কথাটা মহান্তিকে তুলতে হলো না—মিসেস বিশ্বাসই উত্থাপন করল। বললে, একটা বড় স্যাড ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।

কি হলো!

আমাদের হোটেলেরই একজন বোর্ডার মনে হচ্ছে গত রাত্রে সমুদ্রের জলে সুইসাইড করেছে—

সুইসাইড! মহান্তি তাকাল মিসেস বিশ্বাসের মুখের দিকে।

তাছাড়া আর কি! কিন্তু বুঝতে পারছি না ভদ্রলোক হঠাৎ ওভাবে সুইসাইড করতে গেলেন কেন! অথচ পাঁচ সাতদিন এখানে আছেন, খুব সোবার ধীর স্থির বলেই ত মনে হয়েছে ভদ্রলোককে—

তবে হঠাৎ সুইসাইড করতে গেলেন কেন!

তাই ত বলছি—কিছু মাথামুণ্ডু বোঝাই যাচ্ছে না। বলেছিলেন এক মাস থাকবেন।

কোন ঘরে থাকতেন? মহান্তি আবার প্রশ্ন করে।

দোতলার দুটো পাশাপাশি ঘর নিয়ে ছিলেন।

সঙ্গে আরো কেউ ছিল বুঝি!

তা। একাই ছিলেন। বড় লোক মানুষ, তাই হয়ত একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকা অভ্যাস। দুটো ঘর হয়ত সেই জন্যই নিয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের ত চিনতে পারছি না—আপনার সঙ্গে এঁরা—

আমার বিশেষ বন্ধু—

ও—তা আপনি কি মিঃ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন!

হ্যাঁ—আপনার হোটেলের বোর্ডার কালী সরকারের ব্যাপারেই—

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলাম রেণুকা বিশ্বাসের কটা চোখের চাউনি যেন হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল এবং পর্যায়ক্রমে আমাদের সকলের মুখের উপর দিয়ে দ্রুত একবার ঘরে গেল।

বুঝলাম ভদ্রমহিলাটি বুদ্ধি ধরে এবং সজাগ।

অতঃপর রেণুকা বিশ্বাস একটু যেন নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললেন, কি ব্যাপার বলুন ত মিঃ মহান্তি—কোন রকম সন্দেহজনক কিছু কি—

তা একটু সন্দেহের কারণ ঘটেছে বৈকি মিসেস বিশ্বাস—

মিঃ মহান্তি এটা আমার হোটেল দশজন আসা-যাওয়া করছে সর্বক্ষণ এবং দশজনকে নিয়ে ব্যাপার। সেরকম কিছু হলে বুঝতেই পারছেন হোটেলের একটা দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে।

ব্যস্ত হবেন না মিসেস বিশ্বাস—কিরীটীই এবারে কথা বললে, মিঃ মহান্তি যথাসাধ্য গোপনেই ব্যাপারটা অনুসন্ধান করবেন এবং আপনার যাতে করে কোন ক্ষতি না হয় সেটাও উনি দেখবেন বৈকি। তবে—

কি বলুন।

বুঝতেই ত পারছেন একটা সন্দেহজনক মৃত্যুর ব্যাপারে—

সন্দেহজনক মৃত্যু। কি বলছেন আপনি?

দুঃখিত আমরা মিসেস বিশ্বাস, মহান্তিই এবারে বলে কালী সরকারের মৃত্যুর ব্যাপারে সত্যিই খানিকটা সন্দেহ রয়েছে।

সন্দেহ। দুর্ঘটনা—মানে সুইসাইড নয়?

দুর্ঘটনা অবশ্যই—তবে সুইসাইড কিনা সত্যি সত্যিই এখনো সেটা প্রমাণসাপেক্ষ।

মানে—

বুদ্ধিমতী আপনি, কিরীটী বলে, আপনিই ভেবে দেখুন না—আপনি যা যা একটু আগে কালী সরকার সম্পর্কে বললেন তাতে করে লোকটা হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই সুইসাইড করে বসবে সে রকম কিছু বলে কি আপনার মনে হয়?

না।

তাছাড়া কালী সরকারকে, কিরীটী বলে, আমি এককালে ভাল করেই চিনতাম—আমার সহপাঠী ছিল—

আপনার সহপাঠী ছিল?

হ্যাঁ—লোকটা শান্ত স্থির বিবেচক বুদ্ধিমান—

কিন্তু—

হ্যাঁ—পরে তেমন কোন কারণ ঘটতে পারে এই তো বলতে চান। তা অবিশ্যি পারে। তবে আপাতদৃষ্টিতে তেমন কিছুই তো চোখে পড়ছে না বা মনেও আসছে না।

মিসেস রেণুকা বিশ্বাস আমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে বলেন, তবে কি আপনারা মনে করেন—সত্যিই ব্যাপারটার মধ্যে কোন গণ্ডগোল আছে! মানে—

ঠিক মিসেস বিশ্বাস, আপনার সন্দেহ মিথ্যা নয়। আমাদের ধারণা তাই—মিঃ

মহান্তি জবাব দিলেন।

রেণুকা বিশ্বাস হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে পড়ে। কপালে চিন্তার রেখা দেখা দেয়।

কিরীটীর ইঙ্গিতে অতঃপর মিঃ মহান্তি বলেন, মিসেস বিশ্বাস—কালী সরকার যে ঘরে ছিল সে ঘরটা একবার দেখতে চাই আমরা।

নিশ্চয়—নিশ্চয়—উঠুন—চলুন—

আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি আর ঠিক সেই সময় হোটেলের মালিক মিঃ হরডন বিশ্বাস এসে ঘরে ঢুকল।

এই যে মহান্তি, আপনি এখানে আর আমি থানায় গিয়ে—কথাটা শেষ হয় না বিশ্বাসের। আমাদের দিকে নজর পড়ায় থেমে গেল যেন সঙ্গে সঙ্গে।

আপনি যে কারণে গিয়েছিলেন, আমরাও সেই কারণেই আপনার এখানে এসেছি মিঃ বিশ্বাস। কালী সরকারের মৃত্যুর ব্যাপারটা তদন্ত করতেই এসেছি।

তদন্ত করতে—

হ্যাঁ—

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ত আপনার কথাটা মিঃ মহান্তি—

জবাব দিল এবারে রেণুকা বিশ্বাস, ওদের ধারণা কালী সরকারের মৃত্যুর ব্যাপারের মধ্যে কোন গোলমাল আছে—মানে সামথিং সাসপিসাস—

সন্দেহজনক—।

ওরা তো তাই বলছেন।

মিঃ মহান্তি—

হ্যাঁ মিঃ বিশ্বাস। মহান্তি বললেন, ব্যাপারটা আপনারা যা ভেবেছেন তা মনে হয় না।

তবে—

মনে হচ্ছে ইটস এ কেস অব মার্ডার—হোমিসাইড। তাকে কেউ হত্যা করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

সেকি! একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার বিশ্বাসের কণ্ঠ চিরে যেন বের হয়ে আসে।

আতঙ্ক—একটা বিস্ময় যেন ওর চোখে মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমি দেখছিলাম লোকটাকে।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ—রোগাটে ডিসপেপটিক টাইপের চেহারা। মাথার চুল সামনের দিকে কিছু আছে। পিছনের সবটাই প্রায় বলতে গেলে ঘাড় পর্যন্ত কামান।

ছোট ছোট কুতকুতে এক জোড়া চোখ।

ধারালো খাড়া নাক।

নাকের নীচে মাছির মত একটুখানি গোঁফ। বাদ বাকি সব ক্লিন সেভ করা। ছোট ছোট দাঁত।

দাঁত ত নয়, যেন মুক্তোর পংক্তি।

পরণে প্যান্ট ও বুসকোট, পায়ে পাম্প সু।

মা—মার্ডার—আপনি কি বলছেন মিঃ মহান্তি!

বললাম ত আমার তাই ধারণা।

বাট হাউ এ্যাবসার্ড!—এ যে অসম্ভব। কে-কে তাকে হত্যা করবে, আর হত্যা করতে যাবেই বা কেন!

কে হত্যা করবে—কেন হত্যা করবে তাকে, এসব প্রশ্নের জবাব যদি পেতাম তবে আর ভাবনা ছিল কি মিঃ বিশ্বাস! সোজা খুনীকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরতাম।

হরডন বিশ্বাস এবারে যেন একান্ত হতাশ এবং অনন্যোপায় হয়েই তার স্ত্রীর দিকে তাকাল। শুকনো গলায় বললে, কি হবে রেণু—

কি আবার হবে—তুমি অত নার্ভাস হয়ে পড়ছো কেন?

তুমি কি ব্যাপারটা কত সিরিয়াল বুঝতে পারছো না রেণু। অন্য কিছু নয়—মার্ডার—খুন। ব্যাপারটা একবার জানাজানি হয়ে গেলে এবং জানাজানি হবেই—সমস্ত হোটেলে কিরকম একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হবে তখন—

জানবে কি করে তারা। আর জানতেই বা যাবে কেন? রেণুকা বুঝি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে তার স্বামীকে।

বুঝতে পারছো না কেন ডার্লিং। এরকম একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। এ তুমি কতক্ষণ চাপা দিয়ে রাখতে পারবে? কি হবে মহান্তি সাহেব—আমি কি তবে ধনে-প্রাণে মারা যাবো? এত টাকা খরচ করে হোটেল করেছি—সবে জমে উঠেছে—

হরডন বিশ্বাস প্রায় কেঁদে ফেলার যোগাড়।

কিরীটীর মুখের দিকে তাকায় মহান্তি। কিরীটীই বলে তখন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ব্যাপারটা মিঃ মহান্তি যথাসাধ্য গোপনে এবং সতর্কতার সঙ্গে ডিল করবেন।

আপনি—আপনি কে! হরডন কিরীটীর দিকে তাকাল।

আমি—আমি মানে—

কিরীটীকে ইতস্তত করতে দেখে মহান্তি বলে, মিঃ বিশ্বাস ওর একটা বিশেষ পরিচয় আছে। বিখ্যাত ব্যক্তি উনি।

কে!

রহস্যভেদী কিরীটী রায়ের নাম শুনেছেন?

শুনিনি! বহুবার শুনেছি। আপনিই তাহলে সেই—

হ্যাঁ—উনিই তিনি! যাক—চলুন উপরে, একবার কালী সরকার যে ঘরে ছিল সে ঘরটা দেখে আসি।

চলুন।

তোমায় যেতে হবে না, তুমি থাক—আমি যাচ্ছি। রেণুকা বলে ওঠে।

তুমি যাবে! তবে তাই যাও রেণু। রামানুজ—রামানুজকে দেখছি না! সে কোথায় গেল—কোথায় যে থাকে সব! কাজের সময় কাউকে যদি সামনে পাওয়া যায়।

কেন, রামানুজকে দিয়ে কি হবে?

একটু চা—তাছাড়া সিগ্রেট আমার সব ফুরিয়ে গিয়েছে।

হেয়ার স্ট্যান্ডিং ব্রাদার—দরজার বাইরে থেকে রামানুজের গলা শোনা গেল। সে ঘর থেকে গেলেও দূরে যায়নি।

এতক্ষণ কান পেতে দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়েছিল।

রামানুজ এসে ঘরে ঢুকল।

॥ পাঁচ ॥

ঘর দুটি চমৎকার। খোলা জানালা পথে তাকালেই সম্মুখে প্রসারিত আদিগন্ত সমুদ্র। পাশাপাশি দুটি ঘর—মধ্যবর্তী একটি দরজা আছে। ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল। কালী সরকারের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রেণুকা বিশ্বাস বললে সে নিজে এসে ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে।

খুব ভাল করেছেন মিসেস বিশ্বাস। মিঃ মহান্তি বলে।

মিসেস বিশ্বাস ঘরের দরজার তালা খুলে দিল। আমরা ভিতরে পা দিলাম।

ঘরের মধ্যে তিনটে জানালা। তিনটে জানালাই খোলা। হু হু করে সমুদ্রের হাওয়া আসছে ঘরে। সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে—বালুবেলার পরেই আদিগন্ত সমুদ্র। প্রখর সূর্যকিরণে নীল মরকত মণির মত যেন জ্বলছে।

বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা হবে। অসংখ্য স্নানার্থী সমুদ্রের তটে ও জলে।

ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র সামান্যই একধারে একটি খাটে শয্যা বিস্তৃত! তার পাশে একটি টেবিল—একটি কাঠের চেয়ার ও একটি ক্যামবিসের ইজি-চেয়ার।

ইজিচেয়ারটার উপরিভাগে একটি তোয়ালে বিছান—মাথার তেল লাগবার ভয়ে বোধ হয়। টেবিলের উপরে কিছু ইংরাজী, বাংলা ম্যাগাজিন ও খান দুই হায়ার ম্যাথামেটিক্স-এর বই। একপাশে একটা বড় চামড়ার দামী সুটকেস এবং তার উপরে একটা এ্যাটাচী কেস।

পাশে দু' জোড়া জুতো। একজোড়া সু ও একজোড়া কাবুলী চপ্পল! আরো একজোড়া চপ্পল আমাদের চোখে পড়ল খাটের ঠিক সামনেই।

মনে হয় যেন কেউ চপ্পল জোড়া পা থেকে খুলে রেখে দিয়েছে।

শয্যাটার দিকে তাকালেই মনে হয়—সেটা ব্যবহৃত হয়েছে। শয্যার চাদরটা কুঁচকে রয়েছে।

মধ্যবর্তী দরজার কবাট দুটো এদিক থেকে বন্ধ—শিকল তোলা ছিল।

পাশের ঘরে গিয়ে দরজার শিকল খুলে ঢুকলাম আমরা। সে ঘরের ব্যবস্থাও ঠিক পাশের ঘরের অনুরূপ।

কেবল শয্যাটি সুজনী দিয়ে ঢাকা এবং সেই শয্যার ওপরে একটা রবারের বালিশ—একটা ৭৭৭ সিগারেটের কৌটো—একটা কাঁচের এ্যাসট্রে, এ্যাসট্রে ভর্তি সিগ্রেটের টুকরো ও ছাই।

আর এক জোড়া তাস।

সে ঘর থেকে বেরুবার দরজাটা বন্ধই ছিল—বাইরে থেকে তালা বন্ধ।

রেণুকা বিশ্বাস বললে, সরকারের ইচ্ছাক্রমেই বাইরে থেকে তালা দেওয়া হয়েছে

সে তালার চাবি? কিরীটী প্রশ্ন করে।

একটা সরকারের কাছে ছিল। একটা আমাদের হোটেলের কি-বোর্ডে আছে। জানবো? রেণুকা বিশ্বাস কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

না। থাক এখন।

মধ্যবর্তী দরজা-পথে আবার আমরা প্রথম ঘরে ফিরে এলাম।

হঠাৎ কিরীটী রেণুকা বিশ্বাসের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, মিসেস বিশ্বাস—

বলুন।

আপনি প্রথম কখন জানতে পারেন এবং কেমন করে জানতে পারেন দুর্ঘটনার কথাটা?

বোর্ডারদের প্রাতঃকালীন চায়ের ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে খুব ভোরে উঠতে হয়। রাত থাকতেই বলতে গেলে আমি উঠি। কিচেনে চায়ের ব্যবস্থা করছিলাম। হোটেলের নুলিয়া পিংলা এসে খবরটা আমাকে প্রথম দেয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেখি—

চিনতে পেরেছিলেন সরকারকে?

হ্যাঁ।

তারপর?

হোটেলে ফিরে এসে ব্যাপারটা আমি আমার স্বামীকে জানাই। স্বামী তখনই সমুদ্র-তীরে চলে যান।

আর আপনি?

আমি সোজা এ ঘরে আসি।

কেন।

মনে হলো ঘরটা দেখা দরকার তাই!

এসে কি দেখলেন? ঘরের দরজা খোলা ছিল?

হ্যাঁ! তবে শিকল তোলা ছিল দরজায়।

অর্থাৎ তালা দেওয়া ছিল না?

না।

আপনি ঘরে ঢুকেছিলেন?

ঢুকেছিলাম।

কিছু উল্লেখযোগ্য আপনার নজরে পড়েছিল তখন এই ঘরে?

না। তাছাড়া মনের অবস্থা তখন আমার চঞ্চল—তাড়াতাড়ি কোন মতে ঘরে তালাটা লাগিয়ে নীচে চলে যাই।

তালার চাবিটা বুঝি উপরে আসবার সময় সঙ্গেই এনেছিলেন?

অ্যাঁ।

বলছিলাম তালার চাবিটা—

হ্যাঁ। সঙ্গেই এনেছিলাম।

হুঁ। আচ্ছা মিসেস বিশ্বাস, কতদিনের জন্য সরকার এই ঘর দুটো আপনার নিয়েছিল? কিরীটীই প্রশ্ন করতে থাকে পূর্ববৎ।

দিন পনেরর জন্য।

আর একটা কথা—সরকারের কাছে এ ক'দিন ভিজিটার্স কেউ এসেছে জানেন?

কই না ত—

কেউ আসেনি।

না—অন্তত এলেও আমার নজরে পড়েনি—আমি জানতেও পারিনি।

আচ্ছা...একজন বেশ সুন্দর ফর্সা মত লোক—কটা চুল—কটা চোখ, ঝলঝলে একটা সুট পরণে—এমন একটা লোককে সরকারের কাছে আসতে দেখেছেন কি?

না—তাছাড়া সরকার ত প্র্যাক্টিক্যালি তার ঘর থেকে বেরুতই না, একমাত্র ঘণ্টা দুয়েকের জন্য সন্ধ্যার মুখে ছাড়া—

এই ঘরেই বুঝি সবসময় থাকত?

হ্যাঁ—ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা—আর টিন টিন সিগ্রেট—এমন কি ডাইনিং হলেও এই কয়দিনে একবার যায়নি—খাবার এই ঘরেই পাঠিয়ে দিতাম আমরা।

আচ্ছা। আপনার স্বামীকে একবার উপরে পাঠিয়ে দেবেন গিয়ে—

দিচ্ছি।

মিসেস বিশ্বাস ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে এবং তাকাতে তাকাতে হঠাৎ ইজিচেয়ারটার সামনে গিয়ে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আঙ্গুলের সাহায্যে কি যেন তোয়ালের উপর থেকে খুঁটে তুলে নিল।

কিরে? শুধালাম।

একটা চুল।

চুল!

হ্যাঁ—দেখতে বেশ লম্বা কোঁকড়া—কোন পুরুষের নয়—নারীর মাথার কেশ—

নারীর—

আমার মুখের কথা শেষ হয় না। খোলা দরজা পথে এক সুবেশী নারী ঘরের মধ্যে

এসে ঢোকে কথা বলতে বলতে এবং তার পশ্চাতে হরডন বিশ্বাস।

কি বলছেন ম্যানেজার আপনি পাগলের মত—কালী সরকার মারা গিয়েছে—অথচ কালও বিকেলের দিকে ট্রেনে চাপবার আগে তার সঙ্গে ফোনে কলকাতা থেকে এই হোটেলের কথা—আগন্তুক ভদ্রমহিলার বোধহয় এতক্ষণে আমাদের প্রতি নজর পড়ে।

থেমে যায় সে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে আমাদের দিকে তাকায় চশমার কাচের ভিতর দিয়ে। সরু ফ্রেমের সোনার চশমা চোখে। আগন্তুক মহিলার বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের নীচে কোন মতেই নয়। চেহারাটা সুশ্রী এবং সযত্ন প্রসাধনও চোখেমুখে স্পষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও বয়সকে লুকাতে পারেনি মহিলা।

কপালে বয়েসের ছাপ পড়েছে। চোখে লাগে।

কিন্তু আশ্চর্য!

মাথার চুল একেবারে কালো কুচকুচে—একটু যেন অস্বাভাবিক রকমেরই কালো। পরনে দামী শাড়ী—ক্রেপ সিল্কের ব্লাউজ। হাতে সাদা ব্যাগ।

মিঃ মহান্তি—হরডন বিশ্বাসই বলে, ইতি লতিকা গুঁই—কালী সরকারের কাছে এসেছেন। বিশেষ পরিচিতা।

কিন্তু এরা কারা? লতিকা গুঁইই প্রশ্ন করল।

থানা অফিসার মিঃ মহান্তি—আর উনি মিঃ কিরীটী রায়।

তাহলে ব্যাপারটা সত্যি? যেন স্বগতোক্তির মতই বলে অতঃপর লতিকা গুঁই।

হ্যাঁ। জবাব দিল মিঃ মহান্তি, কিন্তু আপনি কোথা থেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে।

আজই?

হ্যাঁ—আজই।

কলকাতার ট্রেন কি আজ লেট?

না—ঠিক টাইমেই এসেছে।

তবে আপনার আসতে—

আমি অন্য হোটেলে উঠেছি। কথা ছিল কালী আমাকে স্টেশনে রিসিভ করে আনতে যাবে। কিন্তু সেখানে তাকে না দেখে সোজা হোটেলে যাই। সেখান থেকে এই আসছি।

আপনার সঙ্গে মিঃ সরকারের অনেক দিনের পরিচয় বুঝি?

হ্যাঁ—বলতে পারেন অনেক বছর।

দীর্ঘ দিনের পরিচয় তাহলে আপনাদের?

নিশ্চয়ই।

কালী সরকারের বাড়িতে কে কে আছেন জানেন—কিছু বলতে পারেন?

কে আর থাকবে—ব্যাচিলার।

বিয়ে করেনি?

না—তবে ওর বড় ভাইয়ের এক ছেলে সাধনা সরকার ওর কাছে থাকে হাজরা রোডের বাড়িতে।

॥ ছয় ॥

কিরীটী আবার জিজ্ঞাসা করে, আপনার সঙ্গে তাহলে গতকাল বিকেলে কালী সরকারের ফোনে কথাবার্তা হয়েছিল?

হ্যাঁ—বললাম ত—

তার সঙ্গে আপনার কি কথা হয়েছিল লতিকা দেবী?

সঙ্গে সঙ্গে লতিকা গুঁইয়ের ভ্রু দুটো কুঁচকে ওঠে, সে বলে, কেন বলুন ত? আপনার তা দিয়ে কি দরকার?

প্রয়োজন আছে বলেই উনি কথাটা জিজ্ঞাসা করছেন মিসেস গুঁই—জবাব দিল এবারে মহান্তিই।

কোন দরকার থাকতে পারে না ওঁর সে কথায়। তাছাড়া সে আমাদের নিজস্ব প্রাইভেট কথা। সে সব ওঁকে বলতে যাবোই বা কেন, আর উনিই বা কোন যুক্তিতে শুনতে চান। কণ্ঠস্বরে এবং বলবার ভঙ্গিতে লতিকা গুঁইয়ের রীতিমত বিরক্তি।

বেশ বলবেন না। তা আপনি কি জন্য এখানে? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

আপনাা কি জন্য এসেছেন এখানে? সবাই কিজন্য আসে পুরীতে? আমিও সেই জন্যই এসেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, এসব প্রশ্ন আমাকে করছেন কেন আপনারা?

জবাব দিল এবারে মহান্তিই, প্রশ্নগুলো করার কারণ হচ্ছে কালী সরকারকে কেউ হত্যা করেছে—হি হ্যাজ বিন ব্রুটালি মার্ডারড্।

কী—কি বললেন! তাকে ব্রুটালি হত্যা করা হয়েছে!

হ্যাঁ মিস গুঁই। হি হ্যাজ বিন মার্ডাড্। মহান্তি আবার বলে আস্তে আস্তে পরিষ্কারভাবে।

কিন্তু হোয়াই—কেন তাকে হত্যা করবে কেউ—কেন?

তা জানি না—তবে যা ফ্যাক্টস্ তাই বললাম। মহান্তি আবার বলে, কিন্তু আপনি মিঃ সরকারের সঙ্গে যখন এত পরিচিত, তখন এখানে এসে এই হোটেলে না উঠে অন্য হোটেলে উঠতে গেলেন কেন?

লতিকা মহান্তির ওই প্রশ্নে একবার অদূরে দণ্ডায়মান হরডন বিশ্বাসের দিকে তাকাল, তারপর বললে, তাই হোটেলটা আমার একটুও পছন্দ হয় না।

কেন—হোটেলটা নতুন হলেও বেশ সুনাম হয়েছে ইতিমধ্যে।

হোক, বাট আই দ্যাট উওম্যান। আমি ঐ স্ত্রীলোকটিকে ঘৃণা করি।

কোন স্ত্রীলোকটি! কার কথা বলছেন? কাকে ঘৃণা করেন আপনি? কিরীটীই

এবারে প্রশ্ন করে।

—দ্যাট রেণুকা বিশ্বাস। এই হারাধন বিশ্বাসের স্ত্রীকে।

কেন ভদ্রমহিলা ত—

থামুন। ভদ্রমহিলা—সি ইজ এ ভাইপার।

আপনি তাহলে মিসেস বিশ্বাসকে চেনেন লতিকা দেবী?

চিনি না আবার—হাড়ে হাড়ে চিনি!

কতদিনের জানা-শোনা আপনাদের?

তা দিয়ে আপনার প্রয়োজনটা কি শুনি। আমি চললাম। বলেই অতর্কিতে লতিকা গুঁই যেন সমস্ত কিছুর উপরে যবনিকাপাত ঘটিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমরা সবাই ঘরের মধ্যে স্তম্ভিত হতভম্ব।

কিরীটীই প্রথমে কথা বলে, মিঃ মহান্তি আপনি চট করে নীচে যান, সঙ্গে যে প্লেন ড্রেস কনস্টেবলটি আছে তাকে বলে আসুন—টু কিপ এ্যান আই—ওর উপরে যেন দৃষ্টি রাখে। মহান্তি তাড়াতাড়ি নীচে চলে গেল।

কিরীটী এবারে হরডন বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনারা ওকে চেনেন মিঃ বিশ্বাস?

হ্যাঁ। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় হরডন বিশ্বাস।

আপনাদের সঙ্গে কত দিনের পরিচয়!

আমার সঙ্গে ঠিক পরিচয় নেই মিঃ রায়, পরিচয় আমার স্ত্রীর সঙ্গে, মানে যে স্কুলে লতিকা টিচারী করে সেই স্কুলেই আমার স্ত্রী রেণুকা বছরখানেক চাকরি করেছিল। সেই সময়েই পরিচয়।

লতিকা দেবী তাহলে একজন স্কুল টিচার?

হ্যাঁ।

কোন স্কুলে!

জগমোহিনী সরকার গার্লস হাইস্কুল—বৌবাজারে।

স্কুলটার সঙ্গে কি কালী সরকারের কোন সম্পর্ক—

স্কুলটা ত ওর মার নামেই ছিল, আর কালী সরকার ত সেই স্কুলের সেক্রেটারী।

আই সি। তাহলে দেখছি আপনি ও আপনার স্ত্রী কালী সরকারকে বেশ ভাল ভাবেই চিনতেন?

হ্যাঁ। কিছু আলাপ-পরিচয় ছিল।

হরডন বিশ্বাস আর কোন কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

আচ্ছা মিঃ বিশ্বাস আপনি যে বললেন আপনার স্ত্রী জগমোহিনী স্কুলের টিচার ছিলেন, সেটা কবে—কতদিন আগে?

আমাদের বিয়ের আগে।

বিয়ের আগে, মানে কতদিন আপনাদের বিয়ে হয়েছে?

বছর তিনেকের কিছু বেশী, মাস ২।৩ হবে।

মাত্র।

হ্যাঁ।

আপনাকে আমি ডেকেছিলাম একটা কথা জানতে মিঃ বিশ্বাস!

বলুন!

আচ্ছা, একজন বেশ সুন্দর মত লোক—ফর্সা রঙ, কটা চুল, কটা চোখ—ঝলঝলে একটা সুট পরনে কোন সময় কালী সরকারের কাছে আসতে দেখেছেন কি?

না।

মনে করে দেখুন।

না। কালী সরকার কারো সঙ্গে দেখা করত না। বেরুতও না, সন্ধ্যায় ঘণ্টা দেড়েক দু'য়েকের জন্য ছাড়া—

আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।

বড় মুশকিল হয়েছে মিঃ রায়। হোটেলের অন্যান্য বোর্ডাররা বোধহয় কিছুটা সন্দেহ করেছে।

তা একটু ত হবেই মিঃ বিশ্বাস। তবে পুলিশের দিক থেকে বেশী হৈ-চৈ করা হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

কি বিশ্রী ব্যাপার হলো বলুন ত, মাত্র হোটেল এক বছর হলো এত খরচপত্র করে করলাম।

ভাল কথা মিঃ বিশ্বাস এই হোটেল খোলবার আগে আপনি কি কাজ করতেন?

ব্যবসা করতাম।

কিসের ব্যবসা?

ফুলের।

ফুলের ব্যবসা?

হ্যাঁ, একটা ফুলের স্টল ও নার্সারী ছিল আমার।

কোথায়?

স্টলটা ছিল নিউ মার্কেটে—নার্সারী বেহালায়।

সে ব্যবসা কতদিন করেছেন?

তা অনেক দিনের সে ব্যবসা। আসলে ব্যবসাটা ছিল আমাকে যে পাদ্রী মানুষ করেন তাঁরই। তাঁর মৃত্যুর সময় ব্যবসাটা তিনি আমাকেই দিয়ে যান।

ব্যবসাটা লাভের ছিল নিশ্চয়ই?

তা ছিল।

তা সে লাভবান ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে হোটেল খুললেন কেন? ইতিমধ্যে মহান্তি ঘরে ফিরে এসেছিল, প্রশ্নটা সেই করল।

আমার স্ত্রীর অনেকদিন থেকে একটা হোটেল খোলবার ইচ্ছা ছিল। তাই স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন সি-অন-গোপালপুরের একটা ইউরোপীয়ান হোটেলে

সুপারভাইজারের কাজ করেছিল। তার ধারণা হয় ভাল কোন জায়গায় সমুদ্রের ধারে বা পাহাড়ে ভাল করে একটা হোটেল খুলতে পারলে প্রচুর আয় হতে পারে।

তাই এই হোটেল!

হ্যাঁ—সেই ব্যবসা বিক্রি করে দিয়ে এই হোটেল করেছি আমরা।

হোটেলের এই বাড়ি আপনাদের?

হ্যাঁ—একটা ছোট বাড়ি ছিল—বাড়ি সমেত জায়গাটা কিনে নিয়ে এক্সটেনশন করিয়ে নিয়েছি।

বেশ খরচা পড়েছে নিশ্চয়ই?

তা পড়েছে! কিন্তু ওসব খবর আমি ঠিক বলতে পারবো না মিঃ মহান্তি! আমার স্ত্রীই সবকিছু করেছে, সেই সব জানে—বলতে পারবে।

অতঃপর তখনকার মত আমরা বের হয়ে এলাম সি-সাইড হোটেল থেকে। মহান্তির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে স্নান খাওয়া সারতে সারতে বেলা দেড়টা প্রায় হয়ে গেল। আহারাদির পর আলসেমি ধরায় বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল প্রায় তিনটে নাগাদ—ভৃত্যের ডাকে।

সে চা এনেছে।

কিরীটী ঘরে নেই। চেয়ে দেখি বারান্দায় ইজিচেয়ারটায় গা ঢেলে দিয়ে দূর সাগরের দিকে চেয়ে আছে।

সত্যি, সামনের ঐ সাগর এমনি একটি বিস্ময়—এমনি একটি অখণ্ড আনন্দ যে তার যেন শেষ নেই—কোন একঘেয়েমির ক্লান্তি নেই।

বাইরে এসে বসলাম কিরীটীর পাশেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে।

অপরাহ্নের রৌদ্রালোকে ঝলমল করছে যেন নীল সমুদ্রের জল। অবিশ্রাম ঢেউ একটার পর একটা আসছে, যাচ্ছে, ভাঙ্গছে গড়ছে।

অবিশ্রাম একটানা গর্জন।

কিরীটীই প্রথমে কথা বলে, একটা কথা ভাবছিলাম সুব্রত!

কি!

কালী সরকারের সঙ্গে লতিকার একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল ঠিকই—সেই সঙ্গে বোধহয় রেণুকারও ছিল।

আমারও তাই মনে হচ্ছিল—আর সেই দিক দিয়ে বোধহয় কোন একটা জট পাকান ছিল!

কারেক্ট। আমারও তাই মনে হচ্ছে। লতিকা, রেণুকা আর মধ্যখানে ব্যচিলার কালী সরকার। বুঝলি সুব্রত, এই জন্য বলে, ব্যচিলার থাকতে নেই। তা তুইও বুড়ো হতে চললি, আমার কথায় কানই দিলি না।

বলছিস!

বলছিস মানে—বলেছি অতীতে—বর্তমানে বলছি এবং ভবিষ্যতেও বলব।

তাহলে চল না হয় কলকাতায় গিয়ে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলি।

ফুল-চন্দন পড়ুক তোর মুখে, আজই কৃষ্ণাকে জানাব।

তা জানাস, কিন্তু পাত্রী একটা চাই ত।

পাত্রী! পাত্রীর তোর অভাব আছে নাকি?

তোর মতলবখানা কি বল ত! আর ইউ থিঙ্কিং অফ দ্যাট লতিকা গুঁই?

কেন বন্ধু—কুন্তলা দেবী ত আজও বাসর-শয্যা রচনা করে আশার প্রদীপটি জ্বালিয়ে—

আঃ কিরীটী—

কি হলো!

মৃদু কণ্ঠে বলি, কিছু না।

কিছুই যদি না ত গলার স্বরটি অমন কেন।

ঠিক আছে, তুই বক বক কর, আমি চললাম। উঠে পড়লাম আমি। সোজা সমুদ্রতীরে নেমে গেলাম।

ভিজে বালুর বুকে অশান্ত ঢেউ এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে, তারপর আবার চলে যাচ্ছে। কেমন করে কিরীটীকে বোঝাই, কুন্তলা আমার স্বপ্নের মধ্যে ধ্যানের মত রয়েছে। সে আমার সমস্ত জীবন-সত্বার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই ত ভয় করে তাকে স্পর্শ করতে।

সে ত স্পর্শের নয়, সে যে ধ্যানের। সে যে আমার জীবনের একটি রঙ, একটি সুর, একটি সঙ্গীত। জীবনের দেওয়া-নেওয়া, প্রতি দিনের তুচ্ছতার মধ্যে মলিনতা ও অভিযোগের মধ্যে তাকে কি জড়াতে পারি। জীবনে ঘর বাঁধবার মধ্যেই কি সব। সেখানে ত জীবন প্রতি মুহূর্তে সংকীর্ণ হয়ে যায়। না, না, তার চাইতে এই ত ভাল।

মধ্যে মধ্যে এসে অশান্ত ঢেউগুলো ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে পায়ের পাতা। আসছে যাচ্ছে ঢেউ নিরবধি, বিরাম নেই। এই দিগন্তবিস্তৃত সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়েও মানুষের মনের মধ্যে দুঃস্বপ্ন নখর বিস্তার করে। গোপন লিপ্সা ক্রুর হিংসার হলাহলে ফেনিয়ে ওঠে।

কেন, কেন এমন হয়।

দু'দিনের জীবন—কেন মানুষ তাকে সুন্দর করে তোলে না, সমস্ত অভাব-অভিযোগ মলিনতা ও কুশ্রীতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে না।

গতকাল সন্ধ্যায় এই বালুবেলার উপর বসে বসেই আমাদের কথা হচ্ছিল। সেই কথাগুলোই হঠাৎ মনে হয়। কালী সরকারকে দেখে কি মন্তব্য আমি করেছিলাম সেই মন্তব্যের কথাটা মনে হয়। যাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল কোল্ড ব্লাডে মার্ডার করতে পারে সেই লোকটাই কিনা শেষ পর্যন্ত নিহত হলো অন্যের হাতে।

কথাটা আনমনেই ভাবতে ভাবতে সমুদ্রতীর ধরে ভিজে নরম বালুর উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছিলাম। হোটেল ছেড়ে অনেক দূর চলে গিয়েছিলাম

পশ্চিমের দিকে। এ সময়ে সমুদ্রতীর একেবারে নির্জন। কদাচিৎ কখনো এক আধটা মানুষ চোখে পড়ে।

স্বর্গদ্বারের পরেই ক্রমশঃ সমুদ্রতীরে বাড়িগুলো কমে আসে। একটা দুটো বাড়ি অনেক দূরে দূরে এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, তাও আর চোখে পড়ছে না। বোধহয় এদিকটায় তেমন লোকালয় নেই।

এই কোষ্ট ধরে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যাওয়া যায়। হয়ত মাদ্রাজ পৌঁছান যায়। হেঁটে গেলে কেমন হয়। সমুদ্র ত আমার পাশেই রয়েছে।

অপরাহ্নের আলোয় যেন নীল মরকত মণির মত জ্বলছে।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। একেবারে জলের ধার ঘেঁষে কে যেন বালুর উপর বসে আছে। বাতাসে তার আঁচল ও মাথার চুল উড়ছে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অপলক বসে আছে এক নারী।

কে ঐ নারী!

আরো কিছুটা এগিয়ে যেতেই দ্বিতীয়বার চমকে উঠি ঃ লতিকা গুঁই।

এখানে এই নির্জন সমুদ্রতীরে লতিকা গুঁই!

আরো এগোবো কি এগোবো না ভাবছি। লতিকা গুঁইয়ের কিন্তু কোন দিকে নজর নেই। সে যেন নিজ ধ্যানে মগ্ন।

আরো একটু এগিয়ে গেলাম। কোন খেয়াল নেই লতিকা গুঁইয়ের। মধ্যে মধ্যে এক আধটা ঢেউ এসে পায়ের কাছে একেবারে পড়ছে। সেদিকেও যেন খেয়াল নেই।

অপরাহ্নের আলোয় সেই সমুদ্র-তীরবর্তিনী উপবিষ্টা নারীকে মনে হলো যেন বড় বিষণ্ণ, বড় ক্লান্ত।

হঠাৎ যেন চোখে পড়লো, লতিকার দু' চোখের কোণ বেয়ে ক্ষীণ অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ছে। লতিকা কাঁদছে।

আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ফিরে এলাম।

হোটেলে ফিরে দেখি কিরীটী আর এক কাপ চা নিয়ে বসেছে।

আমাকে ফিরতে দেখে বলে, মন শান্ত হলো?

আমি কোন কথার জবাব দিই না।

তুই যে কুন্তলার ব্যাপারে এতখানি টাচি সুব্রত জানতাম না ত! ক্ষমা কর ভাই।

আমি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললাম, লতিকা গুঁইকে দেখলাম।

কোথায়? নিস্পৃহ কণ্ঠে শুধায় কিরীটী।

সমুদ্রের ধারে—বসে বসে কাঁদছে।

পুওর গার্ল, কিরীটী বলে, শিক্ষকতা করতে করতেই জীবনটা গেল—

আমাদের কথা শেষ হয় না, দেখি একটা সাইকেল রিক্সা থেকে মহান্তি নামছে আমাদের সামনে।

মহান্তি যে, কি ব্যাপার?

আপনি আমাকে ট্রাঙ্ককলটার খোঁজ নিতে বলেছিলেন না? সি-সাইড হোটেলে কাল যে ট্রাঙ্ককল হয়েছে—

হ্যাঁ! খবর পেলেন কিছু!

পেলাম। দুটো ট্রাঙ্ককল ছিল। একটা কলকাতা থেকে আর একটা রাউরকেল্লা থেকে। কিন্তু—

কি?

দুটো কলেই পি, পি—পার্টিকুলার পারসন ছিল, কিন্তু তার মধ্যে ত কালী সরকারের নাম নেই।

॥ সাত ॥

কিরীটী মহান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে শুধাল, তবে কার নাম আছে?

একটা কল ছিল এইচ বিশ্বাসের নামে। একটা ছিল কোন এক গণেন ব্যানার্জীর নামে। লোকটা নিউজ-পেপার রিপোর্টার। লতিকা গুঁই যে ট্রাঙ্ককলে কালী সরকারের সঙ্গে গতকাল বিকেলে কথা বলেছে বললে, মনে হচ্ছে সেটা মিথ্যা। তাছাড়া—

থামলেন কেন বলুন! কিরীটী ওর দিকে তাকিয়ে তাগিদ দেয়।

মনে হচ্ছে লতিকা গুঁই যেন কিছু লুকাচ্ছে।

কি লুকাবে?

সে অনেক কিছুই হয়ত জানে এ ব্যাপারে।

তা যদি সে লুকিয়েই থাকে ত আমরা ত ঠিকই জানতে পারব মিঃ মহান্তি। ডোন্ট ওরি। আপনাকে কতকগুলো কথা বলি, মন দিয়ে শুনুন।

বলুন।

এক নং—কিরীটী বলতে লাগল ঃ সি-সাইড হোটেলটা তৈরী করতে রাফলি কত আন্দাজ খরচা হয়েছে বিশ্বাসের—সেই টাকার অঙ্কটা জানতে হবে আমাদের। দুই নং—বেহালার নার্সারীর ও মার্কেটের ফুটের স্টল ও কত টাকায় বিক্রী করেছিল। তিন নং—জগমোহিনী গার্লস স্কুলের চাকরি রেণুকা বিশ্বাস ছেড়ে দিয়েছিল নিজেই, না তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল—যদি ছাড়িয়ে দেওয়া হয়ে থাকে ত কেন! চার নং—রেণুকা ও হরডনের বিয়ের পর ও আগে কালী সরকারের সঙ্গে ওদের দু'জনের কোন যোগাযোগ ছিল কিনা। পাঁচ নং—কালীর ভাইপো সাধন সরকারকে একটা ইনটিমেশন দিতে হবে।

আর কিছু?

হ্যাঁ, আর একটা কথা। দোলগোবিন্দ শিকদার নামে একটি লোক, লোকটি দেখতে

সুন্দর—ফর্সা রঙ—ভাসা-ভাসা বড় বড় চোখ—চোখের তারা কটা—এবং মাথার চুলও কটা—ঝলঝলে একটা সুট পরনে—আর—আর—বাঁ কপালের উপর আধ ইঞ্চি পরিমাণ একটা জড়ুল আছে—এই লোকটির সন্ধান এই পুরী শহরে করতে পারেন কিনা দেখুন।

—কিন্তু—

সম্ভবতঃ লোকটা বিদেশী—এবং শুনেছি ব্যবসায়ী। পার্ল মার্চেন্ট।

মুক্তো ব্যবসায়ী!

হ্যাঁ—ষ্টেশনে একজন পুলিশ নিযুক্ত করুন, নজর রাখার।

যদি অলরেডি চলে গিয়ে থাকে পুরী ছেড়ে?

তাহলে আর কি করবেন!

খোঁজ করব কোথায় লোকটার?

আগে হোটেল ও ধর্মশালাগুলোতে করুন, তারপর শহরে করুন।

কিন্তু লোকটা কে?

বললাম ত মুক্তোর ব্যবসায়ী।

তা যেন বুঝলাম, কিন্তু এই মামলার সঙ্গে।

কালী সরকারের সঙ্গে লোকটার পরিচয় ছিল, আর গতকাল সন্ধ্যায় সি-বীচে লোকটাকে কালী সরকারের সঙ্গে দেখেছি।

তা না হয় খুঁজে দেখবো, তবে আমার কিন্তু ধারণা—

কি ধারণা আপনার?

ঐ হোটেলওয়ালী রেণুকা বিশ্বাস স্ত্রীলোকটি আদৌ সুবিধার নয়।

কিন্তু তাতে করে আপনি কি খুব একটা এগুতে পারবেন মিঃ মহান্তি এই হত্যার ব্যাপারে?

মানে?

যদি আমাদের অনুমান সত্যিই হয় যে তাকে ষ্ট্র্যাঙ্গল করে অর্থাৎ গলা টিপে হত্যা করে পরে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে রেণুকা বিশ্বাসের মত একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে কি—

অর্থাৎ আপনি বলতে চান সম্ভব কিনা? আপনি ঐ মেয়েমানুষটিকে চেনেন না। আমি কিছু কিছু জানি।

জানেন!

হ্যাঁ। এখানকার জমি হোটেল ও লাইসেন্সের ব্যাপারে ওই স্ত্রীলোকটি মধ্যে মধ্যে আমার কাছে যেত। সেই সময় কথায় কথায় ওর অনেক পরিচয়ই আমি জানতে পারি।

কি জেনেছেন বলুন না?

বিয়ের আগে রেণুকা ছিল দাশ—রেণুকা দাশ। রেণুকা দাশ নামেই অন্ততঃ পরিচয় ছিল যদিও ওর জন্ম মিশ্র রক্তে।

কি রকম।

ওর বাপ ডাঃ আর্থার মুর ছিল সাঁওতাল পরগণার এক মিশনারী হাসপাতালের ডাক্তার। জাতে স্কচ।

কার কাছে শুনলেন এ কথা?

ও নিজেই বলেছে।

কে রেণুকা?

হ্যাঁ। কথায় কথায় একদিন ও আমাকে বলেছিল ওর জীবনটা নাকি বড়ই বিচিত্র। ছোটবেলায় ছিল প্রচণ্ড দস্যি মেয়ে। দৌড়, লাফ-ঝাঁফ, কুস্তি, ছোরা খেলা, লাঠি খেলা, বন্দুক-ছোড়া—

বলেন কি!

হ্যাঁ। সব তার পালক বাপের উৎসাহে। আসলে ঐ মিশনারী ডাক্তারের ঔরসে রেণুকার জন্ম হলেও লোকে জানত ওর আড়াই বছর বয়সের সময় মা মরে যাওয়ায় ঐ মিশনারী ডাক্তারই তাকে অনুগ্রহ করে পালন করেছে। যা হোক যা বলছিলাম। গায়ে ও বেশ শক্তি ধরত। ডাক্তার বাপ অবিশ্যি ওকে যে কেবল খেলা-ধুলা, দৌড়-ঝাঁপেই উৎসাহ দিয়েছে তাই নয়—লেখা-পড়াও কিছু কিছু শিখিয়েছিল। কিন্তু লেখাপড়ায় তেমন মন ছিল না।

তারপর?

পনের কি ষোল বছর বয়সে এক সার্কাস পার্টির সঙ্গে ও পালিয়ে যায়। চার বছর ছিল সেই দলে, নানা ধরনের দৈহিক কসরৎ দেখাতো। তারপর একদিন সার্কাস পার্টির ম্যানেজারকে ছুরি মেরে—

সে কি!

হ্যাঁ সুব্রতবাবু। ম্যানেজার রাত্রে ওর তাঁবুতে এসেছিল। ও ছুরি মেরে পালায় সেখান থেকে। আবার ও ফিরে আসে মিশনারী বাপের কাছে। ক্রমে ম্যাট্রিক ও আই-এ পাশ করে। ট্রেনে একদিন কলকাতায় যেতে যেতে টি, টি হারাধন বিশ্বাসের সঙ্গে ওর আলাপ হয়। আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। ঐ সময় ঐ মিশনারী ডাক্তার মারা যান এবং হারাধনের প্রচেষ্টাতেই জগমোহিনী গার্লস স্কুলে ও চাকরি পায়।

তারপর?

কিন্তু সেখানে ও এক বছরের বেশী চাকরি করতে পারে না।

কেন?

হোস্টেলে থাকত ও মানে ঐ স্কুলেরই হোস্টেলে! সেখানে কি একটা চুরির ব্যাপারে ও জড়িয়ে পড়ে এবং নিজে থেকেই ও চাকরি ছেড়ে দেয়। ঐ সময় হারাধন বিশ্বাস নার্সারী ও ফুলের স্টলটা পায়। তখন রেণুকা কিছুদিন নার্সারীটা দেখাশোনা করছে। কিন্তু সেখানে ও বেশীদিন টিকতে পারে না। চলে এসে সি-সন-গোপালপুরের এক হোটেলে চাকরি নেয়।

তারপরই বোধহয় বিয়ে ও এই হোটেলের পত্তন!

কতকটা তাই।

আচ্ছা ওর ঐ ভাইটি? কিরীটী প্রশ্ন করে।

ঐ রামানুজ দাসের কথা বলছেন?

হ্যাঁ। ওর সম্পর্কে কি জানেন?

বিশেষ কিছুই জানি না—ওর সঙ্গে আজকেই ত হোটেলে প্রথম পরিচয় হলো।

রেণুকা বিশ্বাসের মুখে ওর এই ভাই সম্পর্কে কিছু শোনেন নি?

না।

কিছু বলেনি সে?

না। তা নাই বা জানা থাকল, কি জানতে চান ঐ রামানুজ সম্পর্কে বলুন। সব জেনে নেবো।

বিশেষ কিছুই না—এই হোটেলে ও কতদিন আছে—এর আগে কোথায় ছিল, কি করত।

ও আর এমন কি শক্ত, বলেন ত এখুনি ওকে এখানে ডেকে এনে যা জানবার আমরা জেনে নিতে পারি মিঃ রায়।

না মহান্তি সাহেব—তাড়াহুড়া নয়—ধীরে সুস্থে জানুন—ও যেন না কোনক্রমে সন্দেহ করতে পারে।

তবে কি মিঃ রায় ঐ রামানুজকেই আপনি—

সন্দেহের কথা যদি বলেন মহান্তি সাহেব, অত্যন্ত সন্দিগ্ধ মন আমার। হরডন বিশ্বাস, রেণুকা বিশ্বাস, রামানুজ দাস সকলকেই আমি—এমনকি কালী সরকারের দু'পাশের ঘরে যে বোর্ডার দু'জন আছেন, রামগতি কানুনগো ও সুধাপ্রিয় মল্লিক তাদেরও—

কিরীটীর কথা শুনে বিস্ময়ে মহান্তি মস্ত বড় এক হাঁ করে। একেবারে স্তব্ধ। কোন 'রা' নেই। অনেকক্ষণ পর ঢোক গিলে বলে, তবে?

কি তবে?

সকলকেই তাহলে—

নিশ্চয়ই। সকলকার ওপরেই আপনার নজর রাখতে হবে যাদের—যাদের এইমাত্র আমি নাম করলাম। তারপর একটু থেমে কিরীটী বলে, মিঃ মহান্তি, এই দেখুন সি-সাইড হোটেলের কালী সরকার যে দুটো ঘর নিয়ে থাকত সেই ঘরের পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে মোটামুটি একটা প্ল্যান আমি খাড়া করেছি—বলতে বলতে কিরীটী আমাদের সামনে একটা কাগজ মেলে ধরে।

দেখলাম কাগজটায় একটা নকশা আঁকা আছে।

কিরীটী বলে, ৭ ও ৮নং ঘর নিয়ে ছিল কালী সরকার। ৬নং ঘরে ছিল রামগতি কানুনগো—৯নং ঘরে সুধাপ্রিয় মল্লিক আর ১৩নং ঘরে থাকেন আমাদের রামানুজ দাস মশাই।

একটু থেমে আবার কিরীটী বলে, রামগতি কানুনগো আর সুধাপ্রিয় মল্লিক—রামানুজের সঙ্গে সঙ্গে ওদের সম্পর্ক যতটা জানা যায় জানতে চেষ্টা করুন এবং এই যাদের সব নাম করলাম ইনক্লুডিং আমাদের লতিকা গুঁই—আপাততঃ এই কয়জনের প্রত্যেকের উপর নজর রাখবেন এবং ওদের জানিয়ে দেবেন বিনানুমতিতে কেউ ওরা পুরী শহর ছেড়ে বাইরে যেতে পারবেন না।

বেশ। তাই হবে।

অতঃপর মহান্তি বিদায় নিল।

কিরীটী আর এক দফা চায়ের অর্ডার দিল। চা পানের পর বললে, চল সমুদ্রের ধারে গিয়ে খানিকটা ঘোরা যাক। কালী সরকার সকাল থেকে স্কন্ধারূঢ় হয়ে মাথা ধরিয়ে দিয়েছে। একেই বলে বরাত—বুঝলি সুব্রত। এলাম পুরীর সমুদ্রকে উপভোগ করতে ক'টা দিন, তা না পঁচিশ বছর বাদে এক কালী সরকার এসে আবির্ভূত—

কেন তুই ত বলিস ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙ্গে—

যা বলেছিস—নে চল।

॥ আট ॥

পরের দিনই দ্বিপ্রহরে পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেল।

কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়। শ্বাস বন্ধ করেই কালী সরকারের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে—জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়নি।

রিপোর্টটা নিয়ে এসেছিল মহান্তিই। সে বলে, শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে সত্যিই কিন্তু একটু সন্দেহ ছিল মিঃ রায়। হয়ত ষ্ট্রাঙ্গুলেশান নয়। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আপনার অনুমানটা একেবারে নির্ভুল! আরো একটা সংবাদ আছে মিঃ রায়—

কি?

লতিকা গুঁই নিরুদ্দেশ হয়েছে।

আমি বলি, সে কি—কোথায় গেল জানতে পারলেন না কিছু?—

না—আজ সকাল থেকে তার কোন পাত্তা নেই। কাল রাত্রেও এগারটার সময় হোটেলের চাকর তাকে তার ঘরে দেখেছিল। আজ সকালে আর নাকি তাকে দেখা যায়নি। সুটকেশ আর বিছানাটা ঘরের মধ্যে আছে এবং ঘরের বাইরে থেকে তালা দেওয়া—

কিরীটী এবারে কথা বলে, রাত এগারটা পর্যন্ত তাহলে সে হোটেলে ছিল?

হ্যাঁ। রাত দশটার সময় নাকি রেণুকা বিশ্বাস তার সঙ্গে দেখা করত যায় ঐ হোটেলে।

কে—কে গিয়েছিল দেখা করতে?

রেণুকা বিশ্বাস।

হুঁ। তাহলে রেণুকা বিশ্বাস নিশ্চয় জানে লতিকা গুঁই কোথায়। চলুন, এখুনি একবার সি-সাইড হোটেলে যাবো।

এখুনি যাবেন!

আরো আগে যাওয়া উচিত ছিল। খবরটা আপনি কখন জানতে পারেন যে লতিকা গুঁই চলে গিয়েছে?

সকালেই। যে লোকটা হোটেলের সামনে প্রহরায় ছিল তার কাছে।

রাত্রে সেই হোটেলের সামনে কেউ প্রহরায় ছিল না?

ছিল। কিন্তু সে বলছে একমাত্র রেণুকা বিশ্বাস ছাড়া রাত দশটার পর কাউকে হোটেলে যেতে বা আসতে দেখেনি।

হোটেল থেকে বেরুবার অন্য কোন রাস্তা নেই?

আছে। পিছনের দিকে মেথরদের যাতায়াতের রাস্তা।

তাহলে সেই রাস্তা দিয়েই সে সরে পড়েছে।

আপনার কোন রকম কিছু সন্দেহ হয় মিঃ রায়?

সি-সাইড হোটেলের দিকে যেতে যেতে মহান্তি কিরীটীকে প্রশ্ন করে। কিরীটী চলতে চলতেই বলে, কি সন্দেহ?

ঐ লতিকা গুঁই কালী সরকারের হত্যার ব্যাপারে—

সন্দেহের তালিকার মধ্যে লতিকা গুঁই ত অন্যতমা—কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন মিঃ মহান্তি।

হরডন বিশ্বাস হোটেলে ছিল না, বাজারে গিয়েছিল।

তবে রেণুকা বিশ্বাস ছিল। সে তার ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে বসে কাঁটা দিয়ে লেসের মত কি একটা বুনছিল, আর তার পাশে বসেছিল ২৬।২৭ বৎসরের একটি সুশ্রী যুবক।

মহান্তিই দরজার বাইরে থেকে গলার সাড়া দেয়, ভিতরে আসতে পারি?

কে!

আমি মহান্তি।

আসুন।

আমরা ভিতরে ঢুকতেই যুবকটি উঠে দাঁড়ায়।

এ ছেলেটি কে মিসেস বিশ্বাস? মহান্তিই প্রশ্ন করে।

রেণুকা বিশ্বাস বলে, সাধন সরকার। সরকারের ভাইপো। আমাদের টেলিগ্রাম পেয়ে আজই সকালের এক্সপ্রেসে এসেছে। তুমি যাও সাধন, তোমার ঘরে যাও—

কিরীটী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, সাধনবাবু হোটেলের বাইরে যাবেন না কিন্তু আপনি—ঘরেই থাকবেন। আপনার সঙ্গে আমাদের কথা আছে—আমরা আপনার ঘরে আসছি।

সাধন সরকার কোন জবাব দিল না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

অতঃপর কিরীটীই প্রশ্ন শুরু করে, আপনি কাল শুনলাম লতিকা দেবীর হোটেলে রাত দশটার পর তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন?

কি বলছেন আবোল-তাবোল? লতিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি আমি কাল রাত্রি দশটার পর!

যাননি আপনি?

নিশ্চয়ই না।

কিন্তু আপনাকে আমাদের লোক দেখেছে—মহান্তি বলে।

মাথা খারাপ—কাকে দেখতে কাকে দেখেছে।

কিরীটী কথা বলে, আপনি তাহলে যাননি?

নিশ্চয়ই না।

আর ইউ সিয়োর?

নিশ্চয়ই।

কাল রাত্রে ঐ সময় কোথায় ছিলেন?

কেন এখানে আমার নিজের হোটেলে। রাত আটটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত বোর্ডারদের খাওয়া-দাওয়ার পাট না চোকা পর্যন্ত আমার কি নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় থাকে।

সাড়ে দশটার পর?

হোটেলেই ছিলাম।

একটা কথা আপনার জানা দরকার মিসেস বিশ্বাস—কালী সরকারকে সত্যি সত্যিই শ্বাস বন্ধ করে হত্যা করা হয়েছে—

তাই নাকি!

হ্যাঁ—আচ্ছা মিসেস বিশ্বাস—

বলুন?

আপনার সঙ্গে একসময় কালী সরকারের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল, তাই না?

কিরীটীর মুখ থেকে কথাটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেণুকা বিশ্বাস ওর মুখের দিকে তাকায় এবং কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে বলে, কি জানতে চান আপনি মিঃ রায় বলুন ত? হোয়াট আর ইউ ড্রাইভিং এ্যাট?

আমার কথাটা ত অস্পষ্ট নয় মিসেস বিশ্বাস! আপনার সঙ্গে এক সময় তার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল।

দেখুন প্রশ্নটা আপনার অত্যন্ত ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে না কি মিঃ রায়! মিসেস বিশ্বাসের কণ্ঠস্বরের যেন বেশ বিরক্তির সুর।

নিশ্চয়ই হচ্ছে। কিন্তু এটাও নিশ্চয়ই ভুলে যাচ্ছেন আপনি মিসেস বিশ্বাস, আমরা একটা মার্ডার কেসের তদন্ত করছি—এবং সেই মার্ডারটা আপনারই এই হোটেলের মধ্যে একটা ঘর হয়েছে। কিরীটীর কণ্ঠস্বরটাও যেন কঠিন বলে মনে হয়।

কি বলতে চান আপনি? আমার হোটেলে মার্ডার হয়েছে মানে?—

আপনার হোটেলেই মার্ডার হয়েছে কালী সরকার সে রাত্রে। তারপর তাকে হত্যা করে মৃতদেহটা সুইসাইড প্রমাণ করবার জন্য, সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

না, না—আপনি—

শুনুন মিসেস বিশ্বাস, সে রাত্রে ঠিক যা ঘটেছে তাই বললাম এবং আপনিও যে সেটা জানেন না তাও নয়।

আমি!

হ্যাঁ—আপনিও সেটা জানেন। শুনুন, সে রাত্রে কালী সরকার মার্ডার হয় অনুমান রাত একটায় এবং সম্ভবতঃ তাকে নিদ্রার ঘোরে ফাঁস দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

গলায় ফাঁস দিয়ে?

হ্যাঁ—এবং খুব সম্ভবতঃ তাকে পূর্বেই চায়ের সঙ্গে কোন কড়া ঘুমের ঔষধ পান করান হয়েছিল সেটা প্রমাণিত সহজেই হবে হয়ত তার স্টমাক কনটেন্ট-এর কেমিক্যাল এ্যানালিসিসটা হলেই।

এ—এসব আপনি কি বলছেন?

যা বলছি জানবেন তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। নির্মম সত্য। এবারে আপনি বলুন সে রাত্রে রাত বারটা থেকে দুটো, এই দু'ঘণ্টা আপনি কি করছিলেন?

রাত বারটা থেকে দুটো ঘুমাচ্ছিলাম।

ঘুমাচ্ছিলেন?

হ্যাঁ।

বেশ। সে রাত্রে শেষ কখন আপনি কালী সরকারের ঘরে যান?

সে রাত্রে আমি যাইনি তাঁর ঘরে।

কিন্তু আমি জানি আপনি গিয়েছিলেন।

না।

ইয়েস, গিয়েছিলেন। বলুন কখন গিয়েছিলেন এবং কতক্ষণ সেখানে ছিলেন?

আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আপনার ঐ কথায় মিঃ রায়—সহসা হরডন বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

চমকে আমরা ফিরে তাকালাম দরজার দিকে। হরডন বিশ্বাস ঠিক দরজার উপর দাঁড়িয়ে। সে যে ইতিমধ্যে কখন ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে আমরা টেরও পাইনি।

আপনি প্রতিবাদ জানাচ্ছেন? কিরীটী বলে।

হ্যাঁ—অত্যন্ত আপত্তিকর কথা।

কিন্তু আপত্তিকর হলেও কথাটা সত্য জানবেন মিঃ বিশ্বাস। কিরীটী শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়।

অসম্ভব। কারণ আমি জানি ঐ সময় সে রাত্রে আমার স্ত্রী আমার পাশে শুয়েই

নিদ্রা যাচ্ছিল।

কিন্তু আমি যদি বলি মিঃ বিশ্বাস আপনার স্ত্রী কালী সরকারের ঘরে সে রাত্রে গিয়েছিলেন। আপনি নেশার ঘোরে টের পাননি। টের পাবার মতও আপনার সে সময় অবস্থা ছিল না—

রাবিশ—

রাবিশ! আপনি ড্রিঙ্ক করেন না?

করবো না কেন। করি। কিন্তু তাই বলে—

মিঃ বিশ্বাস—বিশ্বাস করা না করা ব্যাপারটা আপনার ইচ্ছা। তাছাড়া আপনার স্ত্রীর ওপরে কোন রিফ্লেকশন করবার আমি চেষ্টা করিনি। যা ঘটেছিল সে রাত্রে তাই বলেছি।

আপনি কি বলতে চান মিঃ রায়, আমার স্ত্রী রাত দুপুরে হোটেলের একজন বোর্ডারের ঘরে গেল আমার অজ্ঞাতে আর তার চরিত্রের ওপরে সেটা একটা রিফ্লেকশন নয়?

কিন্তু আপনি ত নিশ্চয়ই জানেন এক সময় আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ঐ কালী সরকারের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল।

অল ট্র্যাশ। আমি ওকে দীর্ঘ দশ বছর ধরে জানি। তবে হ্যাঁ, এক সময় ঐ কালী সরকারের স্কুলে আমার স্ত্রী কিছুদিন কাজ করেছিল। সে সময় একটু আধটু পরিচয় হয়ত ওর সঙ্গে হয়েছিল। কারণ আমি শুনেছিলাম—সেক্রেটারী হলেও উনি প্রায়ই স্কুলে আসতেন, এবং—

বলুন, থামলেন কেন! কি বলছিলেন বলুন!

ওর নারী-সম্পর্কে বরাবরই একটা দুর্বলতা ছিল।

আপনি তাহলে জানতেন ব্যাপারটা মিঃ বিশ্বাস?

জানতাম বৈকি।

বেশ। মিসেস বিশ্বাস এবারে আপনি বলুন ত—সে রাত্রে শেষ কখন চা দিয়ে আসা হয় কালী সরকারকে? কারণ আমি জানি, সে ঘন ঘন চা-পান করত।

আমি জানি—হরডন বিশ্বাস বলে ওঠে, রাত তখন পৌনে এগারটা হবে। ও রান্নাঘরে একটু ব্যস্ত ছিল। রামানুজ এসে চায়ের কথা বলায় আমিই নিজে এক কাপ চা তৈরী করে তাকে দিয়ে আসতে বলি ঘরে।

তৈরী করেছিল কে চা-টা? আপনি নিজে?

না—মানে আমার স্ত্রীই করে দিয়েছিল।

নিশ্চয়ই চা পানের পর খালি চায়ের কাপটা তার ঘর থেকে রামানুজ সে রাত্রে নিয়ে আসেন নি?

না। আমি যতদূর জানি চা-টা দিয়ে চলে এসেছিল সে।

তবে কে সেই কাপটা নিয়ে এলো ঘর থেকে। মিসেস বিশ্বাস আপনি?

আ-মি—না—আ-মি কেন আনব! হয়ত কোন চাকর-বাকরই—

কোন চাকর সাধারণতঃ তার ঘরে যেত?

রঘুয়া।

ডাকুন তাকে।

সে ত নেই!

কোথায় সে!

কালই তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছি, হরডন বিশ্বাস বলে।

চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন—কেন?

সে আমার ঘর থেকে পঞ্চাশটা টাকা চুরি করেছিল।

থানায় রিপোর্ট করেছিলেন?

না।

কেন?

গোলমাল হবার ভয়ে। তাছাড়া হোটেলের চাকর চোর—ব্যাপারটা বোর্ডারা জানতে পারলে খারাপ হবে তাই—

মিসেস বিশ্বাস আপনি যখন পরের দিন সকালবেলা ৮নং ঘরে যান, চায়ের কাপটা দেখেছিলেন?

না।

হুঁ—আপনার ভাই রামানুজ কোথায়?

ওর মাছ ধরার বাতিক আছে। এ সময়টা প্রায়ই ও নুলিয়াদের সঙ্গে নৌকায় চেপে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। আজও গিয়েছে।

রামানুজ আপনার নিজের ভাই?

হ্যাঁ।

আপন মায়ের পেটের?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—

আপনার চেয়ে বয়সে কত ছোট?

তা অনেক হবে।

কত?

পনের ষোল ত হবেই।

আপনার এখন বয়স কত?

বিয়াল্লিশ হবে।

ফরটি টু?

ঐ রকমই হবে—বলে মাথাটা নীচু করল রেণুকা।

॥ নয় ॥

এখানে আসবার আগে—কিরীটী আবার প্রশ্ন করে, আপনার ভাই কোথায় ছিল?

কলকাতায়। ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দেয় মিসেস রেণুকা বিশ্বাস।

কি করত সেখানে?

কোন একটা মিলে যেন সামান্য চাকরি করত।

লেখাপড়া কতদূর করেছে?

সামান্যই।

মিঃ বিশ্বাস, সাধন সরকারকে একবার ডাকুন ত।

হরডন বিশ্বাস তখনই গিয়ে সাধন সরকারকে ডেকে নিয়ে এল।

বসুন সাধনবাবু—

সাধন সরকার চেয়ারটায় বসে।

আপনি এখনো শোনেন নি বোধহয় যে আপনার কাকা কালী সরকার—

উনি আমার কাকা নন—জ্যেঠামণি। সাধন বলে।

ও। তা আপনার জ্যেঠামণি হ্যাজ বিন ব্রুটালি মার্ডারড্।

চমকে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে সাধন সরকার—বলে, সে কি! তবে যে মিসেস বিশ্বাস বলছিলেন জ্যেঠামণি সমুদ্রে সুইসাইড করেছেন।

না—তাকে হত্যা করা হয়েছে। নিষ্ঠুর পৈশাচিকভাবে ফাঁস দিয়ে শ্বাস রোধ করে হত্যা করা হয়, তারপর তাঁর দেহটা সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই প্রমাণ করবার জন্য যে, তিনি নিজেই আত্মহত্যা করেছেন।

সাধন সরকার একেবারে বোবা। বিমূঢ়। বিহ্বল। পাথর।

সাধনবাবু—একটু পরে কিরীটী আবার ডাকল সাধন সরকারকে।

সাধন সরকার মুখ তুলে তাকাল—

রামানুজ দাশকে আপনি চেনেন?

হ্যাঁ।

কতদিন চেনেন?

অনেক দিন। আমাদের কলকাতার বাসায় জ্যেঠামণির কাছে ত ও প্রায়ই আসত।

প্রায়ই আসত কেন?

তা জানি না। তবে জ্যেঠামণিকে মধ্যে মধ্যে রামানুজকে টাকা দিতে দেখেছি।

আর উনি মিসেস বিশ্বাস। উনি যেতেন না?

যেতেন।

প্রায়ই?

না, তবে যেতেন।

শেষ কবে ওকে দেখেন আপনার জ্যেঠামণির কাছে যেতে?

মাস পাঁচেক আগেও ত দেখেছি ওকে।

সে সময় রামানুজ সঙ্গে ছিল ওর?

না।

লতিকা গুঁই নামে কোন মহিলাকে আপনি চেনেন?

চিনি।

তাকেও কি আপনি আপনার জ্যেঠামণির কাছে যেতে দেখেছেন?

হ্যাঁ।

কোথায়?

আমাদের জুয়েলারী দোকানে দোতলায় জ্যেঠামণির বিশ্রামের দুটো ঘর ছিল, সেইখানে প্রায় ছুটির দিনেই দুপুরে তিনি আসতেন।

আপনার জ্যেঠামণির কোন উইল আছে জানেন?

উইল!

হ্যাঁ।

ঠিক বলতে পারব না। আমাদের সলিসিটার গিরীন সিংহ বলতে পারবেন। হি ইয়ুজড্ টু ডিল উইথ্ হিস অল ম্যাটার্স।

হুঁ। ঠিক আছে। মিঃ বিশ্বাস, আপনার শ্যালক এলে অতি অবিশ্যি থানায় একবার পাঠিয়ে দেবেন। কথাটা বলে কিরীটী যেন কিছুক্ষণ কি ভাবে, তারপর সহসা উঠে দাঁড়ায়। মহান্তির দিকে তাকিয়ে বলে, চলুন মিঃ মহান্তি। আমার যা জানবার জানা হয়ে গিয়েছে। লেট আস গো।

কথাটা বলে আমাকে চোখের ইঙ্গিত করে বের হয়ে যায় সোজা ঘর থেকে। আমি ওকে অনুসরণ করি।

থানাতেই এলাম আমরা।

সারাটা পথ কিরীটী একটা কথাও বলেনি। অসম্ভব গম্ভীর বুঝতে পারি। ভিতরে ভিতরে কিরীটী অত্যন্ত উত্তেজিত। তা সে যে কারণেই হোক।

থানায় পৌঁছে চেয়ারে বসে. কিরীটী বললে, চা বলুন মিঃ মহান্তি।

নিশ্চয়—

মহান্তি হন্তদন্ত হয়ে উঠে গেল।

চা পানের পর একটা চুরুট ধরিয়ে ধীরে ধীরে ধূমপান করতে করতে কিরীটী বলে, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন সে-রাত্রে কি ভাবে কালী সরকারকে হত্যা করা হয়েছিল?

না—ঠিক—

এখনো বুঝতে পারেন নি! সুব্রত—

পেরেছি কিছুটা। হত্যাকারী প্রস্তুত হয়েই কাজে নেমেছিল।

সত্যিই তাই। কিরীটী বলে, প্রথমে চায়ের সঙ্গে ঘুমের ঔষধ দিয়ে কালী সরকারকে ঘুম পাড়ায়। তারপর সময় বুঝে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে কালী সরকারের ঘরে প্রবেশ করে। একটা কার্ড বা সিল্কের মজবুত রিবনের মত কিছুর সাহায্যে স্ট্রাঙ্গল করে তাকে শ্বাস বন্ধ করে হত্যা করে। তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে ডেড বডিটা কাঁধে করে ঐ রাস্তা দিয়েই হোটেল থেকে বের হয়ে এসে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেয়। ইউ ওয়াজ ডেড অফ নাইট। মধ্যরাত্রি। কেউ কোথাও জেগে নেই। কিন্তু হত্যাকারী দুটো মারাত্মক ভুল করেছিল।

ভুল!

হ্যাঁ। ১ম, ব্যাপারটা সুইসাইড প্রমাণ করার জন্য যে ভাবে ঠিক হত্যা করেছিল ঠিক সেই ভাবেই মৃতদেহটা জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবং ২য় ছদ্মবেশ ধরে—

কি—কি বললেন মিঃ রায়!

হ্যাঁ মিঃ মহান্তি। একবার নয়, দু-দু'বার সে ছদ্মবেশ ধরেছে ঐ রাত্রে এবং সেই ছদ্মবেশেই দু'জনার সঙ্গে দেখা করেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, একজনের অন্তত তার ছদ্মবেশের আড়ালে পরিচয়টা জানা উচিত ছিল। কিন্তু তার চাইতেও যেটা বেশী আমার কাছে পাজলিং মনে হচ্ছে এখনো—কেন—কেন হত্যাকারী তাকে হত্যা করল! হোয়াট ওয়াজ দি মোটিভ বিহাউন্ড? কি উদ্দেশ্য ছিল ; সেইটা জানতে পারলেই—

তাহলে আপনি হত্যাকারী কে তা ধরতে পেরেছেন মিঃ রায়? উত্তেজনায় যেন মহান্তির গলা বুজে আসে।

পেরেছি বৈকি।

কে—কে?

চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করুন। দূরেরও নয়। খুব ঝাপসা, অস্পষ্টও নয় সে। কাছের মানুষ।

কিন্তু কিরীটীর কথাটা শেষ হলো না—বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল।

তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠ ঃ ডোন্ট টাচ মি—আমি নিজেই যাচ্ছি।

দরজার দিকে আমরা তিনজনে এক সঙ্গে তাকালাম।

একজন প্লেন ড্রেস অফিসার ও দু'জন কনস্টেবল সমভিব্যাহারে লতিকা গুঁই এসে ঘরে প্রবেশ করল।

রুক্ষ মাথার চুল। সমস্ত চেহারা, পোশাক যেন এলোমেলো।

ঘরে ঢুকেই লতিকা গুঁই বলে, আমি জানতে চাই হোয়াট অল দিস? এসবের মানে কি? কেন ওরা আমাকে খুড়দা রোড থেকে ধরে নিয়ে এলো! হোয়াই?

বসুন লতিকা দেবী—কিরীটীই বলে, আপনি মিথ্যে চটছেন। ওদের কোন দোষ নেই। দারোগা সাহেবের অর্ডার মত ওরা—

সাট আপ—গর্জে ওঠে লতিকা ঃ অর্ডার। কিসের অর্ডার? আমি কি চোর-ছ্যাঁচোড় না খুনী যে আমকে এমনি করে বেঁধে নিয়ে এলো ওরা?

আপনি মিথ্যে উত্তেজিত হচ্ছেন। ব্যাপারটা আপনি বুঝবার চেষ্টা করুন লতিকা দেবী। মহান্তি বলে।

কি বুঝব শুনি? বুঝবার এর মধ্যে আছেটা কি! বলুন কেন আমাকে ধরে এনেছেন?

আপনাকে বলা সত্ত্বেও হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে হোটেল ছেড়ে চলে গেলেন কেন?

বেশ করেছি গিয়েছি। একশবার যাবো।

বেশ যাবেন। আপনাকে আমরা আটকাবো না যদি আমাকে কতকগুলো প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেন। কিরীটী এবারে বলে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে লতিকা বলে, আপনি কি মনে করেছেন আমি কালীকে হত্যা করেছি?

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে লতিকার গলার স্বরটা কেমন যেন ভার ভার হয়ে ওঠে।

কিরীটী বলে, না—

তবে! তবে—এসবের মানে কি!

বললাম ত সেদিন ভাল করে আপনি আমাদের সঙ্গে কথাই বললেন না। তাহলে এ গোলমালটা হতো না—

কি জানতে চান আপনারা?

ঠিক জবাব দেবেন ত?

ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম। বলুন কি জানতে চান?

সে রাত্রে কখন আপনি হোটেল ছেড়ে চলে যান?

রাত একটার পর পিছনের দরজা দিয়ে। হঠাৎ কাউকে না বলে চলে গেলেন কেন?

যাবো না ত কি করব—কালীর মত মরে জলে ভাসব—

কি বললেন! দেন সাম ওয়ান থ্রেটেন্ট ইউ! ভয় দেখিয়েছিল কেউ আপনাকে!

লতিকা চুপ।

কি—বলুন! চুপ করে রইলেন কেন?

লতিকা তথাপি চুপ।

লতিকা দেবী—

আঃ, আমি কিছু জানি না, জিজ্ঞাসা করবেন না।

বেশ।

কিরীটী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে এবং চুপ করে থাকার পর আবার শুরু করে, লতিকা দেবী, রামানুজকে জানেন?

কে?

রামানুজ...রেণুকা বিশ্বাসের ভাই।

রেণুর ভাই!

হ্যাঁ।

আমি ত জানি না—রেণুর কোন ভাই কোনদিন ছিল বলে। কখনো শুনিও নি।

আর ইউ সিয়োর? আপনি যা বলছেন ঠিক বলছেন?

মিথ্যা বলব কেন!

কিরীটী আবার চুপ করে রইলো। কি যেন ভাবতে লাগল।

লতিকা দেবী, আপনার ত কালী সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের পরিচয়—

ডোন্ট টক এ্যাবাউট হিম এ্যানি মোর? তিক্ত ঘৃণা যেন লতিকার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে, ঐ নোংরা লোকটা সম্পর্কে কোন আলোচনাই আর আমি করতে চাই না! এখন বুঝতে পারছি, এই ওর প্রাপ্য ছিল। হি হ্যাজ বিন রাইটলি সার্ভড। যে ওকে গলা টিপে মেরেছে সে খুব ভাল কাজ করেছে।

এ আপনি কি বলছেন লতিকা দেবী? মহান্তি বিস্ময়ের সঙ্গে বলে।

ঠিকই বলছি। আমি আগে যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম ঐ মেয়েমানুষটা এখানে এসে হোটেল খুলেছে, আর সেই হোটেলে ও এসে উঠেছে, এখানে, আমি কি পা দিতাম! কখনো দিতাম না। কিন্তু কেন, কেন আপনারা আমাকে এখানে জোর করে ধরে নিয়ে এসে এভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছেন বলুন ত! কি করেছি আমি আপনাদের! কি করেছি!

লতিকা গুঁই শেষ পর্যন্ত যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ল।

কিরীটী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আপনাকে আর আমরা ধরে রাখব না। আপনি যেতে পারেন। তবে অনুগ্রহ করে যদি অন্তত আজকের রাতটা যে হোটেলে আপনি ছিলেন সেই হোটেলে থাকেন—কাল যেখানে আপনি যেতে চাইবেন, আমাদের লোক গিয়ে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

জলে ভেজা দৃষ্টি তুলে তাকাল লতিকা গুঁই কিরীটীর মুখের দিকে, কিন্তু—

ভয় নেই আপনার। কেউ আপনার গায়ে যাতে এতটুকু আঁচড় না কাটতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা করবো।

কিন্তু আপনি—!

আমি জানি লতিকা দেবী, কে আপনাকে সে রাত্রে, প্রাণের ভয় দেখিয়েছিল।

আ—আপনি জানেন!

জানি—কিন্তু আর দেরী করবেন না—যান আপনি হোটেলে।

লতিকা গুঁই ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ দশ ॥

কিরীটী বললে, এবারে আমরাও গাত্রোত্থান করব মহান্তি সাহেব। কিন্তু আজ রাত্রে আপনাকে একটু প্রস্তুত থাকতে হবে।

প্রস্তুত থাকতে হবে!

হ্যাঁ।

কি ব্যাপারে?

লতিকা গুঁইয়ের ভীতি বা আশঙ্কাটা মিথ্যা নয়। হত্যাকারী তার উপরে নির্ঘাত এ্যাটেম্পট্ নেবে।

সত্যি তাই মনে করেন আপনি!

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন?

আমার মনে হচ্ছে যেহেতু উনি হত্যাকারীর এমন একটা পরিচয় জানেন—যেটা আমাদের কাছে ভাঙ্গলেন না, জানি না বলে গোপন করে গেলেন, সেটা সর্বসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ুক, এটা হত্যাকারী নিশ্চয়ই চায় না।

কি সে পরিচয়?

পরিচয়টা হচ্ছে আসলে সে কে! কিন্তু আর দেরি করা চলবে না। বেলা এখন প্রায় পৌনে পাঁচটা। সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছয়টার মধ্যে আমি একটা ট্রাংককল কলকাতা থেকে এক্সপেক্ট করছি।

ট্রাংককল! কার? প্রশ্নটা করলাম আমিই।

কালী সরকারের সলিসিটারের। চল। তারপরই ঘুরে তাকাল কিরীটী বিজয় মহান্তির দিকে, বলল মহান্তি সাহেব, লতিকা দেবীর হোটেলে পাহারা রাখবেন। প্লেন ড্রেস পুলিশ রাখবেন। আর রাত এগারটায় আমার হোটেলে আসবেন। চলি—বের হয়ে এলাম আমরা থানা থেকে।

সি-সাইড হোটেলের কাছাকাছি এসেছি, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা সাইকেল রিক্সায় চেপে রামানুজ যাচ্ছে।

কিরীটী রামানুজকে দেখে হাতের ঈশারায় থামতে বলল।

রিক্সাটা থামল।

আজ রামানুজের পরনে একটা আমেরিকান প্যাটার্নের ড্রেন পাইপ প্যান্ট ও চিত্রবিচিত্র একটা সিল্কের হাওয়াই সার্ট।

মুখে চিউয়িং গাম ছিল বোধহয়। অনবরত চিবুচ্ছে।

রামানুজ সাহেব যে—কোথায় চলেছেন!

থানায় গোয়িং।

থানায়?

হ্যাঁ—দিদির কাছে শুনলাম আপনিই ত অর্ডার করেছেন থানায় যেতে আমাকে। কিন্তু হোয়াই বলুন ত!

কোথায় গিয়েছিলেন আপনি দুপুরে?

ফিসিং করতে সিতে। নাইস। চলুন না একদিন।

বেশ ত। যাওয়া যাবে।

আচ্ছা রামানুজ সাহেব, মনে হচ্ছে কি একটা বাংলা ফিল্মে অনেকটা আপনার মত একজনকে দেখেছিলাম—আপনি কি কখনো—?

কিরীটীর কথা শেষ হয় না।

একগাল হেসে ফেলে রামানুজ, ইউ ঠিকই কট মি। ধরেছেন ত ঠিক। ইয়েস।

একজন কমেডিয়ান হিসাবে আমার নাম আছে।

তাহলে আপনি একজন অভিনেতা বলুন?—চিত্রাভিনেতা—ফিল্ম আর্টিস্ট—?

হেঁ—হেঁ—ঠিক ধরেছেন—রাইটলি কট।

আচ্ছা যান, আপনাকে আর আটকাব না। থানাতেই যাচ্ছেন ত?

হ্যাঁ।

রামানুজ চলে গেল।

আমি তখনো সেই দিকে তাকিয়ে। কিরীটী শুধায়, কিরে—কি দেখছিস?

একটা ক্লাউন। মৃদু কণ্ঠে বললাম।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, হ্যাঁ, কোন প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনে হঠাৎ আসা কোন বসন্ত রজনীর একটি ফল।

কি বললি?

চল, কিছু না। বড্ড চায়ের পিপাসা পেয়েছে। একটু পা চালিয়ে চল।

ঠিক সাড়ে ছয়টায় কিরীটীর ট্রাংককল এলো। ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রায় সাত মিনিট কিরীটী কালী সরকারের সলিসিটারের সঙ্গে কথা বলে বেশ হৃষ্ট চিত্তেই ঘর থেকে বের হয়ে এল। মুখে পরিতৃপ্তির হাসি।

বলি, কি ব্যাপার?

হারানো সূত্রটি মিলে গিয়েছে রে।

কিসের হারানো সূত্র!

মার্ডারের উদ্দেশ্যটা। অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। উদ্দেশ্যটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

পেয়েছিস?

হ্যাঁ। আমি একটু বেরুচ্ছি। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরব! কথাটা বলে কিরীটী বের হয়ে গেল।

মনে হলো, বাইরে খুশি-খুশি হলেও ভিতরে ভিতরে সে যেন বেশ উত্তেজিত।

রাত সাড়ে এগারটায় আমি, কিরীটী ও মহান্তি লতিকা গুঁইয়ের হোটেলের দিকে চললাম।

যেমন যেমন বলেছিলাম, সেই ভাবে ব্যবস্থা করেছেন ত মিঃ মহান্তি!

অন্ধকার রাত। বীচের রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির আলো জ্বলছে বটে। কিন্তু সে আলো এতই সামান্য যে থাকা না থাকা বোধহয় দুই সমান। অন্ধকারে সমুদ্র দেখা যায় না বটে, তবে গর্জন শোনা যাচ্ছে। বীচের একেবারে গোড়ায় ফ্ল্যাগস্টাফের কাছে একটু ভিতরের দিকে লতিকার হোটেলটা। বীচে একটি জনপ্রাণী নেই। ঐ সময় থাকার কথাও নয়।

পিছনের দরজা-পথে আমরা নিঃশব্দে হোটেলে প্রবেশ করলাম। একতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছিল। কিরীটী বললে চুপি চুপি, ঐটাই লতিকার ঘর।

দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ।

হঠাৎ কানে কথা এলো নারী কণ্ঠ এবং লতিকার কণ্ঠ।

দাঁড়াও—আমি জানতাম তুমি আসবে।

নারী কণ্ঠে জবাব এলো, জানতে!

হ্যাঁ। জানতাম। আর কেন যে এসেছো। তাও জানি।

তবে ত খুবই ভাল।

এগিয়ো না। এগিয়ো না বলছি! স্টপ—স্টপ।

কিন্তু লতিকার কথা শেষ হলো না। সহসা একটা শব্দ—

কিরীটী যেন ছুটে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল দরজার উপর এবং আমাকেও বললে, সুব্রত ইউ মাস্ট গেট ইন। দরজাটা ভাঙ্গ। মহান্তি কুইক—

তিনজনের মিলিত চাপে দরজাটা ভেঙ্গে পড়ল।

হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে তিনজনে ঢুকে পড়ি। দেখি শয্যার উপর পড়ে আছে লতিকা, আর এক নারী তার উপরে ঝুঁকে রয়েছে তখনো।

কিরীটীই ছুটে গিয়ে এক ঝটকায় সেই দ্বিতীয় নারীকে সরিয়ে দিয়ে লতিকার গলা থেকে সিল্কের রিবনের ফাঁসটা টেনে খুলে ফেলল তাড়াতাড়ি।

লতিকা নেতিয়ে পড়ে আছে তখনো শয্যার ওপরে।

দ্বিতীয় নারী তখন ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কিরীটী গর্জে ওঠে, নো ইয়ুজ পালাবার চেষ্টা এখন বৃথা।

মহান্তির বিস্ময় বিস্ফারিত কণ্ঠ থেকে বের হয়, একি, মিসেস বিশ্বাস?

কিরীটী বলে, না।

না—মিসেস বিশ্বাস নয়?

না—তার ছেলে রামানুজ।

রামানুজ! রেণুকা বিশ্বাসের ছেলে!

হ্যাঁ। খুব দক্ষ অভিনেতা রামানুজ। মিসেস বিশ্বাসের ছদ্মবেশে প্রথম রাত্রে উনিই এখানে এসেছিলেন এবং সেই সময়ই লতিকা দেবী ওকে চিনতে পারে—আর তাই রামানুজ ওকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে যায়।

বিচিত্র এক নাটক।

রামানুজ হচ্ছে কালী সরকার ও রেণুকার জীবনের কোন এক বসন্ত-রজনীর ফল। কিরীটীই বলতে থাকে, প্রথম দিন দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, কারণ রামানুজের কটা চুল, কটা চোখ ও গৌর গাত্রবর্ণ রেণুকার মত হলেও মুখের গঠনটা অবিকল 'কালী সরকারের মত এবং কথাটা যে সত্য সে সম্পর্কে আমি স্থির নিশ্চিত হই আজই সন্ধ্যায় কালী সরকারের সলিসিটারের সঙ্গে কথা বলে। কালী সরকারের উইলে লেখা আছে পুরীর সি-সাইড হোটেলের একমাত্র মালিক কালী সরকার নিজে।

সে কি! মহান্তি বলে ওঠে, হোটেলটা তবে—

না। আসলে হোটেলটা কালী সরকারের। রেণুকা বিশ্বাসের সঙ্গে একটা চুক্তিপত্র আছে। যদিও সবাই জানে রেণুকা ও হরডন বিশ্বাসই হোটেলের মালিক। যাই হোক, যা বলছিলাম, ঐ হোটেলটা রামানুজ দাশকে দিয়েছে লেখা আছে।

রামানুজ ঐ সময় চেঁচিয়ে ওঠে, মিথ্যে কথা!

কিরীটী বলে, মিথ্যে কথা নয়। তোমার জননী দেবী ঐখানেই ভুল করেছে রামানুজ সাহেব। পাছে হোটেলটি হাতছাড়া হয়ে যায় কালী সরকারের মৃত্যুর পর, কালী সরকারকে নিয়ে এসে কৌশলে সে রাত্রে তোমাকে দিয়ে হত্যা করিয়ে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেয়—এ্যান্ড ইউ ফুল—ইউ কিলড ইয়োর ওন ফাদার—নিজের বাপকে তুমি হত্যা করেছো—যে বাপ তোমার ভালটাই চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

॥ এগার ॥

মহান্তি শুধায়, আপনি কি রামানুজকে প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলেন মিঃ রায়?

হ্যাঁ। তাকে দেখবার পর থেকেই বলতে গেলে। তবে সন্দেহটা ঘনীভূত হয় আপনার মুখ থেকে রেণুকার ইতিহাসটা শোনবার পর।

কেন! কেন ওকে সন্দেহ করলেন?

প্রথমতঃ ও আমার চোখে ধুলো দিতে পারেনি। কারণ ওকেই আমি হত্যার আগের দিন বৈকালে সমুদ্রতীরে কালী সরকারের সঙ্গে যখন প্রথম দেখি—

তবে কি—

হ্যাঁ। ও-ই দোলগোবিন্দ শিকদার—পার্ল মার্চেন্ট। মানুষকে একবার দেখলে বড় একটা আমি ভুলি না। পরের দিন হোটেলে ওকে দেখে তাই আমি চমকে উঠেছিলাম। দ্বিতীয়তঃ ওর মুখের সঙ্গে কালী সরকারের মুখেরও একটু ক্লোজ রিজেমব্লেন্স দ্বিতীয় দিন আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হয়েছিল কোথায় যেন একটা আশ্চর্য রকমের মিল, একটা সাদৃশ্য আছে কালী সরকারের মুখের সঙ্গে ঐ রামানুজের মুখের। মনের চমকের সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রতি দৃষ্টিটা আমার আরো আকর্ষিত হয়। রং, চুল,

চোখ সব রেণুকার মত, অথচ চেহারার আশ্চর্য রকম আদল কালী সরকারের মত এবং এও বুঝতে আর আমার বাকি ছিল না রামানুজ যেই হোক, দোলগোবিন্দ শিকদার ও রামানুজ এক এবং অভিন্ন।

একটু থেমে কিরীটী একটা সিগার ধরাল—সিগারে একটা মৃদু টান দিয়ে পুনরায় বলতে শুরু করে, কিন্তু এখনো ব্যাপারটা আমার কাছে একটা মিষ্ট্রিই রয়ে গেল। কালী সরকার কেন হঠাৎ রামানুজ সম্পর্কে আমার কাছে মিথ্যা কথা বলতে গেল।

হয়ত এমনও হতে পারে, পাছে তোর মনে কোন রকম কোন কিউরিয়োসিটি রামানুজ সম্পর্কে না জাগে তাই একটা মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ওর ব্যাপারটা তোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে চাপা দিতে চেয়েছিল।

কথাটা যে আমারও মনে হয়নি সুব্রত তা নয়। কিন্তু কেন—কি প্রয়োজন ছিল তার! তবে কি সে তার বিপদ এ্যাপ্রিহেন্ড করতে পেরেছিল?

হয়ত।

তাই যদি হবে তে সে সাবধান হলো না কেন নিজে?

সাবধান!

হ্যাঁ। সাবধান হওয়া উচিত ছিল তার নিজের চা-পান সম্পর্কে।

কি বলতে চাস তুই কিরীটী? আমি প্রশ্ন করি।

মনে আছে নিশ্চয়ই তোদের সে-রাত্রে চা-টা রেণুকা বিশ্বাস তৈরী করে দিলেও রামানুজ চা-টা কালী সরকারের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল! হরডন বিশ্বাসের কথা থেকেই আমরা জেনেছি।

মনে আছে।

আমার মনে হয় সেই সময়ই চায়ের সঙ্গে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দেয় রামানুজ।

তাহলে রেণুকা বিশ্বাস নয়? মহান্তি প্রশ্নটা করে।

না সে মিশোয়নি। আমি অবিশ্যি বুঝেছিলাম মিঃ মহান্তি—রেণুকাকে ঘিরে আপনার সন্দেহটা সব চাইতে বেশী দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু আমার তা হয়নি।

কেন?

তার কারণ রেণুকার মত এক স্ত্রীলোকের পক্ষে একজন বয়স্ক পুরুষকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনি তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে হত্যার ব্যাপারের সঙ্গে সে যে জড়িত সেটা তার জবানবন্দী থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কালী সরকারের মৃত্যুর ব্যাপারটা জানবার সঙ্গে সঙ্গে সে গিয়ে কালী সরকারের ঘরে তালা দিতে যায়নি, গিয়েছিল ঘরের মধ্যে যদি কোনরকম সন্দেহজনক কিছু রামানুজ ফেলে এসে থাকে, সেটা সরিয়ে ফেলবার জন্য।

কেন?

কারণ সে ভাবতেই পারেনি, যে দেহটা তারা সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছে রাত্রির অন্ধকারে—নির্মম ভাগ্যের ফলে সেই দেহটাই আবার নুলিয়াদের হাতে

দিয়ে ফেরত এলো সমুদ্রের জল থেকে। তাই ভয় হয়েছিল তখন যদি ব্যাপারটা হত্যা বলে কারো সন্দেহ হয় এবং পুলিশ শেষ পর্যন্ত নাড়া-চাড়া করে ব্যাপারটা নিয়ে, তাহলে যেন-কোন প্রমাণ তারা ঘরে না পায়। চায়ের কাপটাও হয়ত সেই কারণেই সরিয়ে ফেলেছিল রেণুকা বিশ্বাস।

তারপর?

তারপর আর কি—ঘুমের ঔষধের প্রভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে দেখেই মধ্য রাত্রে কোন এক সময় রামানুজ গিয়ে ঘরে ঢোকে এবং নির্মমভাবে একটা চুলের রিবন গলায় ফাঁস দিয়ে নিজের জন্মদাতা বাপকে হত্যা করে মায়ের অনুরোধে। পাছে হোটেলের সম্পত্তিটা হাত ছাড়া হয়ে যায়, এই ভয়েই হত্যা করালো রেণুকা কালী সরকারকে। অথচ ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস দেখ—কালী সরকার সজ্ঞানেই সে-সম্পত্তি রামানুজকে দিয়ে গিয়েছিল উইল করে—পাকাপোক্ত ভাবে। রিয়্যালি ইট ইজ এ্যান আইরনি অফ ফেট।

রেণুকা বিশ্বাস স্বীকার করল রামানুজের জন্ম-বৃত্তান্ত। কিন্তু রামানুজকে যেমন সে কথা জানতে দেয়নি, তেমনি হরডন বিশ্বাসও জানতে পারেনি।

রক্তগেরুয়া

॥ এক ॥

পুজোর ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায় ভাবছি, কিরীটীই প্রস্তাবটা উত্থাপন করলে, চল কাশী যাওয়া যাক।

কাশী!

হ্যাঁ, শিউশরণ আছে সেখানে, ক'টা দিন মন্দ কাটবে না।

অতএব ঐদিনই রাত্রের ট্রেনে দুখানা সেকেন্ড ক্লাস টিকিট কেটে দুজনে কাশীর পথে রওনা হলাম।

যাত্রার পূর্বে শিউশরণকে একটা 'তার'ও করে দেওয়া হল, আমরা যাচ্ছি।

অসিঘাটের কাছেই দারোগা বন্ধু শিউশরণের বাড়ি। শিউশরণ বিহারী। কিন্তু বিহারী হলে কি হয়, বহুদিন ধরে বাংলাদেশে বাস করে ও ডাল-ভাত খেয়ে এখন সে পুরোদস্তুর একজন বাঙ্গালীই বনে গেছে, চমৎকার বাংলা বলতে পারে সে। মৃতদার। একটি চার বছরের ছেলে ও বুড়ী পিসী সংসারে।

তোফা আনন্দে ও ভোজনের মধ্য দিয়ে সময় কাটতে লাগল।

দিন চারেক বাদে সকালবেলা শিউশরণ কোথায় বের হয়েছে।

আমাদের যে ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছে সেখান হতে গঙ্গার দৃশ্যটা ভারী চমৎকার। গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য স্নানার্থীর ভিড়। আমি আনমনে জনবহুল ঘাটের দৃশ্য দেখছি, আর কিরীটী একটা ইজিচেয়ারে বসে একমনে সেদিনকার লীডার' সংবাদপত্রটা পড়ছে।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে শিউশরণ ঘরে প্রবেশ করল।

কিরীটী খবরের কাগজের উপর দৃষ্টি রেখেই মৃদু হেসে বললে, কি ব্যাপার? তুমি যে ভাবে ঘরের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলে, তাতে মনে হচ্ছে বিশেষ একটা গুরুতর ব্যাপারে তুমি যেন অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছো।

হ্যাঁ ভাই, চিন্তিত একটু হয়েছি বটে, জবাব দিল শিউশরণ।

আমিও শিউশরণের দিকে ফিরে তাকালাম। কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট উত্তেজনার আভাস।

কেন হঠাৎ চিন্তিত হবার কি এমন কারণ ঘটল? কিরীটী প্রশ্ন করল। তারপর হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, চেয়ে দেখ সুব্রত, শিউশরণ অনেকখানি পথ সাইকেল হাঁকিয়ে এসেছে। বোধহয় অনেকদূর কোথাও গিয়েছিল।

আমি কিরীটীর কথায় অবাক হয়ে শিউশরণের দিকে আর একবার ভালো করে তাকালাম।

কিন্তু আমি যে সাইকেল হাঁকিয়ে এলাম তা তুমি কেমন করে জানলে? যাবার সময়ও তো আমি বাইক নিয়ে যাইনি, টাঙ্গায় গিয়েছিলাম।

কিরীটী একটু হেসে বললে, তোমার চেহারাতেই তার বেশ প্রমাণ দিচ্ছে যে। শুধু চোখ মেলে দেখতে জানলেই তার হদিস মেলে।

তুমি কি যাদুবিদ্যা শিখেছ নাকি আজকাল, রায়?

ওরে বাবা, যাদুবিদ্যা অভ্যাস করা আমার পোষাবে না, ওসব আমাদের বন্ধুবর যাদুসম্রাট মিঃ সরকারের জন্যেই তোলা থাক।—হাসতে হাসতে জবাব দিল কিরীটী।

তবে?

এ তো অতি সহজেই ধরা যায় বন্ধু। তুমি যদি টাঙ্গায় ফিরতে, তবে তোমার শরীরে এত ঘাম দেখা দিত না এবং তোমার মাথার চুলেও এত ধুলো জড়িয়ে থাকত না। এতেই প্রমাণ হয় তুমি টাঙ্গায় আসনি। টাঙ্গায় যদি না এসে থাক তবে কিসে আসতে পার? হয় ঘোড়ায়, না হয় বাইকে। হেঁটে এলে এত ধুলো তোমার মাথার চুলে ও কপালের ঘামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকত না। আমি জানি তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান না—তাহলে সহজেই প্রমাণ হয়, তুমি বাইকে এসেছ। তাছাড়া কাশীর রাস্তায় তো ধুলোর অভাব নেই।

আশ্চর্য। কিন্তু সত্যিই, বাইকেই এসেছি! যাক গে। একটা ভীষণ ব্যাপার ঘটেছে। বলরাম মুখুজ্জে নামে এক মস্তবড় ধনীকে হঠাৎ তার ঘরে মৃত অবস্থায় কয়েকদিন আগে পাওয়া গিয়েছিল।

কিরীটী সোজা হয়ে উঠে চেয়ারটার উপর ভাল করে বসল।

এমন সময় শিউশরণের ব্লাড হাউন্ড টম্ ঘরে ঢুকে শিউশরণের পায়ের কাছে থাবা পেতে বসল।

শিউশরণ বলতে লাগল, আজ মর্গের রিপোর্ট পেলাম। বললাম মুখুজ্জে নাকি অনাহারে মারা গেছেন।

তারপর?—আমি প্রশ্ন করলাম!

বললাম মুখুজ্জের প্রায় সত্তর হাজার টাকা জীবন-বীমা ছিল। তাছাড়া লোকটি অবিবাহিত, পাটের দালালী, ফাট্‌কার বাজার প্রভৃতিতেও অনেক লাভ করে বহু টাকা রেখে গেছেন ভদ্রলোক এবং শুনলাম মরবার আগে নাকি একটা উইলও করে গেছেন, আর সেটাও একটু বিচিত্র ধরনের।

কি রকম? কিরীটী প্রশ্ন করে।

উইলে নাকি লেখা আছে বলরাম মুখুজ্জের মৃত্যুর পর চারজন নাগা সন্ন্যাসী ওর সম্পত্তি পাবে। আজ সকালের ট্রেনে জীবন-বীমা কোম্পানীর লোক এসেছে বলরামবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে। সেই ভদ্রলোক বলছেন, বলরামবাবুর মৃত্যুর মধ্যে নাকি একটু গোলমাল আছে। তাদের মতে বলরামবাবু নাকি স্বাভাবিক অবস্থায় অনাহারে মারা যায় নি। হয় তিনি আত্মহত্যা করেছেন, না হয় কেউ তাঁকে অন্য কোন উপায়ে মেরেছে।

তোমার কি মনে হয়? কিরীটী প্রশ্ন করে!

আমার তো মনে হয় না। শিউশরণ বলতে লাগল, তাই তো অকুস্থানটা দেখতে গিয়েছিলাম, তাছাড়া পুলিশ সার্জেনের রিপোর্টও যখন 'অনাহারে মৃত্যু'।

হঠাৎ এক সময় আবার শিউশরণ বলে, চল না, দুপুরে একবার জায়গাটা দেখে আসবে।

বেশ তো চল। বসেই তো আছি।

আমিও সোৎসাহে সম্মতি জানাই।

॥ দুই ॥

অতএব সেই দিনই দুপুরে একটা টাঙ্গায় করে কিরীটী, শিউশরণ ও আমি অকুস্থান পরিদর্শনে রওনা হলাম।

টাঙ্গায় যেতে যেতে কিরীটী প্রশ্ন করে, আচ্ছা বলরামবাবুর উইল অনুসারে কে সব নাগা সন্ন্যাসী না কারা টাকাকড়ি পাবে বলেছিলে না তুমি?—তা এত লোক থাকতে হঠাৎ নাগা সন্ন্যাসীদের উপরে লোকটার মমতা উথলে উঠল কেন বল তো?

কি জানি! শুনলাম আজ কয়েকমাস ধরে জনাচারেক নাগা সন্ন্যাসী নাকি

বলরামবাবুর বাসায় এসে আড্ডা গাড়ে। বলরামবাবু চিরকালই একটু অদ্ভুত প্রকৃতির—জপ-তপ-নিয়েই কাটাতেন। বলরামবাবুকে সেদিন তাঁর ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তার আগের দিন সকালেই নাকি তিনজন সন্ন্যাসী চলে যায়, তারা আর ফেরেনি। বাকী একজন এখনও তাঁর বাড়িতেই আছে। তাকে যেতে দেওয়া হয় নি, আটক করা হয়েছে।

অকুস্থান।

শহরে একধারে একটা খোলা জায়গায় বলরামবাবুর বাড়ি। বাড়িটা আগে একজন পূর্ববঙ্গের জমিদারের ছিল, বলরামবাবু তাঁর কাছ হতে কিনে নেন। মস্ত বড় ফটকওয়ালা একতলা বাগান বাড়ি। বাড়িতে মস্ত মস্ত গোটা চারেক হলঘর। তাছাড়া চাকর-বাকরদের থাকবার জন্যও গোটা দুই ঘর ও রান্নাঘর। যে ঘরে বলরামবাবুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, আমরা সেই ঘরে এসে ঢুকলাম। মস্তবড় হলঘর। এটা বাড়িটার একেবারে এক ধারে। ঘরটা বোধহয় গুদাম ঘর-টর হিসাবে ব্যবহার করা হত, একটা দরজা ব্যতীত একটিও জানালা নেই ঘরে। ঘরের ছাদে চৌকোভাবে খানিকটা ফাঁক—বোধহয় আলো আসবার জন্য, তার চারিদিকে কাচের জানালা বসান, সেটা স্কাই লাইটের কাজ করে। সেই ফাঁকটার চারপাশে লোহার রড দেওয়া। ঠিক তার নীচে লোহার একটা খাট। খাটের উপর তোশক পাতা। বিছানার চাদরটা এক পাশে কুঁচকে পড়ে আছে।

ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের উপরে ডিশে শুকনো রুটি-মাখন, কাচের জগে খানিকটা দুধ নষ্ট হয়ে জমাট বেঁধে আছে! রুটি-মাখনের দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, কেউ সেগুলো ছোঁয়নি পর্যন্ত।

মাত্র চারদিন আগে এই ঘরে বলরামবাবুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

ঘরের মেঝেতে এক রাশ ধুলো জমে আছে।

কিরীটী নাগা সন্ন্যাসীকে ডেকে পাঠাল। সে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার সঙ্গে বলরামবাবুর সর্বশেষ দেখা হয় কখন?

দিন দশেক আগে, সকালে। তিনি যোগের দ্বারা একটা অদ্ভুত শক্তিলাভের চেষ্টা করছিলেন। তাই তিনি মাঝে মাঝে এই নির্জন ঘরে এসে যোগ-সাধনা করতেন। পাঁচ-ছদিন ধরে যোগে বসবার আগে কি একটা দ্রব্য পান করতেন। এবারেও যোগে বসেছিলেন, কিন্তু ছ' দিনেও যখন তিনি ঘর হতে বের হলেন না, তখন সন্দেহ হওয়ায় আমরা পুলিশ ও ডাক্তারকে খবর দিই। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেখে যে, তিনি মৃত অবস্থায় বিছানার উপর পড়ে আছেন।

কথা শুনতে শুনতে কিরীটী মেঝের দিকে তীব্র-দৃষ্টিতে চেয়ে কী যেন দেখছিল। আমার বললে, দেখেছ সুব্রত, কেউ খাটটাকে টেনে ঘরের কোণ থেকে মাঝখানে এনেছে। খাটের পায়ার নীচেকার লোহার চাকার দাগ মেঝের ধুলোতে এখনো স্পষ্ট রয়েছে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য কর—খাটটা এখন যেখানে রয়েছে, তার আগেই

ধুলোর উপরে খাটের পায়ার চাকার দাগ এসে শেষ হয়ে গেছে—যেন কেউ খাটটাকে এই পর্যন্ত টেনে এনে তার পর হঠাৎ উঁচু করে তুলে ওইখানে বসিয়ে দিয়েছে। চল, ঘর দেখা হয়ে গেছে।—বলে কিরীটী উপরের ছাদের দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। তারপর বাড়ির একজন ভৃত্যের দিকে চেয়ে হঠাৎ আবার প্রশ্ন করল, তোমাদের বাবু বুঝি খুব সাহসী ছিলেন?

আজ্ঞে না, বাবু বরং ঠিক উল্টো, বেজায় ভীতু ছিলেন।

বাইরে এসে কিরীটী বাড়ির চার পাশটা আর একবার দেখে নিল।

হঠাৎ এক জায়গায় বাড়ির পিছন দিককার দেওয়ালের গা ঘেঁসে দুটো বড় বড় গর্তের দিকে কিরীটী আবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, কি বিশ্রী দুটো গর্ত দেখেছ, কিন্তু মইটা কই?

মই! কি বলছ তুমি?—আমি বললাম।

হ্যাঁ, মইটা খুঁজে দেখ, আশেপাশে কোথাও পাব। আমরা আসার কয়েকদিন আগে এখানে বৃষ্টি হয়েছিল শিউশরণ?

তা হয়েছিল দিন আষ্টেক আগে, কিন্তু কেন?

এমনি। আচ্ছা বাবু যে এমনি চার-পাঁচ দিন এর আগেও ওই ঘরে গিয়ে কাটিয়ে দিতেন, তখন কিছু খেতেন-টেতেন না?—কিরীটী বলরামবাবুর ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করল।

আজ্ঞে না। তাঁর কঠিন নিষেধ ছিল, তাকে ওঘরে থাকার সময় কেউ বিরক্ত করতে সাহস পেত না। ওই সময় তিনি কি একটা বলকারক ওষুধ খেতেন।

ওঃ! চল হে শিউশরণ, বাড়ি ফেরা যাক।

ব্যাপার কিছু বুঝলে?

হ্যাঁ। খুব সহজ, বলরামবাবুকে কিছুটা অনাহারে ও কিছুটা ভয় দেখিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বাড়ি চল, সব বলব।

সকলে এসে আবার টাঙ্গায় উঠলাম।

পথে শিউশরণ থানার সামনে কি একটা কাজে নেমে গেল।

॥ তিন ॥

বাড়িতে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

রাত্রি প্রায় আটটায় শিউশরণ ফিরে এল এবং এসে বলল, আবার এক ঝঞ্ঝাট।

কি হল?

আর বল কেন সেই নাগা সন্ন্যাসীটি কিছুক্ষণ আগে কেমন করে প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে পিটটান দিয়েছে।

কিরীটী হাসতে হাসতে বলল, এ আমি জানতাম। আমারই ভুল হয়েছিল, তখনই তাকে হাজতে রাখতে না বলা। যাকগে তোমার ব্লাড হাউন্ট টম্ রয়েছে, সন্ন্যাসীর যদি কোন জামা-টামা পাও তবে সেটা শুঁকিয়ে ওকে নিয়ে এগিয়ে যাও, তা হলেই শ্রীমানের কিনারা পাবে!

শিউশরণ তখনই বের হয়ে গেল টম্‌কে নিয়ে।

পরের দিন সকালে ক্লান্ত শিউশরণ ফিরে এল সন্ন্যাসীটির মৃত্যু সংবাদ নিয়ে। টম্ তার জামার গন্ধ শুকে ঠিকই তাকে খুঁজে বের করেছিল, কিন্তু তার আগেই কে বা কারা তাকে ছোরা মেরে খুন করে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের তলায় ফেলে রেখে গেছে। শিউশরণ মৃতদেহ পুলিসের জিম্মা করে দিয়ে ফিরে এসেছে।

আমাদের অনুরোধে কিরীটী বললে, ঘরের ভিতরে ঢুকেই একটা জিনিস আমার নজরে পড়ল যা তোমাদেরও দেখিয়েছি। ধুলোর বুকে খাটের পায়ায় চাকার দাগটা—খাটটা বর্তমানে যেখানে আছে তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ খাটটা ঘরের ঠিক মাঝখানে। সাধারণতঃ লোকে খাটটাকে দেওয়ালের ধারে নিয়ে গিয়েই ঘুমোয়, ঘরের মাঝখানে পেতে ঘুমোয় না। তৃতীয়তঃ ঘরের ঠিক মাঝখানে ছাদের চৌকা ফাঁক—যেখানে স্কাই লাইটের বন্দোবস্ত আছে—তার চারপাশে লোহার রড বসান। চতুর্থতঃ, বলরামবাবু ছিলেন ভীতু। পঞ্চমতঃ, নাগা সন্ন্যাসীরা সংখ্যায় চারজন। ষষ্ঠতঃ, তিনি ধনী ছিলেন। সপ্তমতঃ তাঁর বাড়ির পিছন দিককার দেওয়ালের গা ঘেঁষে মই বসানোর দাগ ছিল। অষ্টমতঃ, নাগা সন্ন্যাসীদের তিনজন উধাও, একজন রইল। নবমতঃ, তিনি যোগে বসবার আগে একটা উত্তেজক দ্রব্য পান করতেন। দশমতঃ, নাগা সন্ন্যাসীটা আগেই চাকর বাকরদের না ডেকে ডাক্তার ও পুলিশকে খবর দেয়। ব্যস এখন মিলিয়ে যাও। যোগে বসবার আগে বলরামবাবু যে উত্তেজক দ্রব্যটি পান করতেন, সেটা নিশ্চয়ই কোন মাদক দ্রব্য এবং এবারে হয়তো সন্ন্যাসীরা তার মধ্যে এমন কোন দ্রব্য কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল, যাতে ভদ্রলোকের ঘুমটা বেশ গাঢ়ই হয়। তারাই হয়তো তাকে পরামর্শ দিয়েছিল, দিনের বেলা দরজা বন্ধ করলে যাতে সূর্যের আলো পাওয়া যায়, তাই খাটটাকে ঘরের মাঝখানে স্কাই লাইটের নীচে এনে রাখতে।

তারপর রাত্রে যখন তিনি ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন ঘরের পিছনে মই লাগিয়ে ছাদে উঠে চারজন নাগা সন্ন্যাসী চারটে হুক সমেত দড়ি নামিয়ে খাট সমেত ঘুমন্ত বলরামবাবুকে ধীরে ধীরে উপর দিকে তুলে নিয়েছে এবং খাটটাকে উপরে তুলে কোন উপায়ে তারা বলরামবাবুর মুখ বন্ধ করে ঐভাবেই উপরে খাট সমেত ঝুলিয়ে রেখেছে! বেচারী ভীতু মানুষ চেঁচাতেও পারেন নি, লাফিয়ে মেঝেতে নামতেও পারেন নি। ফলে ভয়ে, উৎকণ্ঠায় ঐভাবে থেকে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটেছে বেচারীর।

তারপর তারা মৃতদেহ সমেত খাটটা আবার মেঝেতে নামিয়ে দড়িটা খুলে নিয়েছে, খাটটা নামিয়ে মেঝেতে যখন রাখে তখন ঠিক মেঝের যেখান হতে খাটটা

তুলে নেওয়া হয়েছিল সেখানে রাখতে পারেনি। ফলে বর্তমানে খাট যেখানে আছে, তার সঙ্গে আগেকার খাটের পায়ার দাগের ঘটেছে বিচ্ছিন্নতা।

তারপর লোকটা যদি ওভাবে না-ই মারা যেত তাহলে বিছানার চাদরটা অমন কুঁচকে খাটের এক কোণে পড়ে থাকত না। লোকটা হয়তো ছট্‌ফট্‌ করেছে, তাই চাদরটা অমন কুঁচকে গেছে। তারপর দেখ, সন্ন্যাসীরা যদি এর মধ্যে না-ই থাকত, তবে তিনজন পালিয়ে একজনকে ব্যাপারটা দেখবার জন্যে রেখে যেত না। একজন সন্ন্যাসী ছিল যাতে তাদের কারও উপরেই লোকের সন্দেহ না পড়ে। সন্ন্যাসী ঘরের 'কী-হোল' দিয়ে আগে সব দেখে নিয়ে পরে পুলিশ আর ডাক্তারকে খবর দিয়েছে কেন না তার জানা ছিল এসব ব্যাপারে ওই দুই জনের বেশী দরকার। লোকটা আগাগোড়া সব জানত বলেই এইভাবে কাজ করেছিল। নচেৎ একটা চেঁচামেচি করে বাড়ির চাকর-বাকরদেরই আগে জড়ো করত। একেই বলে গেরুয়ার রক্তের দাগরা বলতে পার রক্ত-গেরুয়া।

আশ্চর্য তোমার চোখের দৃষ্টি কিরীটী!—শিউশরণ বললে।

কিরীটী মৃদু হেসে একটা সিগার ধরাল। বাতাসে তখন সন্ধ্যা-আরতির সুর ভেসে আসছে।

দৃষ্টি সকলেরই আছে শিউশরণ, তবে সেটার প্রয়োগ-বিধি জানা প্রয়োজন।—বলে কিরীটী আবার সিগারেটটায় একটা মৃদু টান দিয়ে ধুমোদ্‌গীরণ করলে।

চিতাবাঘ

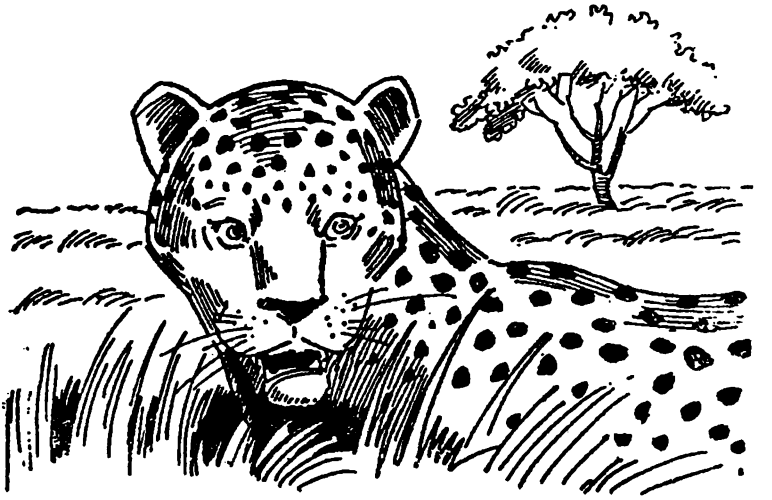

॥ এক ॥

স্টাফ্ রিপোর্টারের নিজস্ব রিপোর্ট পরের দিন শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৈনিক কাগজ "রাজপথে" এ প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

কলিকাতা, হাওড়া ও ব্যারাকপুর অঞ্চলের প্রায় সমস্ত বিজলী বাতি নিভিয়া গিয়া সোমবার কলিকাতা নগরী সহসা নিষ্প্রদীপের অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল। পথে ম্লান গ্যাস বাতিগুলো কেবল মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল ইত্যাদি।

সংবাদটা সকলেই জানেন কারণ গত রাত্রে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় দীর্ঘ প্রায় অর্ধঘণ্টাব্যাপীকাল সময় অকস্মাৎ যখন আলোকোজ্জ্বল কলিকাতা শহরের সর্বত্র বিজলী বাতিগুলি নিভে গিয়ে জনসাধারণকে স্তম্ভিত, হতচকিত করে দেয়। মুহূর্তে অন্ধকারের মধ্যে সব বিহ্বল হয়ে ব্যবসাপত্র কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হন—সে এক বিশ্রী অভাবনীয় পরিস্থিতি।

কিন্তু আগের দিনের ঐ অর্ধঘণ্টাব্যাপী নিষ্প্রদীপের অন্ধকারে শহরের একাংশে বেলেঘাটা অঞ্চলে, একটি ত্রিতল, নব্যকেতায় নির্মিত বাটীর ত্রিতলের একটি কক্ষে যে ঘটনাটি ঘটেছিল রাজপথের স্টাফ রিপোর্টার সে সংবাদটি কিন্তু পান নি!

সংবাদটি প্রকাশিত হল পরের দিন সংবাদপত্রে।

গত সোমবারের অর্ধঘণ্টাব্যাপী নিষ্প্রদীপের মধ্যে অন্ধকারে, মল্লিক পুস্তক প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী এবং সুবিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ী

রতিকান্ত মল্লিক মহাশয়ের তাঁর বেলেঘাটাস্থিত আপন বাটীর শয়ন কক্ষে রহস্যময় মৃত্যু।

বেলেঘাটা অঞ্চলের সেই ত্রিতল বাটীর তিনতলার একটি কক্ষে, অর্ধঘণ্টাব্যাপী নিষ্প্রদীপের পরে আবার যখন শহরের সর্বত্র বিজলী বাতি জ্বলে উঠল, দেখা গেল, পৌঢ় রতিকান্ত মল্লিকের নিষ্প্রাণ দেহটি মেঝের উপর উপুর হয়ে পড়ে আছে।

মৃতের দুটি বাহু সম্মুখের দিকে প্রসারিত, ডান হাতের মুষ্টির মধ্যে ধৃত কয়েকগাছি চুল ও বাম হাতের মুষ্টির মধ্যে ধৃত এক পয়সা দামের ছোট একটি অর্ধদগ্ধ মোমবাতি—ক্যান্ডেল।

রতিকান্তের পরিধানে মিহি তাঁতের সরুপাড় ধুতি ও গায়ে দামী আদ্দির ফতুয়া। ঘরের আসবাবের মধ্যে খান দুই চেয়ার উল্টে পড়ে আছে। আর উল্টে পড়েছিল ঘরের এক কোণে চিতাবাঘের মূর্তিটা। মৃত একটি চিতাবাঘের ছাল খড় ইত্যাদির সাহায্যে সেলাই করে অবিকল একটি চিতাবাঘ তৈরী করা হয়েছিল এবং সেটি ঐ কক্ষেরই এক কোণে রক্ষিত থাকত বহুকাল হতেই।

মৃতের কটিদেশে কাপড়ের কিছু অংশ পুড়ে গেছে বলেই মনে হয় এবং পৃষ্ঠদেশে একটা দেড় ইঞ্চি পরিমাণ দৈর্ঘ্য ও অর্ধ ইঞ্চি পরিমাণ প্রস্থ—কালসিটার দাগ ছিল। ইহা ব্যতীত আর কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। মোমবাতিটি অর্ধদগ্ধ অবস্থায় মৃতের মুষ্টির মধ্যে ধৃত থাকলেও মৃতের হাত এতটুকুও দগ্ধ হয়নি। রতিকান্তবাবু কলিকাতা শহরের একজন বনেদী, নামকরা, পুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ী। মল্লিক পুস্তক প্রকাশনী—সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান লক্ষ মুদ্রার উপর কারবার বলেই জনশ্রুতি বহুদিন হতে। সমগ্র কারবারটিই রতিকান্ত তাঁর একক জীবনের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমেই গড়ে তুলেছিলেন।

রতিকান্ত মল্লিক গৌরবর্ণ, বেঁটে-খাটো, রোগাটে ধরনের লোকটি। বয়সের বলিরেখা মুখের উপরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তো বটেই এবং দেহের মধ্যেও ইদানিং বেশ ভাঙ্গন ধরেছে বলে মনে হত! টানা চোখ, চওড়া কপাল ও নাকটা একটু ভোঁতা। দেবদ্বিজে রতিকান্তের চিরদিনই অসাধারণ ভক্তি।

হরিদ্বারের কোন এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বাঘালী সন্ন্যাসীর নিকট মধ্য যৌবনেই—প্রায় দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

সমগ্র কপাল ব্যাপি নাসিকার উপরে ও ঊর্ধাঙ্গের সর্বত্র প্রত্যহ ভোরে স্নানান্তে গঙ্গামাটির তিলকে নিজেকে চিত্রিত করে ও শিশির মধ্যে রক্ষিত গুরুর পাদোদক পান না করে রতিকান্ত কখনও নীচে নামতেন না।

মুখে লোকটি অতীব মিষ্টভাষী ছিলেন তবে, কিছুদিন হতে কেন জানি না মেজাজটা তাঁর অতি অল্পতেই তিরিক্ষি হয়ে উঠত—খেঁকী কুকুরের মত খ্যাঁক্ খ্যাঁক করে খিঁচিয়ে উঠতেন সামান্য কারণেই।

ঐ সামান্য দোষটুকু ব্যতীত নিরামিষাশী, ধর্মপ্রাণ রতিকান্ত লোকটি নেহাৎ মন্দ ছিলেন না। ব্যবসায়ী মহলে অত্যন্ত সুপরিচিতই ছিলেন এককালে। তবে ইদানীং কিছুকাল তাঁর ঐ খিট্‌খিটে মেজাজের জন্য সকলে তাঁকে সযতনে পরিহার করেই চলত।

যা হোক, এমন একটি লোক রতিকান্ত, তাঁর মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত না হলেও কম আশ্চর্য হয় নি।

দুনিয়ার কত প্রকার আশ্চর্য ঘটনাই না নিত্য ঘটছে—রতিকান্তর মৃত্যুর ব্যাপারটা ও তা এমন কিইবা আশ্চর্যজনক ঘটনা।

তবে হ্যাঁ, আশ্চর্যজনক হচ্ছে মৃতের একহাতে একটি অর্ধদগ্ধ মোমবাতি ও অন্য হাতে ছিল কয়েকগাছি চুল।

পুলিশ এল তদন্তও হল।

ময়নাতদন্তের ফলে, দেহের নিম্নাংশে পশ্চাতে কেবল দেড় ইঞ্চি পরিমাণ দৈর্ঘে ও অর্ধ ইঞ্চি পরিমাণ প্রস্থে একটি কালসিটার দাগ ভিন্ন অন্য কোন আঘাতের চিহ্নই দেহের কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি।

যা হোক একথা নিঃসন্দেহে পুলিশের বিশ্বাস হয়েছে যে রতিকান্তর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়ই—অপঘাতেও মৃত্যু হয় নি।

তিনি নিহত হয়েছেন অর্থাৎ রতিকান্ত মল্লিককে হত্যা করা হয়েছে।

॥ দুই ॥

বেলেঘাটার থানা ইনচার্জ শম্ভু মিত্র। ভদ্রলোকটি দীর্ঘকাল ধরে কলিকাতা পুলিসে চাকুরি করলেও অত্যন্ত গোবেচারী ও শান্তশিষ্ট প্রকৃতির মানুষটি।

ঝামেলা বা কোন প্রকার গোলমাল আদপেই বরদাস্ত করতে পারেন না এবং নিজস্ব এলাকায় কোন সাধারণ ব্যাপার ঘটলেও যেন হিমশিম খেয়ে যান, একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়েন।

গোলগাল চেহারা, প্রচুর চর্বির বাহুল্য শরীরের সর্বত্র, মাথায় সুবিস্তীর্ণ চক্‌চকে একখানি টাক কেবল ঠিক মধ্যস্থলে মরুবক্ষে ওয়েসিসের মত আট দশ গাছি মাত্র চুল—টাকের উপরে যেন মর্মান্তিক এক রসিকতার মতই জেগে আছে।

দিন চারেক বাদে—সেদিন প্রাতে থানার মধ্যে নিজের অফিস-কক্ষে বসে শম্ভু মিত্র নিঃশব্দে টাকের উপর হাত বুলোচ্ছিলেন, ভদ্রলোক সত্যই বড় দুর্বিপাকে পড়েছেন —রতিকান্ত লোকটা আজকালকার বাজারে মরে বেঁচেছে কিন্তু শম্ভু মিত্রকে সাত হাত জলের তলে যেন একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্টটি মিত্র

সাহেবকে নিরাশায় আশা দিয়েছে, বলেছেন তাঁর সঙ্গে কিরীটী রায়ের বিশেষ পরিচয় আছে—তাঁর কাছে তিনি আজ সকালেই একবার যাবেন এবং তাঁর পরামর্শ পেলে ইত্যাদি।

ভোর বেলায় শম্ভু তার অ্যাসিস্টান্ট নিত্যরঞ্জনকে তাগিদ দিয়ে কিরীটী রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ঘন ঘন তাঁরই আশায় শম্ভু দরজার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

এদিকে ঐ সময় কিরীটীর বাড়িতে তার বসবার ঘরে চা পান করতে করতে নিত্যরঞ্জনবাবু কিরীটীকে সংক্ষেপে সমগ্র ব্যাপারটি শোনাচ্ছিলেন আর কিরীটী শুনছিল।

ঘটনাটা আনুপূর্বিক শুনে কিরীটী বললে, কিন্তু বর্তমানে বিশ্রী একটি জটিল ব্যাঙ্কের চেক জালের ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত যে, আপনাদের কেসে সময় দেওয়া তো আমার পক্ষে আদপেই সম্ভবপর হচ্ছে না নিত্যরঞ্জনবাবু। আমি অত্যন্ত দুঃখিত—মিঃ মিত্রকে আমার—

বাঁধা দিয়ে নিত্যরঞ্জন বলে, কেসের মধ্যে আপনাকে আমরাও টেনে নিয়ে যেতে চাইনা কিরীটীবাবু, কেবল মধ্যে মধ্যে আপনার মূল্যবান পরামর্শ যদি পাই—আমাদের বিশেষ সাহায্য হবে—

বেশ! তাতে আমার অবশ্য আপত্তি নেই। You are always welcome!

অশেষ ধন্যবাদ! যদি কিছু মনে না করেন কয়েকটা কথা এই কেসটা সম্পর্কে আজ জিজ্ঞাসা করতে চাই মিঃ রায়—

বলুন?

আচ্ছা, আপনি তো ব্যাপারটা সব শুনলেন এখন আপনার কি মনে হয় রতিকান্তবাবু মার্ডারড্ই হয়েছেন?

আপাতত তো তাই বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু আরো definitely সে কথা বলবার আগে আপনাকে আমি আর একবার অনুরোধ করব-রতিকান্তবাবু যে ঘরে নিহত হয়েছেন সে-ঘরটা আর একবার বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে সার্চ করতে—

একথা বলছেন কেন মিঃ রায়? ঘরটা তো already খুব ভালো করেই সার্চ করা হয়েছে!—কিন্তু—

কিন্তু বিশেষ কিছুই পান নি। নাই বা প্রথমবারে পেলেন। দ্বিতীয়বারে আবার সার্চ করে দেখতে ক্ষতি কি?

না, না ক্ষতি আর কি। বিশেষ করে আপনি যখন বলছেন—

শুধু আমি বলছি বলেই নয় নিত্যরঞ্জনবাবু, যে ঘরের মধ্যে কোন ব্যক্তি রহস্যজনকভাবে নিহত হয়, অকুস্থান সেই কক্ষটি, সেই ব্যক্তির মৃত্যুর সমগ্র রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে So very important যে, রহস্যের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত সেই জায়গা মানে সেই ঘর বা স্থানটির উপর হতে কোন ক্রমেই এক মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টিকে

আমাদের সরিয়ে নেওয়া উচিৎ হবে না। রহস্য উদঘাটনের ব্যাপারে এটাকে Priliminary laws-এর অন্যতম বলতেও পারেন।

আপনার কথাটা ঠিক, মিঃ রায়, বুঝে উঠতে পারছি না।

ধরুন সমগ্র কক্ষটি আমাদের বার বার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখা উচিত এবং সমগ্র কক্ষ বলতে আমি mean করছি—ঘরের মেঝে, দেওয়াল, ছাদ, জানালা, দরজা, আসবাবপত্র ঘরের মধ্যে দেওয়াল আলমারি থাকলে, সেই আলমারিটার প্রত্যেকটি সেলফ, ঘরের সঙ্গে যুক্ত কোন বাথরুম বা ঐ জাতীয় অন্য কোন অ্যান্টিরুম থাকলে সেই ঘরটি, পাশের কক্ষ বা বারান্দা—সব! সব কিছু বার বার করে দেখা উচিৎ! এ ধরনের খুনের ব্যাপারে কত প্রকারের সূত্রই (evidence) যে, ঘরের মধ্যে তার আশেপাশে ছড়িয়ে থাকে বা প্রথম দৃষ্টিতে অনেক সময়ই হয়তো আমাদের নজরে পড়ে না, কিন্তু পরে হয়তো সেই সূত্রের সাহায্যেই সমগ্র রহস্যটিই জলের মত সোজা হয়ে ধরা দেয়। কারণ খুনোখুনির ব্যাপারে সর্বদা একটা কথা মনে রাখবেন নিত্যরঞ্জনবাবু কোন হত্যার ব্যাপারেই যাবতীয় হত্যাসংক্রান্ত সূত্র বা চিহ্নই মুছে ফেলে একেবারে চিহ্ন-শূন্য ও নিঃসন্দেহ হতে পারে না হত্যাকারী। ক্রিমিন্যালদের সাইকোলজি অনুশীলন করলে বুঝতে পারবেন এ ঠিক ম্যাথামেটিকস্‌য়ের প্রবলেম। প্রমাণ করবার সূত্র খুঁজলেই পাবেন, কারণ সেটা প্রবলেমের সঙ্গেই জড়িত থাকে সর্বক্ষেত্রেই। তবে হ্যাঁ, আপনাকে চিন্তা, বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে খুঁজে নিতে হবে। আজ আর নয় নিত্যরঞ্জনবাবু, আর একবার ঘরটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে কাল বা পরশু যখন হোক এই সময়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, কেমন?

বেশ! আচ্ছা আজ তা হলে আসি নমস্কার।

নমস্কার।

কিরীটীর ওখান হতে ফিরে নিত্যরঞ্জনবাবু তার বড়বাবু শম্ভু মিত্রকে যখন সব খুলে বললেন, সব শুনে শম্ভুবাবু তাঁর টাকে হাত বুলোতে বুলোতে নিত্যরঞ্জন বাবুকেই পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন, তাই তো, ব্যাপারটা তাহলে কি হবে বল তো নিত্যরঞ্জন?

নিত্যরঞ্জন জবাবে কি আর বলবেন, বললেন, আপনিও তাহলে কিছুই বুঝতে পারলেন না স্যার?

কই, না!

তাহলে যাই না হয় আর একবার ঘরটাই দেখে আসি?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে শম্ভু মিত্র বললেন, তাই না হয় যাও!—হাজার হোক কিরীটীবাবু যখন বলেছেন!

পরের দিন ঠিক ঐ একই সময়ে।

কিরীটীর কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন নিত্যরঞ্জনবাবু।

কিরীটী সোফায় বসে ঐদিনকার সংবাদপত্রটা মুখের সামনে মেলে ধরে পাঠে নিরত। দোরগড়ায় নিত্যরঞ্জনের জুতোর শব্দ পেয়ে সংবাদপত্র হতে মুখ না সরিয়ে সাদরে আহ্বান জানায়, আসুন নিত্যরঞ্জনবাবু, বসুন।

নিত্যরঞ্জনবাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে একখানা চেয়ার অধিকার করে বসলেন।

তারপর আর কি সংবাদ বলুন? সংবাদপত্রটা ভাঁজ করতে করতে কিরীটী প্রশ্ন করে।

খুব ভাল করেই আপনার কথামত ঐ ঘরটাও তার পাশের ঘর দুটো আবার গতকালই সার্চ করেছি, কিন্তু—

প্রয়োজনীয় কোন কিছুরই সন্ধান এবারও পেলেন না?

আজ্ঞে তেমন কিছু—

পান নি অর্থাৎ আপনার চোখে এমন কিছুই পড়ে নি যা বর্তমান প্রয়োজনীয় সূত্র বা প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে কেমন তো? বেশ তাহলে এ সম্পর্কে কোন বলবার পূর্বে সর্বাগ্রে আমি আর একবার গতকাল আপনার মুখে যা শুনেছি পুনরাবৃত্তি করে যাই! শুনুন যদি কোন কিছু বাদ যায় ধরিয়ে দেবেন।

কিরীটী বলতে শুরু করে, রতিকান্তর বয়স পঞ্চান্ন হতে ষাটের মধ্যে চলছিল। গায়ের রঙ গৌর বর্ণ, সমগ্র কপাল ও দেহের ঊর্ধ্বাংশে নিয়মিত তিলক কাটতেন। দেব-দ্বিজে ভক্তি ছিল অগাধ, কোন প্রকার বদ-খেয়াল বা নেশা ছিল না। প্রচুর অর্থের মালিক বলেই সকলে জানে। ইদানীং শোনা যেত স্বভাবটা একটু খিটখিটে প্রকৃতির হয়ে উঠেছিল। সংসারে আপনার বলতে বহুদিন হল স্ত্রী গত হয়েছেন। দুটি ছেলে, বড় ছেলে সুধাকান্ত ও ছোট ভাই রমাকান্তই ইদানীং কিছুকাল ধরে ব্যবসা দেখাশুনা করছিল এবং মৃত্যুর বছর দেড়েক আগে হতে আবার হঠাৎ কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ রতিকান্ত পূর্বোক্তদের হাত হতে ব্যবসার সমস্ত অধিকার হরণ করে নিয়ে নিজেই সব কিছু দেখাশোনা শুরু করেছিলেন। ছোট ছেলে নিশাকান্ত তার নিজের অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত। শোনা যায় পিতার পুস্তক প্রকাশনীর সঙ্গে নাকি বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। রতিকান্তের কনিষ্ঠ—রমাকান্ত, দুই পুত্র সুধাকান্ত ও নিশাকান্ত ছাড়া সুধাকান্তর স্ত্রী ও পাঁচ ছয়টি সন্তান—নিশাকান্তর স্ত্রী ও তিন চারটি সন্তান। ছোট ভাই রমাকান্তর স্ত্রী ও দুটি সন্তান। এই নিয়েই ছিল রতিকান্তর একান্নবর্তী পরিবার এবং ইদানীং সকলেই বেলেঘাটার বাড়িতে বসবাস করেছিলেন। এই গেল ভদ্রলোকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কেমন তো?

আজ্ঞে।

তা হলে আমরা আসল ঘটনায় আসি—

কিরীটী একটু থেমে একটি সিগারে অগ্নিসংযোগ করে, কয়েকবার সিগারে মৃদু টান দিয়ে ধুমোদ্‌গীরণ করে বলতে শুরু করে তার বক্তব্য—গত সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় অর্ধঘণ্টাব্যাপী নিষ্প্রদীপের অন্ধকারে রতিকান্ত রহস্যজনকভাবে তাঁর শয়নকক্ষের মধ্যে নিহত হন এবং ব্যাপারটা প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয় ছোট ভাই

রমাকান্তর। উনি রাত্রি সাড়ে নটার সময় ব্যবসা সংক্রান্ত কোন একটা পরামর্শের জন্য দাদার কাছে গিয়ে ওর দাদাকে তার শয়নকক্ষের মধ্যে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। রমাকান্তরই চীৎকারে পরে একে একে সকলে ঘরে এসে জড়ো হয়। ঐ সময় বাড়ীর মেম্বার্সদের মধ্যে একমাত্র রতিকান্তর কনিষ্ঠ পুত্র নিশাকান্তই গৃহে ছিল না। সে ফিরে আসে ঐ দিন রাত্রে প্রায় সোয়া এগারটার সময়, এসে পিতার মৃত্যু সংবাদ পায়। বাইরের লোকের মধ্যে তিনজন ভৃত্য শ্যাম, সাধু ও মধু ওদের মধ্যে শ্যাম বহুদিন হল ঐ বাড়িতে চাকরি করছে, সাধু ও মধু প্রায় ৪।৫ বছর ধরে চাকরি করছে। পাচক বিধু আর দরোয়ান রামলাল ও বাহাদুর। এছাড়া আর একজন ঐ সময় বাইরের লোক ঐ বাড়িতে ছিল, যোগেশ—রতিকান্তর ছোট ছেলে নিশাকান্তর শ্যালক যোগেশ তার বোন নিশাকান্তর স্ত্রী নারায়ণী দেবীর সঙ্গে ঐ সময় দেখা করতে নিষ্প্রদীপের গোলমালে আটকা পড়ে যায়। যোগেশের ঐ বাড়িতে যথেষ্ট যাতায়াত আছে। বলতে গেলে ঐ বাড়ির একপ্রকার ছেলের মতই এবং বাড়ির সকলেই যোগেশকে যথেষ্ট ভালবাসত। এই গেল হত্যার সময় ঐ গৃহে যাহা উপস্থিত ছিল। তারপর আশা যাক অকুস্থানে। অকুস্থান—পুলিশ এসে দেখে রতিকান্তর মৃতদেহটা মেঝের উপর পড়ে আছে, সম্মুখের দিকে প্রসারিত দুটি বাহু তার মধ্যে ডান হাতের মুষ্টির মধ্যে ধৃত ছিল কয়েকগাছি চুল ও বাম হাতের মুষ্টির মধ্যে ধৃত ছিল অর্ধদগ্ধ ছোট একটি একপয়সা দামের মোমবাতি এবং যদিও হাতে কোন পোড়ার দাগ ছিল না। আর ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে দুখানা চেয়ার ঘরের মধ্যে উল্টে পড়েছিল এবং একটা চিতাবাঘের মূর্তি ঘরের মধ্যে যেটা এক কোণে দাঁড় করান ছিল, সেটাও উল্টে পড়েছিল মৃতদেহের সন্নিকটেই। ঘরের দরজা খোলাই ছিল—আলোটা জ্বলছিল, ঘরের মধ্যে লোহার সিন্দুকের মধ্যে টাকাকড়ি ও বহুকিছু মূল্যবান দলিলপত্রাদি ছিল যার মধ্যে কিছুই চুরি বা খোয়া যায়নি। যদিও সিন্দুকের চাবিটা রতিকান্তর কোমরে যেমন সর্বদা গোঁজা থাকত তেমনিই ছিল। পাশাপাশি আর দুটি যে কক্ষ একটি ঠাকুরঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়, দ্বিতীয়টিতে থাকে ওর ছোটভাই ও তার স্ত্রী। দোতলায় সিঁড়ির পাশের ঘরটিতেই থাকে ছোট ছেলে নিশাকান্ত এবং একতলার ঘরে ইদানীং থাকত ওর বড় ছেলে সুধাকান্ত স্ত্রী পুত্রকন্যাদের নিয়ে। নিষ্প্রদীপের অন্ধকারে ঐ অর্ধঘণ্টা সময় সকলেই যে যার ঘরে ছিল বলেই জানা যায়। এই গেল অকুস্থান ও পারিপার্শ্বিক। এবারে ঐ বাড়ির বিভিন্ন লোকগুলো সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন—

(১) রতিকান্ত—মেজাজটা ইদানিং কিছুকাল ধরে খিট্ খিটে প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিল, সহজেই বিশ্রীভাবে চটে উঠতেন, চেঁচামেচি করতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র সুধাকান্তর উপরে রতিকান্ত ইদানীং কিছুকাল আদপেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাকে অর্থাৎ সুধাকান্তকে ব্যবসার যাবতীয় কিছু হতে অধিকারচ্যুত করে ছেলেকে ও কনিষ্ঠ সহোদরকে একেবারে কোণঠাসা করে রেখেছিলেন।

(২) ছোটভাই রমাকান্ত—ইদানীং কিছুকাল ধরে দাদার সঙ্গে প্রায়ই তার

মনোমালিন্য ও খিটিমিটি চলছিল এবং কিছুদিন আগে ঐ সব নানা কারণেই রতিকান্ত তার ব্যবসা প্রাইভেট লিমিটেড ফার্মে পরিণত করে সকলকেই সমান অংশের অংশীদার করে দেন। সে ব্যাপারটা রমাকান্ত আদপেই নাকি মনঃপুত হয় নি। তার বক্তব্য—ব্যবসার গোড়াপত্তন তার বাপেরই অর্থে এবং প্রথম হতেই সে তার জ্যেষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে সঙ্গে সমানে পরিশ্রম করেছে, অতএব অন্ততঃ তার সঙ্গে অন্যান্য সকলের সমান অংশ হতে পারে না! (৩) রতিকান্তর জ্যেষ্ঠপুত্র সুধাকান্ত নির্বিরোধী স্বভাবের লোক, শান্তশিষ্ট, বিনয়ী এবং পরিবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও স্থিরমস্তিষ্ক প্রকৃতির। পিতার প্রতি অন্ধভক্তি—লেখাপড়া বেশীদূর না শিখলেও গোড়া হতেই বাপ ও কাকার সঙ্গে ব্যবসায় জড়িত থাকায় সত্যিকার ব্যবসা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিল। বছর দশেক আগে ক্রমে ক্রমে ব্যবসার যাবতীয় গুরুদায়িত্ব সুধাকান্তর, রমাকান্তর স্কন্ধেই এসে পড়েছিল এবং ক্রমে একসময় ওরাই ব্যবসার সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ কোন অজ্ঞাত কারণে সুধাকান্ত ও রমাকান্তর সমস্ত শক্তি হরণ করে রতিকান্ত আবার ব্যবসা নিয়ে বৎসর খানেক হবে (নিহত হবার পূর্বে) মেতে উঠেছিলেন। ইদানীং সুধাকান্ত চোরের মতই সমস্ত শক্তি হারিয়ে যেন নিজ গৃহে বসবাস করছিল। তথাপি কোন খেদ ছিল না মনে। পিতার প্রতি অটল ভক্তি। (৪) কনিষ্ঠ পুত্র—নিশাকান্তের নিজস্ব অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা আছে—নিজেই প্রচুর অর্থোপার্জন করে এবং ব্যবসার সূত্রে ইদানীং বড়ো বড়ো মাড়োয়াড়ী মহলে যাতায়াত আছে। শিক্ষিত, সৎচরিত্র, ভদ্র, অমায়িক। বর্তমানে নিশাকান্তই পিতার বেশী প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই হল মোটামুটি আপনার কাছ হতে গতকাল আমি যা শুনেছি—কেমন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

॥ তিন ॥

আচ্ছা এবারে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি কিরীটী বললে।

বলুন।

দেখুন যে ঘরে রতিকান্ত নিহত হয়েছেন ঐ চেয়ার দুটো এ চিতাবাঘের মূর্তিটি উল্টে পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই আপনার চোখে পড়েনি কাল—তাই তো?

আজ্ঞে।

আচ্ছা। এবারে কয়েকটা কথা এ সম্পর্কে বলব—আপনাকে আবার ঘরটা পরীক্ষা করে দেখতে বলছি এবং এবারে খুব minutely দেখতে হবে—বিশেষ করে, কোন লোহার, তামার বা ইলেকট্রিকের তার ঘরের মধ্যে খুঁজে পান কিনা লক্ষ্য রাখবেন।—আর—

আর?

হ্যাঁ, আর পরীক্ষা করে দেখবেন ঘরের মধ্যে কোন প্লাগপয়েন্ট আছে কি না। শুধু তাই নয়, তিনতলার সমস্ত ইলেকট্রিক ওয়্যারিংটাই একেবারে ভাল করে পরীক্ষা করে এসে যদি কিছু চোখে পড়ে আমায় এসে বলবেন!

বেশ!

আচ্ছা আপনি বলেছেন মৃত ব্যক্তির ডান হাতের মুষ্টিতে ছিল কয়েক গাছি চুল—ওর মীমাংসা তত কঠিন কিছু নয় কিন্তু বাম হাতের মুষ্টিতে ধৃত ছিল অর্ধদগ্ধ একটা এক পয়সা দামের মোমবাতি এবং মৃত ব্যক্তির হাতে কোন পোড়ার চিহ্ন ছিল না—তা যেন হল কিন্তু—ঘরের মধ্যে কোন দিয়াশলাই পেয়েছেন?

দিয়াশলাই! বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় নিত্যরঞ্জন কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ—দিয়াশলাই, ম্যাচ্! লোকটি নেশা ভাং করতেন না, ঘরের ইলেকট্রিক কানেকশন যখন ছিল না, তখন মোমবাতিটি তিনি জ্বালালেন কি করে—of course not be magic, মোমবাতিটি যখন জ্বালান হয়েছিল এবং প্রমাণ অর্ধদগ্ধ অবস্থায় মোমবাতিটি মৃতের মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে যখন পাওয়া গিয়াছে সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একটা দিয়াশলাই ঘরের মধ্যে থাকবে—এবং থাকাটাই উচিত ছিল। অথচ কোন দিয়াশলাই ঘরের মধ্যে তো পানই নি, মৃতের জামার পকেটেও পাওয়া যায় নি। তবে দেয়াশলাইটা কোথায় গেল? মোমবাতিটা রইল অথচ দিয়াশলাইটা উধাও হয়ে গেল কেন?—ব্যাপারটা একটু অসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে না কি?

অসঙ্গত!

হ্যাঁ, অসঙ্গত! কেবল ঘরের মধ্যে কোথাও দিয়াশলাইটাই না থাকা নয় মৃতের মুষ্টিবদ্ধ হাতে মোমবাতিটা অর্ধ্বদগ্ধ অবস্থাতেই বা ধরা থাকে কি করে। সেটাও কম অসঙ্গত ব্যাপার নয়—

আজ্ঞে আপনার কথাটা ঠিক—

বুঝতে পারছেন না! না? আমি বলতে চাইছি মৃতদেহ যখন আবিষ্কৃত হয় তার হাতে মানে মৃতব্যক্তির হাতে নির্বাপিত, অর্ধদগ্ধ একটি মোমবাতি পাওয়া যায় যা হতে দুটো জিনিস প্রমাণ হয়—১নং, মৃত ব্যক্তির হাতে পূর্ব হতেই প্রজ্বলিত মোমবাতিটি ছিল যেটা মৃত্যুর সময় আঘাত পেয়ে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় অথবা ২নং মৃত্যুর পর তার হাতে মানে মৃত ব্যক্তির হাতে হত্যাকারী রসিকতা করে অর্ধদগ্ধ নিবন্ত মোমবাতিটি গুঁজে রেখে গিয়েছে এবং শেষোক্ত explanationটি মেনে নিলে we can forget about the blessed match box. কিন্তু তা যদি না মেনে নিই তা হলে অর্থাৎ প্রথমোক্ত explanationটি মেনে নিতে গেলে আমাদের দিয়াশলাইটির কথা ভুললে চলবে না। তা হলে দুটো বস্তু হল, ১নং কোনরূপ তার ২নং দিয়াশলাই। আচ্ছা এবারে আসা যাক ৩নং অর্থাৎ ঘরের মধ্যে উল্টে পড়ে থাকা চিতাবাঘটির ব্যাপারে। দেব-দ্বিজে ভক্তিভাবাপন্ন, ফোঁটাতিলকধারী, নিরামিষাশী বৈষ্ণবগুরুর শিষ্য রতিকান্তর শয়ন কক্ষে চিতাবাঘের মূর্তি কেন থাকে! ভেবে দেখতে

গেলে এ ব্যাপারেও কি প্রচুর অসঙ্গতি নেই?

তা—তা একটু আছে।

একটু নয়, প্রচুর আছে নিত্যরঞ্জনবাবু। এবং আপনাকে ঐ চিতাবাঘের মূর্তিটি সম্পর্কে যদি কিছু রহস্য থেকে থাকে জানতে হবে। কারণ বর্তমানে রতিকান্ত হত্যা-পর্বে ঐ চিতাবাঘের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যে আছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ! এইবারে আসব আমরা চতুর্থ—৪নং পয়েন্টে। আমাদের জানতে হবে বর্তমানে মল্লিক প্রকাশনীর আভ্যন্তরীণ অবস্থাটা ঠিক কেমন ছিল? অর্থাৎ আসলে মল্লিক প্রকাশনীর অর্থনৈতিক অবস্থাটা ভাল ছিল কিনা!

কিন্তু—

আপনাকে ব্যাপারটা জানতে হবে মল্লিক প্রকাশনীর আইন পরামর্শদাতা সলিসিটারের কাছ হতে। বাইরে থেকে লাখ টাকার কারবার শোনা গেলেও I doubt very much—আমার বিশেষ সন্দেহ আছে মল্লিক প্রকাশনীর আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থাটা আসলে বর্তমানে বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়ই এবং সেই সংবাদ হতেই হয়তো আমরা রতিকান্তর বর্তমানের মানসিক অবস্থা ও তার ব্যবহারিক জীবনে আলোকপাত করতে পারব। তা যদি না হয় তা হলে আমাদের জানতে হবে, কেন বর্তমানে কিছুকাল যাবৎ, রতিকান্তর ব্যবহারটা খিট্‌খিটে হয়ে উঠেছিল, কেন তিনি সামান্য কারণেই চটে উঠতেন, ভদ্রলোকদের সঙ্গে অসঙ্গত—এক কথায় বলা যায় অভদ্রজনোচিত ব্যবহার করতেন? তারপর ৫নং পয়েন্ট আমাদের জানতে হবে কেন হঠাৎ তিনি বড় ছেলে সুধাকান্ত ও ছোট ভাই রমাকান্তর হাত হতে ব্যবসার সমস্ত কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে আবার বৃদ্ধ বয়সে নিজের হাতে ব্যবসার দায়িত্ব টেনে নিয়েছিলেন? এবারে আসব আমরা ৬নং পয়েন্টে, মল্লিকের কোন অতীত ইতিবৃত্ত আছে কিনা? কারণ অনেক সময় দেখা গেছে, অতীতের অনেক ঘটনা সংঘাতের জন্য মূল কারণ বলে বিবেচিত হয়। ৭নং পয়েন্ট—ঘটনার দিন যতক্ষণ নিষ্প্রদীপের অন্ধকারে সমস্ত শহর অবলুপ্ত হয়েছিল এবং যে সময় রতিকান্তকে হত্যা করা হয়েছে সেই সময়ে ঐ বাড়ির অন্যান্য মেম্বার্স কে কোথায় ছিল? এই প্রশ্ন-গুলোর ঠিকঠিক জবাব যদি আপনি আমাকে এনে দিতে পারেন নিত্যরঞ্জনবাবু, আপনার হত্যাকারী কে—তা আমি বলে দিতে পারব আশা করি!

এরপর একরকম কতকটা যেন বাধ্য হয়েই নিত্যরঞ্জনবাবুকে গাত্রোত্থান করতে হল।

॥ চার ॥

পরের দিন আবার নিত্যরঞ্জনবাবু গতকল্য প্রাতে উত্থাপিত কিরীটীর প্রশ্নগুলোর জবাবের অনুসন্ধানে বেলেঘাটার মল্লিক ভবনের দিকে রওনা হলেন।

গেট দিয়ে মল্লিক ভবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, মোটরে চেপে রতিকান্তর কনিষ্ঠ পুত্র নিশাকান্তর কোথায় বের হচ্ছিলেন, দেখা হয়ে গেল।

নিশাকান্ত নিত্যরঞ্জনবাবুকে দেখেই গাড়ি থামালেন, দারোগাবাবু!

এই যে! কোথাও বের হচ্ছেন বুঝি?—নিত্যরঞ্জন প্রশ্ন করেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ঝুনঝুনওয়ালা আগরওয়ালার সঙ্গে একটা কনট্রাকট, আছে—চেম্বারে যাচ্ছি!—তা আপনি—

একটু প্রয়োজন ছিল—

ও!—তারপর একটু থেমে নিশাকান্ত বললেন, বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে করোনারের জাজ্‌মেন্ট, তাহলে **death due to electric shock?**

হ্যাঁ!

কিন্তু ইলেকট্রিক শকে কি করে বাবা মারা গেলেন বুঝে উঠতে পারছি না। কি ভাবেই বা ইলেকট্রিক কারেন্ট তার শরীরে প্রবেশ করতে পারে এখনো যেন বুঝে উঠতে পারছি না। ঘরের মধ্যে কোন প্লাগ পয়েন্ট তো ছিল না—

কিন্তু পুলিশ সার্জেন ইউসুফ আলি তার ময়না তদন্ত রিপোর্টে তো তাই বলছেন! হাই ভোল্টেজের ইলেকট্রিক কারেন্ট দেহে প্রবাহিত হওয়ার দরুনই মৃত্যু ঘটেছে।

তারপর হঠাৎ রাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নিশাকান্ত বললেন, আচ্ছা, চলি দারোগাবাবু, কাজ আছে, ভিতরে যান—দাদা কাকাবাবু বাড়িতেই আছেন!

নিশিকান্ত ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

নিত্যরঞ্জনবাবু ভিতরের দিকে পা বাড়ালেন।

বাইরের ঘরের একটা ফরাস বিছান চৌকির উপরে রমাকান্তবাবু ডান হাতের উপরে চিবুক ন্যস্ত করে মুহ্যমানের মত বসেছিলেন। দৃষ্টি স্থির, সম্মুখের খোলা জানালা-পথে নিবদ্ধ। এই কয়দিনের মধ্যেই ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে যেন একটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। রুক্ষ, বিস্রস্ত চুল, চোখের কোলে কালির সুস্পষ্ট রেখা প্রকট হয়ে উঠেছে, চোখের পাতা দুটো একটু ভারী ভারী বলে মনে হয়।

নিত্যরঞ্জনবাবু কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং তার জুতোর শব্দেও রমাকান্তবাবুর ধ্যান ভঙ্গ হল না! গলা খাঁকারি দিলেন নিত্যরঞ্জনবাবু!

চোখ তুলে তাকালেন রমাকান্তবাবু, কে?

পরক্ষণেই নিত্যরঞ্জনবাবুকে চিনতে পেরে বললেন, আসুন নিত্যরঞ্জনবাবু, বসুন!

নিত্যরঞ্জনবাবু চৌকির এক পাশেই আসন গ্রহণ করলেন।

যে ঘরে রতিকান্তবাবু নিহত হয়েছেন সেই ঘরটা আর একবার দেখতে চাই রমাকান্তবাবু—

ও—, বলে পাশের ঘরে গিয়ে উপরে ঘরের চাবিটা এনে নিত্যরঞ্জনবাবুর হাতে দিলেন। নিত্যরঞ্জনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে উপরে গেলেন রমাকান্তবাবু।

রমাকান্তবাবু ঘরের মধ্যে আর প্রবেশ করলেন না। বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

নিত্যরঞ্জনবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

বাঘের মূর্তিটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা সত্ত্বেও নিত্যরঞ্জনবাবু দর্শনীয় বা প্রমাণ সাপেক্ষ কিছুই খুঁজে পেলেন না। এবং ঘরের মধ্যে খুঁজে খুঁজেও কোথাও কোন লোহা, তামা বা ইলেকট্রিকের তার জাতীয় কিছুর সন্ধান পেলেন না।

দুজনে আবার এসে বাইরের ঘরে উপবেশন করলেন।

উভয়েই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে রইলেন।

নিত্যরঞ্জনবাবু চিন্তামগ্ন। রমাকান্তবাবু যেন একটু অন্যমনস্ক।

॥ পাঁচ ॥

রমাকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে নিত্যরঞ্জনবাবু সহসা এক সময় প্রশ্ন করলেন আচ্ছা, একটা প্রশ্নের আমার জবাব দেবেন রমাকান্তবাবু?

বলুন!

সেদিন আপনারা বলেছিলেন ইদানীং আপনার দাদা রতিকান্তবাবুর মেজাজটা বিশেষ খিট্‌খিটে হয়ে উঠেছিল—এর কি কোন কারণ ছিল বা ইদানীং এমন কিছু ঘটেছিল যার পর হতে—

ইদানীং বলতে প্রায় বৎসর খানেক হতেই দাদার স্বভাবটা ঐ রকম হয়ে গিয়েছিল, অতি অল্পেতেই চটে উঠতেন, বিশ্রীভাবে চেঁচামেচি করতেন—সাধারণ ভদ্র ব্যবহারটুকু তার লোপ পেয়েছিল যেন। দীর্ঘ দিন ধরে যে সব লেখকরা আমাদের এ কারবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, ইদানীং দাদার ঐ ধরনের অভদ্রজনোচিত ব্যবহারে মনোক্ষুণ্ণ হয়ে আমাদের দোকানে পর্যন্ত আসা বন্ধ করেছিলেন।

হঠাৎ তাঁর ওরকম হওয়ার কারণ? ব্যবসা-পত্র।

ঠিকই ধরেছেন দারোগাবাবু! জানেন তো ইদানীং সকল রকম ব্যবসারই চরম দুর্দিন চলছে। আমাদের ব্যবসারও অবস্থা ভিতরে ভিতরে আদপেই ভাল নয়। বাজারে বহু দেনা জমে গেছে। গত আট-দশ বৎসর ধরে ব্যবসার সকল দায়িত্ব আমার ও দাদার বড় ছেলে সুধার উপরেই ছিল। হঠাৎ কেমন দাদার ধারণা হয়ে গেল ব্যবসার এ টলটলায়মান অবস্থার জন্যে আমরা দুজনেই দায়ী, যার ফলে দাদা আমাদের হাত হতে ব্যবসার সব কিছু দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন। সংঘাত শুরু হল ঐখানেই দাদা দুটো ভুল করলেন, এক তাঁর ধারণা, তখন পঁচিশ বৎসর আগে যে রীতিতে ব্যবসা চলছিল এখনও বুঝি তেমনি চলছে। দ্বিতীয় ভুল করলেন অনর্থক পাওনাদারদের সঙ্গে বিশ্রীভাবে চেঁচামেচি করে।

চেঁচামেচি করে মানে?

পাওনাদারদের সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলতে হয় কিন্তু দাদা পাওনাদারদের টাকা তো দেবেনই না, চোখও রাঙাবেন। কতদিন ঐ রকমের অযৌক্তিক ব্যবহার সহ্য করবে পাওনাদাররা! খিটিমিটি, চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। যে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা ও সাধনায় মল্লিক পুস্তক প্রকাশনীর সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছিল, দাদার হঠকারিতায় সেই সুনাম ও প্রতিষ্ঠা একটু একটু করে ভেঙে পড়তে লাগল। বলতে বলতে সহসা যেন রমাকান্তর গলার স্বর থম্‌থমে হয়ে উঠল, হতে পারে দাদার দীর্ঘ দিনের প্রাণপাত পরিশ্রমে এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে, কিন্তু তাই বলে আজ তিনি আবার তাঁর অবিবেচনা ও বিকৃত কল্পনা নিয়ে তাকে ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেবেন—এ কেমন করে কোন সুস্থ মানুষ সহ্য করতে পারে বলুন তো দারোগাবাবু? দেখুন দারোগাবাবু, তিনি আমার নিজের মায়ের পেটের ভাই তবু বলতে আমার লজ্জা বা দুঃখ হচ্ছে না, তিনি মারা গিয়েছেন এ এক পক্ষে ভালোই হয়েছে। এবার পুস্তক প্রকাশনীটাকে হয়তো বাঁচিয়ে তোলা গেলেও যেতে পারে। আজ বলে নয় শুধু নিত্যরঞ্জনবাবু, আগেও বলেছি আমি, এখনো বলব, মানুষের দেহের কোন অঙ্গে যেমন পচন ধরলে, সেই অঙ্গটিকে কেটে বাদ না দিলে, সমস্ত দেহের মধ্যেই একটু একটু করে পচন বিস্তার করে এবং পচনের সেই বিস্তারকে রোধ করবার জন্য স্নেহ, দয়া, মমতা, সব কিছুকেই যেমন বাদ দিতে হয়, চরম অমঙ্গল ও দুর্ভাগ্যের হাত হতে বাঁচবার জন্য তেমনি, কতবার আমি সুধাকে বলেছি দাদাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবসা থেকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে পূর্বের মত আমাদের নিজেদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা নিতে এবং এক্ষেত্রে পিতৃস্নেহের দোহাই দিয়ে চোখ বুজে সব সহ্য না করতে। কিন্তু সুধাকান্ত ও নিশাকান্ত আমার কথা শোনে নি, আমার কথায় কান দেয়নি। এখন বুঝুক ঠেলা। দাদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আজ দেখা যাচ্ছে মাত্র এক বৎসর সময়ের মধ্যেই এতবড় প্রতিষ্ঠানের ভিতরটা একেবারে ফোঁপরা হয়ে গেছে। বাজারের চতুর্দিকে দেনা, অপযশ ও দুর্নাম। কারো সাধ্য নেই আজ আর মল্লিক পুস্তক প্রকাশনীকে রক্ষা করতে পারে।

উত্তেজনায়, ক্ষোভে রমাকান্তর কণ্ঠস্বরটা যেন বুজে এল, আর এর জন্য সত্যিকারের একমাত্র দায়ী ঐ দাদাই!

আচ্ছা রমাকান্তবাবু, হঠাৎই বা আপনার দাদা ইদানীং এ ধরনের ব্যবহার করছিলেন কেন? কোন কারণ ছিল বলে মনে হয় আপনার?

কি জানি মশাই ঠিক বলতে পারি না, তবে বছর দেড়েক আগে একবার খুব জ্বর হয়, তার মাস খানেক পরে সেই জ্বর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, স্মৃতিশক্তি যেন তাঁর অনেকটা কমে গিয়েছে, অতীতের সব কিছু মনে থাকে কিন্তু বর্তমানের সব কিছু যেন ভুলে যান। এই মাত্র যা বললেন, পর মুহূর্তেই তা ভুলে যান। অনেক ডাক্তার কবিরাজ ঔষধ পত্র করা হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয়নি। আর একটা জিনিষও তাঁর ঐ অসুখের পর হতেই লক্ষ্য করেছি—অল্পতেই অসহিষ্ণু ও অধৈর্য হয়ে

পড়তেন, সামান্য কারণে চটে উঠে চেঁচামেচি শুরু করতেন। ব্যবসায় দুর্দিনের জন্য অর্থকষ্ট হয়েছিল ইদানীং খুব বেশী, যে কথা আগেই আপনাকে আমি বলেছি এবং তার জন্যও খুব যে তাঁকে অসুবিধে ভোগ করতে হত তাও নয়, কারণ দাদার ছোট ছেলে নিশাকান্তই তার বড় বড় মাড়োয়ারী বন্ধুদের কাছ হতে প্রয়োজন মত টাকা এনে দিত। সে কারণে কখনো তাঁকে নিশাকান্তর জন্য অসুবিধায় পড়তে হয় নি।

একটা কথা রমাকান্তবাবু, আচ্ছা আপনার দাদা কি কারো কথাই শুনতেন না?

আমাকে আর সুধাকে তো কোন কথা বলতেই দিতেন না, আমাদের কথা শোনা দূরে থাক। এক দেখেছি, নিশা ও তার স্ত্রীর কথাই শুনতেন।

নিশাকান্তবাবুর স্ত্রী?

হ্যাঁ, সাধারণ স্ত্রীলোক নয় নিশার স্ত্রী! অসাধারণ hold ছিল তাঁর দাদার উপরে। বলতে গেলে ইদানীং ছোট বৌমাই তো এ সংসারে কর্ত্রী হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য তাঁর সে শক্তিও আছে।

হুঁ!

আচ্ছা রমাকান্তবাবু, বলতে পারেন খুব শীঘ্রই ইদানীং কখনো আপনাদের এ বাড়িতে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী! কোন কাজ করতে এসেছিল কি না?

ইলেকট্রিক মিস্ত্রী!

হ্যাঁ, মানে বাড়ির ইলেকট্রিকের ব্যাপারে কোন কিছু গোলমাল?

তেমন তো কিছু কই মনে পড়ছে না, বলতে বলতে রমাকান্তবাবুর হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বলে ওঠেন, তবে হ্যাঁ, দাদার মৃত্যুর মানে নিষ্প্রদীপের ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ সমস্ত বাড়ির আলো ফিউজ হয়ে গিয়েছিল—

ফিউজ হয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ, কিন্তু নিশার শালা—আমাদের ছোট বৌমার ভাই যোগেশ—ওর ইলেকট্রিকের কারবার আছে, ইলেকট্রিকের কাজও খুব ভাল জানে। ঐ সময় যোগেশ ছিল, সেই সব আবার ঠিক করে দেয়।

ও!

আবার একসময় নিত্যরঞ্জনবাবু প্রশ্ন করেন, আচ্ছা আর একটা কথা রমাকান্তবাবু আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যেটা মনে আমার কেমন যেন একটা খট্‌কা বাধিয়াছে—

কি বলুন তো?

আপনার দাদার ঘরের চিতাবাঘের মূর্তিটা—! রতিকান্তবাবু এদিকে তো শুনেছি প্রচণ্ড বৈষ্ণবতাবলম্বন ছিলেন। এমন strictly নিরামিষাশী ছিলেন অথচ তাঁর ঘরে ঐ মূর্তিটা—

দাদার সমস্ত জীবনটাই গরমিলে ভরা নিত্যরঞ্জনবাবু! প্রথম যৌবনে দাদা ছিলেন ঘোর সংসারী, একদিন মাংস না হলে চলত না। এবং একজন নামকরা শিকারীও ছিলেন। বন্দুক চালনায় তাঁর হাতের নিশানা ছিল যাকে বলে একেবারে অব্যর্থ।

সালটা আমার মনে নেই, দাদা একবার তাঁর এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে ময়ূরভঞ্জে বেড়াতে যান। দাদার বন্ধুটিও ছিলেন একজন পাকা শিকারী। এবং দাদার ঐ বন্ধুটি তখন ময়ূরভঞ্জ স্টেটে-বড় চাকরি করেন ; শিকারের জন্যে আমন্ত্রণ করেছিলেন দাদাকে সেই বন্ধু। শিকারে গিয়ে যে চিতাবাঘের মূর্তিটা দাদার ঘরে দেখেছেন, ঐ বাঘের হাতেই দাদার বন্ধুটি প্রাণ দেন। দাদা অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাঘটাকে গুলি করে শেষ করেন, কিন্তু সেই দিন হতেই দাদা শিকার করা ছেড়ে দিলেন এবং বাঘের ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে এসে খড় দিয়ে ঐ মূর্তিটা তৈরী করে ঘরে রেখে দিলেন। সেই হতে দাদা কেবল যে শিকার করাই ছেড়ে দিলেন তাই নয়—মাছ, মাংস পর্যন্ত খাওয়া ছেড়ে দিলেন। এবং আরো কিছুদিন পরে দাদা এক বৈষ্ণব সাধুর কাছে মন্ত্র-দীক্ষা নেন। বন্ধুটিকে দাদা প্রাণের চাইতেও ভালবাসতেন। বন্ধুর অপঘাতে মৃত্যু দাদার পক্ষে অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়েছিল। প্রত্যহ রাত্রে দাদা ঐ বাঘের মূর্তিটার গায়ে হাত বুলাতেন শুতে যাবার পূর্বে। দাদার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসের মধ্যেই ওটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

॥ ছয় ॥

আরো দিন দুই পরে সংবাদপত্রে একটি সংবাদ প্রকাশিত হল।

সংবাদটি এই ঃ

বিখ্যাত পুস্তক প্রতিষ্ঠান, 'মল্লিক পুস্তক প্রকাশনী' প্রকাশ্যে বিক্রয় হইয়া যাইতেছে।

সংবাদটা চোখে পড়তে কিরীটী গিয়ে ফোনে বেলেঘাটা থানার নিত্যরঞ্জনবাবুকে ডাকে।

ওপাশ হতে আহ্বান শোনা যায়, হ্যালো! কে?

কে? নিত্যরঞ্জনবাবু? আমি কিরীটী কথা বলছি। দয়া করে এখুনি একবার আসবেন কি?

ব্যাপার কি বলুন তো?

আসুন না, সাক্ষাতেই সব বলবখন।

ঘণ্টাখানেক বাদে নিত্যরঞ্জনবাবু কিরীটীর বসবার ঘরে এসে প্রবেশ করলেন।

ব্যাপার কি বলুন তো? এত জরুরী তলব কেন হঠাৎ?

বসুন। আপনার রতিকান্ত মার্ডার কেসের মিস্ট্রি সল্‌ভ করে ফেলেছি—বলেন কি!

হ্যাঁ, কিন্তু, তার আগে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

কি বলুন তো?

রমাকান্ত মল্লিক ও সুধাকান্ত মল্লিককে গিয়ে আপনার বলতে হবে মল্লিক পুস্তক প্রকাশনীর যে কেউই খরিদ্দার বা ক্রেতা আসুন না কেন, বর্তমানের পুস্তক প্রকাশনীর ন্যায্য মূল্যের চাইতে অন্ততঃ দ্বিগুণ মূল্য যেন তারা দাবি করেন!

অর্থাৎ রমাকান্তবাবুদের আপনি 'পুস্তক প্রকাশনী'টা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

ঠিক তাই।

শুধু এইজন্যই কি আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কিরীটীবাবু।

হ্যাঁ, কারণ খুনী তার 'মরণ-ফাঁদ' নিজ হাতেই পাততে উদ্যত হয়েছে এবং এই ফাঁদেই সে আটকা পড়বে। পড়তেই হবে। তবে একটা কথা আপনাকে আগে থেকেই বলে রাখি নিত্যরঞ্জনবাবু, রতিকান্ত মল্লিক descrived it! রমাকান্তবাবু মিথ্যা বলেননি সেদিন আপনাকে ; স্নেহে, মমতায় অন্ধ হয়ে সুধাকান্তবাবু যদি না তাঁর বিকৃত মস্তিষ্ক পিতার বিকৃত কল্পনায় সায় দিয়ে যেতেন, তবে হয়তো রতিকান্তকে ঐভাবে অপঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হত না এবং এতদিনকার অত বড় পুস্তক প্রতিষ্ঠানটাও নষ্ট হয়ে যেত না! পিতামাতার প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব আমাদের সকলেরই থাকা উচিত এবং ভক্তি-শ্রদ্ধাও আমাদের পিতামাতার প্রতি প্রত্যেকেরই আছে তাই বলে ভক্তিতে অন্ধ হয়ে কর্তব্য ও ন্যায়কে কখনো আমাদের ভোলা উচিত নয় নিত্যরঞ্জনবাবু—

এ সব আপনি কি বলছেন মিঃ রায়?

ঠিকই বলছি, আপাতত শুনতে সুখশ্রাব্য না হলেও আমার কথাগুলো যা বলব একটু ভাল করে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, ন্যায়ের দিক দিয়ে আদপেই সেগুলো অযুক্তিপূর্ণ নয়। শুনুন তবে—কিরীটী বলতে লাগল, কুড়ি-পঁচিশ বৎসর আগে রতিকান্ত যখন পুস্তকের ব্যবসা শুরু করেন সে সময় বাংলা দেশের সাহিত্যিকরা সহজে স্বীকৃতি পেতেন না, ফলে বেশীর ভাগ সাহিত্যিকদের ধনী প্রকাশকদের জুলুমবাজির কাছে মাথা নত করে থাকতে হত, অর্থাৎ নামমাত্র মূল্যে তাদের পরিশ্রমলব্ধ সাহিত্য সাধনাকে বিক্রয় করতে হত। এবং যার ফলে রতিকান্তর মত প্রকাশকদের লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা ভরে উঠত ও সাহিত্যিকদের তণ্ডুলাভাব ঘুচত না। দীর্ঘকাল ধরে ঐ নীতিকে আশ্রয় করেই রতিকান্ত ব্যবসাক্ষেত্রে, সুনাম প্রতিপত্তি ও অর্থ অর্জন করেছিলেন। তারপর ক্রমে এমন দিন এল যখন প্রকাশকদের সাহিত্যিকদের দিকে অন্যভাবে তাকাতে একপ্রকার বাধ্য হতে হল এবং ঐ সময়টায় রতিকান্ত তাঁর ব্যবসার সকল ভার তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধাকান্ত ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমাকান্তর উপরে তুলে দিয়েছিলেন। শেষোক্তরা বর্তমান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পা ফেলে ব্যবসা চালিয়েছিলেন, রতিকান্তর নীতিকে বর্জনীয় বলেই তাঁরা বর্জন করেছিলেন। এমন সময় যুদ্ধের দরুন ব্যবসার বাজারে এল বিরাট একটা পরিবর্তন। প্রত্যেক ব্যবসারই মূলে লাগল নাড়া। লাভের অঙ্কে প্রত্যেকেরই পারদটা নেমে আসতে লাগল। রতিকান্তর নজরে যখন ব্যাপারটা এল, তিনি যেন ক্ষেপে উঠলেন চারিদিকের লোকসানের অঙ্কটা

দেখে। বর্তমান বাজারটাকে না বুঝেই এবং যে পরিবর্তন ইদানীং পুস্তক-ব্যবসার ক্ষেত্রে ঘটে গিয়েছে সেটাকে বোঝবার চেষ্টা না করেই তাঁর ধারণা জন্মে গেল, ছেলে ও ভাই তাদের গাফিলতির জন্যই ব্যবসাটাকে নষ্ট করতে বসেছে। অবশ্য এরকম ভাববার আরো দুটো কারণ ছিল রতিকান্তর।

একটু থেমে কিরীটী আবার তার অর্ধসমাপ্ত কাহিনী শুরু করল ঃ ১নং কিছুকাল আগে রোগে ভোগার জন্য তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, ২নং কারণ ইতিমধ্যে প্রকাশক ও সাহিত্যিকদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যে পরিবর্তনটা ঘটে গিয়েছে সেটা রতিকান্ত আদপেই গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর ধারণা ছিল সাহিত্যিকরা বরাবর নামমাত্র মূল্যেই পুস্তকের যাবতীয় স্বত্ব পূর্বের মত রতিকান্তর মত পুস্তক-ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে আর রতিকান্তর দল দোতালার উপর তিনতলা বাড়ি হাঁকাবে লাভের মুনাফা দিয়ে। এখানেই শুরু হল আসল সংঘর্ষ পিতা, পুত্র ও দুই ভাইয়ের মধ্যে। শুরু হল চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাটি অশান্তি। রতিকান্ত ব্যবসার সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন কিন্তু পূর্বের দিনও যেমন ছিল না, তাঁর নিজের মস্তিষ্কও ছিল না তেমনি সুস্থ। ফলে যাবতীয় লেনদেনের ব্যাপারে খিটিমিটি গোলমাল শুরু হয়ে গেল। বিকৃত মস্তিষ্ক, পুরোপুরি ক্যাপিটালিস্ট মনোবৃত্তিপূর্ণ রতিকান্তর দুর্ব্যবহারে একে একে সকলেই অসন্তুষ্ট হতে লাগল। ব্যবসার সমূহ ক্ষতি হতে লাগল। কিন্তু রতিকান্ত সম্পূর্ণ বেপরোয়া। সুধাকান্ত আর রমাকান্ত স্নেহে অন্ধ হয়ে বিকৃতমস্তিষ্ক রতিকান্তর ব্যবহার সহ্য করে যেতে লাগলেন; যদিও তাদের ব্যবসার শুভাশুভের খাতিরে উচিত ছিল রতিকান্তকে পাগলা গারদে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া এবং স্নেহের খাতিরে কর্তব্যচ্যুতিই হল তাদের মারাত্মক ভুল যার ফলে আজ মল্লিক পুস্তক প্রকাশনীর চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে।

তা হলে—

ঠিক, ঐখানেই হত্যার বীজ রোপিত হল! was two clever। অতীব ধূর্ত! সে সব দিক বাঁচিয়ে নিজের কাজ গুছোবার চেষ্টায় রতিকান্তর বিকৃত কল্পনায় ইন্ধন যোগাতে লাগল দিনের পর দিন, ফলে রতিকান্ত সহজেই হত্যাকারীকে নিজের দলে টেনে নিয়ে—

সর্বনাশ! তবে কি?

হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছেন বোধহয় হত্যাকারী কে? হত্যাকারী যখন দেখেন রতিকান্তকে বাধা দিতে যাওয়া মূর্খতা মাত্র। সে তখন এক হাতে রতিকান্তর কথায় সায় দিয়ে চেষ্টা করতে লাগল ব্যবসাটাকে একেবারে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দিয়ে তারপর অন্য হাতে বেনামী করে ব্যবসাটা নিজের হাতে গুছিয়ে নিতে। যাহোক, হত্যাকারীই এক্ষেত্রে নিজস্ব স্বার্থের জন্য রতিকান্তর হত্যাপরাধে অপরাধী হলেও আমি যেন আর একজনের অদৃশ্য হাতের নির্মম শাসনদণ্ড চালনার ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি।

কি রকম?

ঐ চিতাবাঘ। ঐ চিতাবাঘের সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত রতিকান্তকে হত্যা করা হয়েছে।

বলেন কি?

ঠিক তাই! আসলে রতিকান্ত লোকটা বৈষ্ণবের ভেক নিয়েছিল মাত্র। খাঁটি বৈষ্ণবের নিষ্ঠা ও প্রেম কোনদিনই রতিকান্তর দেহে বা মনে ছিল না। কপালে আর বুকে বড় বড় তিলক কাটলেই বৈষ্ণব সাধু হওয়া যায় না! আসলে রতিকান্তর মধ্যে একটা দুর্দান্ত, লোভী, মাংসাশী, জান্তব প্রবৃত্তি ছিল—যার প্রমাণ তাঁর প্রথম বয়সে পশু শিকারের মধ্যেই আমরা পাই। এবং সেই প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই লোকটা পশু শিকার ছেড়ে দিয়ে, মাছ মাংস ছেড়ে দিয়ে, বৈষ্ণবের ভেক নিয়েও আসল সাধু বা সজ্জন বনে উঠতে পারেন নি এবং সেটা সম্ভবও নয় কোনদিন। সেই সহজাত প্রবৃত্তিটার পোষণের জন্যই রতিকান্ত ঘরের মধ্যে চিতাবাঘের ছালটা দিয়ে একটি মূর্তি গড়ে রেখেছিলেন এবং প্রত্যহ সেটার গায়ে হাত বুলোতেন! হত্যাকারী ঐ সংবাদটি জানত তাই ঐ চিতাবাঘের মধ্য দিয়েই ইলেকট্রিক কারেন্ট পাস করে রতিকান্তকে হত্যা করে। হত্যার রাত্রে শহর নিষ্প্রদীপ না হলেও রতিকান্ত নিহত হতেন। নিষ্প্রদীপটা একটা আকস্মিক দৈব সুযোগ এনে দিয়েছিল মাত্র হত্যাকারীকে। হত্যাকারী আগে হতেই সব ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছিল।

কি করে আপনি বুঝলেন?

মৃতের হাতের মুঠির মধ্যে যে চুলের গোছা ছিল সেটা দেখেই এবং আপনার মুখে সব বৃত্তান্ত শুনেই আমি বুঝেছিলাম। মৃতের দেহের কোমরের কাছে কাপড়ের একাংশ পোড়া ছিল ও দেহে একটা কালসিটার দাগ ছিল। হঠাৎ নিষ্প্রদীপ হয়ে যাওয়ায় রতিকান্ত যখন অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন সেই মুহূর্তে হত্যাকারী একটি মোমবাতি ও দিয়াশলাই হাতে কক্ষে এসে আবির্ভূত হল এবং মোমবাতিটা জ্বেলে রতিকান্তর মূর্তিটার ওপর ঠেলে ফেলে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রতিকান্তর শরীরে বৈদ্যুতিক কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং তাতেই, হাই ভোল্টেজের কারেন্ট শরীরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাবার দরুন তাঁর মৃত্যু ঘটে। তারপর হত্যাকারী চেয়ার দুটোকে উল্টে রেখে এবং মোমবাতিটা মৃতের হাতে গুঁজে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু একটি মারাত্মক ভুল সে করে সে সময়—দিয়াশলাইটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ; এতে করে হত্যাকারী প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে অন্ধকারে গুঁতো খেয়ে বৃদ্ধের প্রাণহানি ঘটেছে। দিয়াশলাইটা যদি হত্যাকারী সঙ্গে করে না নিয়ে যেত তাহলে এত শীঘ্র সে আমার চোখে ধরা পড়ত না। দিয়াশলাইটা সে নিয়ে গেল কিন্তু অর্ধদগ্ধ মোমবাতিটা মৃতের হাতে রেখে গেল—নিজেই নিজের পদচিহ্ন রেখে গেল! এমনই হয়—

কিন্তু উদ্দেশ্য?

অতি সহজ, বেনামীতে অতবড় লাভবান বিষয়টা হাতান! কারণ হত্যার পরিকল্পনাকারী জানত ব্যবসাটার আসল গলদ কোথায়।

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল।

দিন দুই পরে—নিত্যরঞ্জনবাবু আবার কিরীটীর কাছে এলেন।

কি ব্যাপার হত্যাকারীকে ধরলেন?—কিরীটী প্রশ্ন করে।

না। কিন্তু সত্যিই কি আপনি বিশ্বাস করেন নিশাকান্তই হত্যাকারী।

ও হরি—কি আপনি তা হলে বুঝলেন সেদিন!—নিশাকান্ত হত্যাকারী হতে যাবেন কেন?

তবে কে?

ইলেকট্রিশিয়ান আমাদের যোগেশ—নিশাকান্তর শ্যালক।

তাই বলুন—যোগেশই যে ব্যবসাটা কিনে নিতে এসেছিল শুনলাম তার নামে—

নিশাকান্ত agent যে সে, পরিকল্পনাটা নিশাকান্তর—কাজ করেছেন যোগেশ। নিশাকান্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি, চিত্রবিচিত্র চিতাবাঘ পিতৃদেবটিকে সে ঠিকই বুঝেছিল।

কিন্তু প্রমাণ?

সে তো মশাই আমার খুঁজে দেবার কথা নয়, সেটা আপনারা খুঁজে নিন! প্রমাণ হিসেবে কি কি প্রয়োজন সবই আমি বলে দিয়েছি।

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে শেষ কথা কটি বলে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করে।

পদ্মিনী

॥ এক ॥

টোবাকো পাউচ থেকে খানিকটা টোবাকো তুলে নিয়ে পাইপের মুখবিবয়ে ঠাসতে ঠাসতে কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, নেশা তুই করিস নি সুব্রত বেঁচে গিয়েছিস। তোর নিশ্চয়ই মনে আছে শান্তশীলের কথা?

বুঝলাম, কিরীটী মুডে আছে। সেদিনকার মতই আমার কোন কাহিনীর এটা পূর্বাভাস মাত্র!

হেমন্তর অপরাহ্ন। শীত নেই বটে, কিন্তু বাতাসে একটা শীত শীত ভাব আছে। গাছে গাছে ঝরা পাতার উৎসব লেগেছে। ঈষৎ শীতোষ্ণ বাতাসে ঝরা পাতাগুলো এলোমেলো ভাবে এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছে। কিরীটীর টালিগঞ্জের বাড়িতে তার দোতলার বসবার ঘরে সবে আমাদের তৃতীয় কাপ চা শেষ হয়েছে।

বয়সে যা হয়। গাঁটে গাঁটে নাকি এবারে শীতে একটা রিউম্যাটিক টেনডেন্সি কিরীটীর দেখা দিয়েছিল। তাই ডাক্তারের কঠিন নির্দেশ কিছুকাল সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

সেই সম্পূর্ণ বিশ্রামপর্বই চলেছে কিরীটীর। প্রত্যহ তাই বিকেল থেকে কোনদিন রাত আটটা কোনদিন বা রাত দশটা পর্যন্ত আমাকে হাজিরা দিতে হচ্ছে। বেশীর ভাগ দিনই ঐ সময়টা আমাদের কাটছিল দাবা খেলে। কিন্তু আজ এসে দেখি দাবার ছক সামনে নেই, রয়েছে চায়ের পাত্র ও ওষ্ঠে পাইপ।

অলস শিথিল ভঙ্গিতে ঘরে খোলা জানলা পথে পাতাঝরা রিক্ত শূন্য কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকিয়ে আরাম-কেদারাটার উপর আধ বসা শোওয়া অবস্থায় কিরীটী বেশ কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক।

আমার পদশব্দে না তাকিয়েই বললে কেবল, আয় সুব্রত, বোস।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল। কোন সাড়াশব্দই নেই কিরীটির।

অবশেষে এক সময় জংলী চা নিয়ে এল।

নিঃশব্দে দুজনে এক এক করে তিন কাপ চা শেষ করলাম। জংলী চায়ের সরঞ্জাম তুলতে এসেছিল! তাকে বললে, আরো চা নিয়ে আয় জংলী। জংলী ঘাড় নেড়ে চলে গেল সম্মতি জানিয়ে।

শেষটায় আমাকেই এক সময় স্তব্ধতা ভঙ্গ করতে হল। বললাম, কৃষ্ণা বৌদিকে দেখছি না—বাড়ি নেই নাকি।

না। পাইপ টানতে টানতে পূর্ববৎ অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল কিরীটী মৃদু কণ্ঠে।

কোথায় গেল?

সিনেমায়।

কৃষ্ণা বৌদির এ রোগটি কবে থেকে হল আবার?

দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছুদিন।

তা কোন হাউসে? ভাল ইংরেজী বই কোথাও এখন হচ্ছে বলো তো—

ইংরেজী নয়—

তবে কি হিন্দি?

উহুঁ! বাংলা বই। কে এক মালয়েশকুমার শুনছি নাকি কি একখানা জাংগল বইতে ব্যাটল ড্রেস ও শিকারী ড্রেসের জগাখিচুড়ী কি এক পোশাক পরে পা ফাঁক করে পাইপ টানতে টানতে পিকাডেলী থেকে ল্যান্ডিকোটাল পর্যন্ত যাবতীয় ভাষায় কথা বলেছে আর বাঁদর নেচেছে—সেই বইটা দেখতে?

বৌদির কি মাথা খারাপ হল নাকি। সেই ট্র্যাশ দেখতে—

নেশা। বুঝলি তামাম্ বাংলা দেশের নাড়ীতে ঐ কুমারের নেশা ধরেছে। আর সে নানা প্রকারের লম্ফঝম্ফ করে ভাবছে আহা কি অভিনয়ই না করছি—

বুঝলাম বৌদির সিনেমা দেখার ব্যাপারটি কিরীটীর মনঃপুত নয়।

তাই চুপ করেই রইলাম। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল।

পাইপের নতুন তামাকে অগ্নিসংযোগ করে কিরীটী ধুমপান করতে লাগল। তারপরই এক সময় তুলল শান্তশীলের কথা।

শান্তশীলের চিন্তামণি অবিশ্যি আর চিনির যোগান দিলেন না, কিরীটী বলতে লাগল আবার এবং তার ফলে যে ফলপ্রাপ্তি তার ঘটল, যোধপুর রাজ-পরিবারের পদ্মিনী দেবীরও সেই ফলপ্রাপ্তিই হয়েছিল।

পদ্মিনী দেবী!

হ্যাঁ—অনেকদিন আগেকার কথা। পদ্মিনীর দেশ রাজস্থানটা ঘুরে দেখবার আমার অনেককালের বাসনা ছিল তুই তো জানিস।

গিয়েছিলি নাকি তুই রাজস্থানে?

শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হল কই! তার আগেই তো পদ্মিনী দেবীর বখেড়া দেখা দিল আর সেই বখেড়া মেটাতে গিয়ে পা ভেঙে হাঁটু ভেঙে 'দ' হয়ে তিনমাস শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে পাইপে একটা টান দিয়ে কিরীটী কথাটা শেষ করল, আমার মনে হয় কি জানিস সুব্রত?

কি?

এত বছর পরে হলেও এবারের এই গেঁটে বাতের ব্যাপারটার বীজ সেবারেই আমার ডান পায়ের হাঁটুতে রোপিত হয়েছিল।

হাঁটু ভেঙে 'দ' হয়ে ছিলি মানে?

আর বলিস কেন, পদ্মিনী দেবীর হঠাৎ চাগিয়ে ওঠা সিনেমার অভিনেত্রী হবার দায়ে পড়ে—

অতঃপর কিরীটীর নিজস্ব জবানীতে যে কাহিনী শুনেছিলাম সেই কাহিনীর বিবৃতিতেই এবারে আসা যাক।

ক্ষমা করবেন। কাহিনীর গোড়াতেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ সেদিন সন্ধ্যায় কিরীটীর মুখে যা শুনেছিলাম তারপর প্রায় আট নয় বৎসর গত হয়ে গিয়েছে, কাজেই আজকের আমার এই বিবৃতির মধ্যে কিছু ভুল-চুক বা অতিরঞ্জনও থাকা একান্তই স্বাভাবিক।

তবে আপনারা যদি অনুগ্রহ করে এটাকে কোন সত্য কাহিনী বলে না ধরে নিয়ে নিছক একটা রহস্য গল্প শুনছেন বলে গোড়া থেকেই স্বীকৃতি দেন তা হলে কাহিনীকার হিসাবে আমাকে প্রত্যব্যয়ের ভাগী হতে হয় না। কারণ বিশ্বাস করুন আপনারা, গল্পটি লেখবার পর নিজে পড়তে গিয়ে আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না কতটুকু এর মধ্যে সত্য আর কতটুকু আমার কল্পিত। ঝুড়ি ঝুড়ি কল্পনার মধ্যে আসল সত্যটুকু যদি কিছু থেকেও থাকে তা এমন ভাবেই কল্পনার মাটিতে চাপা পড়েছে যে, সত্যকে খুঁজে বের করা এখন আমার পক্ষে সত্যিই দুঃসাধ্য।

অবিশ্যি একটা কথা।

কিরীটী রায়কে সবটা শুনিয়ে এর সত্য মিথ্যেটা যাচাই করে নিতে পারতাম কিন্তু তার বর্তমান মেজাজটা এমন বিশ্রীভাবে বিগড়ে আছে যে, গল্প শোনার পর যদি সে দেখতে পায় সে তার মুখের সত্য কাহিনীর সঙ্গে আমার কল্পনা এমন বিশ্রীভাবে জট পাকিয়ে সত্য মিথ্যার একটা রীতিমত রোমাঞ্চকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হলে আমার চাইতে কিন্তু আপনাদেরই বেশী ক্ষতি।

কেন জানেন?

অতঃপর যদি কিরীটী মুখ বন্ধ করে তা হলে আপনারা যারা কিরীটী রায়কে আজও ভুলতে পারেন নি—কিরীটীর কথা জানবার জন্য আজও উদগ্রীব, তাঁদেরই

সব চাইতে বেশী হতাশ হতে হবে। কারণ কিরীটীর কাহিনী আপনাদের শুনতে হলে আমাকেই তা আপনাদের শোনাতে হবে এবং আমাকে তার পূর্বে তার মুখ থেকে শুনেই কাহিনীকে সাজিয়ে তুলতে হবে।

তাই ক্ষমা চেয়ে রাখলাম কাহিনীর প্রারম্ভেই সকলের কাছে!

॥ দুই ॥

সেই কল্পলোকের আরাবল্লীর সুউচ্চ পর্বতবেষ্টিত মরুদেশ রাজস্থান—কিরীটীর অনেক দিনকার ইচ্ছা দেশটা ঘুরে নিজের চোখ মেলে দেখে আসবে। সুযোগের অভাবেই যাওয়াটা আর ঘটে উঠছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ সেবারে শীতের মাঝামাঝিই একটা সুযোগ যেন ঘরের দরজায় এসে দেখা দিল।

প্রেসিডেন্সিতে এক সঙ্গে পড়ত এক রাজপুত—করণ সিং। গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে হঠাৎ একদিন সেই করণ সিং-এর সঙ্গে দেখা। করণ সিং তাকে দেখে অবিশ্যি প্রথমটা চিনতে না পারলেও কিরীটী কিন্তু তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল।

দীর্ঘ প্রায় ছয়ফুট লম্বা যেন কোষমুক্ত তরবারির মতই চেহারাটা। রাজস্থানের মরুতাপে পোড়া তামাটে বর্ণ। মাথায় জরির চুমকি বসানো পাগড়ি। পরিধানে দামী সুট। করণ সিং না?

অনেকদিন একটানা বাংলা মুলুকে থেকে বাংলার কথ্য ভাষাটা ভালোই রপ্ত করেছিল। তা সত্ত্বেও কিরীটী প্রথমে ইংরেজীতেই কথা বলছিল, কিরে, কিরীটী, কিরীটী রায়—চিনতে পারছিস না?

কিরীটী—মানে প্রেসিডেন্সির সেই কিরীটী বলেই সোল্লাসে এক চিৎকার হ্যালো রায় তুই বলেই দুহাতে সাগ্রহে কিরীটীর একটা হাত নিজের শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করে দেয় করণ সিং। এবং ঝাঁকাতে ঝাঁকাতেই এক সময় বলে, তারপর হে দেবাদিদেব, কহ কিবা বার্তা—

রাজস্থানের ভাষা নাকি রাজকীয় হওয়া উচিত। কলেজ লাইফে একদা কিরীটীই বলেছিল করণ সিংকে। সেই থেকে ওরা পরস্পরের সঙ্গে নাকি ঐ ভাষাতেই কথা বলত।

কিরীটীও মৃদু হেসে প্রত্যুত্তর দেয়, কিবা বার্তা তব কহ করণ সিং!

চল, চল—আমার সুটে চল। গ্রান্ডেই আছি আমি। উই মাস্ট সেলিব্রেট আওয়ার মিটিং আফটার সাচ্ এ লং টাইম! বলতে বলতে করণ সিং সোজা তাকে টেনে নিয়ে চলে তার ঐ হোটেলে নিজস্ব সুটে।

লিফটে করে তিন তলায় উঠতে উঠতে কিরীটী বলে, কবে কলকাতায় এসেছিস?

কলকাতায়? স্বগতোক্তির মতই প্রশ্ন করে নিজেকেই করণ সিং! সহসা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হঠাৎ যেন চুপ করে যায়।

ব্যাপারটা কিন্তু কিরীটীর দৃষ্টিতে এড়ায় না। সে করণের মুখের দিকে তাকায় কিরে, বললি না কলকাতায় কবে এলি?

তা—তা—দিন দশেক হবে—

লিফট্‌টা এ সময় থেমে যেতেই দুজনে বের হয়ে পড়ে।

ঘরে এসে দুজনে বসল! করণ সিং ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল। ড্রিঙ্ক এল, কিন্তু কিরীটী লক্ষ্য করে সেই লিফট্ থেকেই যেন করণ সিং কেমন অন্যমনস্ক। ক্ষণপূর্বের তার সেই সহজ উচ্ছলতা যেন সহসা দপ করে নিভে গিয়েছে।

দুজনে দুজনকে 'উইশ' করে ড্রিঙ্ক শুরু করে, কিন্তু কারো মুখেই তারপর কোন কথা নেই।

করণ সিং চুপচাপ। অগত্যা বাধ্য হয়ে কিরীটীকেও চুপ করেই থাকতে হয় আরো কিছুক্ষণ।

তারপর কিরীটীই এক সময় মৃদুকণ্ঠে ডাকে, করণ?

ইয়েস! হঠাৎ যেন কিরীটীর ডাকে তন্দ্রাভঙ্গ হল করণ সিংয়ের।

কি ব্যাপার বল তো! এনিথিং রং! তোকে হঠাৎ কেমন একটু চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে—

করণ সিং তাড়াতাড়ি লজ্জিত হাসি হেসে বলে, না না, কিছু না—

উহুঁ! নিশ্চয়ই কিছু! অবিশ্যি যদি আপত্তি থাকে তবে প্রেস করব না। তবে—

না, বিশেষ তেমন কিছু না—

তুই নিশ্চয়ই আমাকে আজ আর সেই পুরনো দিনের ক্লাস-ফ্রেন্ড, বন্ধু-বলে গ্রহ করতে পারছিস না—নচেৎ—

না রায়, ঠিক তা নয়—তুই আমাকে কলকাতায় কেন এসেছি কথাটা জিজ্ঞেস করাতেই—কথাটা আর শেষ করল না করণ সিং। হঠাৎই যেন আবার থেমে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে, এককালে তুই ক্লাসে অফ্ পিরিয়ডে বা কমন রুমে বসে বসে ক্রাইম ডিটেকশনের ব্যাপারে নানা কথা বলতিস। আমার অবিশ্যি মনে আছে আজও। সে সময়ে তোর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচার বিশ্লেষণ দেখে কতদিন তোকে আমি বলেছি মনে আছে, চেষ্টা করলে আরও দেশের মত আমাদের ভারতবর্ষে প্রাইভেট ডিটেকটিভের প্রচলন থাকলে তুই একদিন নামকরা একজন ডিটেকটিভ হতে পারতিস?

কিরীটী প্রত্যুত্তরে নিঃশব্দে শুধু হাসল মাত্র।

একমাত্র সেই কারণেই এবং তোর সঙ্গে যখন আকস্মিকভাবে দেখা হয়েই গেল কথাটা তোকে বলছি শোন। হয়তো তোর বিচার বুদ্ধি দিয়ে তুইও কোন পথ আমাকে বাত্‌লাতে পারবি—

কি ব্যাপার?

বিশ্রী একটা জটিল ব্যাপারের মধ্যে পড়েছি রায়, আর শুধু জটিলই নয়—

আমাদের ফ্যামিলি প্রেসটিজ পর্যন্ত আজ সেই সঙ্গে বুঝি জড়িয়ে পড়েছে। তোকে তো বলেছিলাম মনে আছে বোধ হয়, যোধপুরে এক রাজবংশেরই শাখা আমরা—বর্তমান রাজার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ রক্তের সম্পর্ক—

হ্যাঁ—মনে আছে।

পদ্মিনীকে তোর মনে আছে?

পদ্মিনী।

মনে নেই তোর, যার ছবি তোকে আমি কতদিন দেখিয়েছি—

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় কিরীটীর। করণ সিংয়ের বুক পকেটে সুদৃশ্য একটি জয়পুরী চামড়ার পার্সের মধ্যে সযত্নে সর্বদা রক্ষিত থাকত এক অনিন্দ্য রূপবতী কিশোরীর ফটোগ্রাফ।

সেদিনের ফটোগ্রাফের কিশোরীর মুখখানার বুঝি সত্যিই কোন তুলনা খুঁজে পায় নি কিরীটী।

চাঁদের মত ছোট্ট কপালখানির উপরে একটি টিকলি। কাজল-টানা দুটি ভীরু আঁখিপক্ষের নীচে হরিণীর ন্যায় দুটি চক্ষু। নাসা, চিবুক, ওষ্ঠে কিংবা তার চারু গঠন। শুধিয়েছিল কিরীটী, কে রে, কার ফটো?

কেমন দেখতে আগে বল?

সিমপ্লি চার্মিং—

সত্যি বলছিস রায়?

নহে মিথ্যা, সত্য অতীব জেনো মহারাজ—বিশেষ ভাষায় হাসতে হাসতে বলেছিল কিরীটী।

কে জানিস?

নিশ্চয়ই, তোর ভাবী তিনি?

ঠিক! পদ্মিনী আমার এক জ্ঞাতি চাচার কন্যা—আমাদের বাগ্‌দান হয়ে গিয়েছে! তোর কথাই ঠিক রায়. আমার মনোনীতা বাগ্‌দত্তা—বধু!

লাকি গ্যায়—কিরীটী শুধু বলেছিল, কন্‌গ্রাচুলেসান্স—থাউজেন্ড কন্‌গ্র্যাচুলেসান্স।

মনে পড়ে গেল মুহূর্তে যেন কিরীটীর সেই সব পুরাতন দিনের কথা। বিস্ময় এবারে কিরীটী তাকাল করণ সিংয়ের মুখের দিকে। চোখে প্রশ্নের ইঙ্গিত।

পড়া শেষ করে এখান থেকে যোধপুরে ফিরে যাবার পর দিল্লীতে একটা ভাল চাকরি পেয়ে গেলাম সেক্রেটারিয়েটে—আর তারই বৎসরখানেক বাদে আমি পদ্মিনীকে বিয়ে করি—

তারপর?

তারপর! একটা যেন চাপা দীর্ঘশ্বাস বারেকের জন্য করণ সিংয়ের বুকটা কেঁপে উঠল। নিশ্বাসটা রোধ করে সে বললে, তারপর আটটা বছর যেন আমাদের স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই কেটে গেল। আবার একটু চুপ করে থেকে শুরু করল করণ সিং, তার পরই আমাদের সুখের ঘরে আগুন ধরল রায়—

আগুন?

হ্যাঁ—সবই তোকে বলছি শোন। আমাদের কোন সন্তান না হওয়ায় এবং পাছে পদ্মিনী নিজেকে লোনলি ফিল করে তাকে সব ব্যাপারেই দিয়েছিলাম আমি অবাধ স্বাধীনতা। এখন বুঝতে পারি কত বড় আহাম্মকই করেছি। যাক্ যা বলছিলাম, সেই প্রশ্রয়ের পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে ক্রমশঃ ক্লাবে, পার্টিতে, সিনেমায়, থিয়েটারে ঘুরে ঘুরে একেবারে সম্পূর্ণভাবে বহির্মুখী হয়ে উঠল পদ্মিনীর মন! রাত করে বাড়ি ফিরতে লাগল, ভুলে গেল তার ঐতিহ্যতার বংশমর্যাদা, ড্রিঙ্ক করতে শুরু করল—

ড্রিঙ্ক!

হ্যাঁ—অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি, অনেক বলেছি, কিন্তু তার উচ্ছৃঙ্খলতা কমা দূরে থাক যেন দিন দিন বেড়েই চলল। সংসারে অশান্তি দেখা দিল। ঐ সময় এল দিল্লীতে আমার এক জ্ঞাতি ভাই যুদ্ধ-ফেরত ক্যাপ্টেন রঞ্জিৎ সিং। আমাকে তুই সুপুরুষ বলতিস কিন্তু রঞ্জিৎকে দেখলে তুই বোবা হয়ে যেতিস। আগুনের মত রূপ তার। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতায় তার জুড়ি মেলা ভার। যেমন লম্পট তেমনি মদ্যপ—

হুঁ। তারপর?

তারপর আর কি, দুই উচ্ছৃঙ্খলে হল যোগাযোগ। দুঃখে, আক্রোশে, লজ্জায় সর্বক্ষণ আমি জ্বলতাম তবু চুপ করেই থাকতে হত—ঘরের কেলেঙ্কারি—এতে আমারই লজ্জা, আমারই অপমান।

আই সুড্ সে ইউ আর এ ফুল—

ফুলই বটে। তার পর শোন। ঐ রঞ্জিৎই একদিন এক পার্টিতে পদ্মিনীকে নিয়ে গিয়ে এক বোম্বের ফিল্ম প্রোডিউসারের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিল।

সেই প্রোডিউসার ওদের দুই গর্দভকে তাতিয়ে তুলল তার নেক্সট প্রোডাকশনে হিরো এবং হিরোইন হয়ে নামবার প্রলোভন দেখিয়ে দিনের পর দিন।

চমৎকার নাটক তো! তোর স্ত্রীর মাথায় বোধ হয় অতঃপর হিরোইন হবার স্বপ্ন বাসা বাঁধল?

তাই! এতদিন সব অত্যাচার সহ্য করেছি কিন্তু এবারে সত্যি-সত্যিই রুখে দাঁড়ালাম। স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম ওসব চলবে না।

তারপর?

তারপর একদিন রিভলবার হাতে তাড়া করে রঞ্জিৎকে বাড়ি থেকে বের করে দিলাম আর পদ্মিনীকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে দিলাম। সত্যি আমি তখন মরীয়া হয়ে উঠেছি! একটু থেমে আবার করণ সিং তার বক্তব্য শুরু করল, কিন্তু তার দুদিন পরেই ঘটল সেই ঘটনা—।

কি? পালাল বোধ হয় তোর স্ত্রী?

হ্যাঁ,—কিন্তু পালিয়েছে যখন তার যেখানে খুশি সে যাক। তবে—

তবে?

সেই সঙ্গে সেই কালনাগিনী আমাদের বংশের পরিবারের আশীর্বাদটি পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে ভেগেছে। হ্যাঁ—মনে আছে বোধহয় তোর হীরা চুনি পান্না খচিত বহু মূল্যবান এক সোনার রণছোড়জীর মূর্তি ছিল আমাদের ঘরে—

হ্যাঁ, বলেছিলি তুই—।

দেশ ছেড়ে চলে আসবার সময় কেউ তো ঘরে আর রইল না। বৎসর খানেক আগে মার মৃত্যু হয়েছে, বাপকে তো সেই ছোটবেলাতেই হারিয়ে ছিলাম, কার ভরসায় দেশের ঘরের সিন্দুকে ঐ বহুমূল্য মূর্তিটি রেখে আসব। তাই দিল্লীতেই সঙ্গে করে এনে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলাম। আমারই শোবার ঘরে একটা লোহার সিন্দুকে গোপনে সেই মূর্তিটি রাখা ছিল। যাবার সময় সর্বনাশী সেই মূর্তিটা নিয়ে ভেগেছে—। কাজ থেকে ফিরে এসে দেখি সেও নেই আর শূন্য সিন্দুক, মূর্তিটিও নেই।

পদ্মিনী নিশ্চয়ই জানত সেই মূর্তিটার কথা?

জানত। ও হারামজাদী ভেগেছে যাক, কিন্তু মূর্তিটা আমায় ফিরে পেতেই হবে। আজ দু মাস হন্নে হয়ে বেড়াচ্ছি সেই মূর্তিটার জন্যই রায়।

॥ তিন ॥

পদ্মিনী এখন কোথায় জানিস কিছু?

হ্যাঁ—সুটিংয়ের জন্য এখন দিন-দশেক হল কলকাতাতেই এসে আছে—এই কলকাতায়?

হ্যাঁ—এই গ্র্যান্ডেই। আমার সুটটা তিনতলায়, সে থাকে চারতলায় একটা সুট নিয়ে—

আর তোর সেই জ্ঞাতি ভাই রঞ্জিৎ?

সে যোধপুরেই প্রথম গিয়েছিল শুনেছিলাম, এখন নাকি আছে লাহোরে। আজকাল অর্ডার সাপ্লাইয়ের ছোট খাটো একটা ব্যবসা করছে।

সে কি! সে তা হলে বইতে নামে নি?

না। কিছুদিন হল শুনেছি সে নাকি বিয়েও করেছে। সংসার পেতে বসেছে।

তাহলে পদ্মিনীর সঙ্গে সে নেই।

না।

কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণ কি যেন আপন মনে ভাবল। পাইপে অগ্নি-সংযোগ করে নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগল। তারপর এক সময় আবার বললে, তোর ধারণা তা হলে ঐ পদ্মিনীই সেই মূর্তিটা চুরি করেছে?

আই অ্যাম ডেড সিওর কারণ সে ও আমি ছাড়া ঐ মূর্তির কথা দ্বিতীয় কোন প্রাণীই যেমন জানত না, তেমনি জানত না কেউ কোথায় সেটা আছে—

আচ্ছা একটা কথা করণ, তোদের ছাড়াছাড়ি হবার পর আর তোর সঙ্গে পদ্মিনীর মুখোমুখি দেখা বা কথাবার্তা কখনো হয়েছে?

হয়েছে। তার খোঁজ পাওয়া অবধি সে যেখানে গেছে আমিও গিয়েছি এবং অন্তত হাজার বার অনুরোধ জানিয়েছি, কাকুতি-মিনতি করেছি এমন কি প্রাণের ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছি। বলেছি, সে যা খুশি তার করুক, জাহান্নামে যাক, নরকে যাক কিছু আমার এসে যান না তাতে—যত টাকা চায় তাও দিতে রাজি আছি—আমার সর্বস্ব দেব, কেবল মূর্তিটা আমার ফিরিয়ে দিক।

কি জবাব দিয়েছে পদ্মিনী তাতে?

এক জবাব। সে মূর্তিটা নেয় নি, জানে না মূর্তি সম্পর্কে কিছু।

আই সি! তা এখন তার চলছে কি করে? কোম্পানী থেকে মোটা মাইনে পায় বুঝি?

জানি না কি পায়—সে তো এখন অভিনেত্রীই শুধু নয় বোম্বে সাইন অ্যান্ড আর্ট ফিল্ম কোম্পানীর বিরাট চিত্র প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার চুনিলালের রক্ষিতা। ওকে আমি হত্যাই করে ফেলতাম রায় কিন্তু কেবল পারছি না ঐ মূর্তিটা আজও উদ্ধার করতে পারছি না বলেই—কথাগুলো শেষ করে একটা রুদ্ধ আক্রোশে যেন গর্জাতে লাগল করণ সিং।

ইতিমধ্যে কথা বলার ফাঁকে প্রায় দশটি বড় পেগ নিঃশোষিত করেছিল করণ সিং। আবার তাকে শূন্যে পাত্রে মদ ঢালতে দেখে বাধা দিল কিরীটী, কি করছিস সিং—আর খাস না—

কিছু হবে না রায়, সারাটা রাত ধরে এমনি চালাই তবু এতটুকু মাতাল হই না।

কিন্তু মাতাল হোস বা না হোস লিভারটা যে একেবারে শেষ হয়ে যাবে এভাবে মদ্যপান চালালে—এভাবে সুইসাইড করে লাভ কি?

বেঁচে থেকেই বা লাভ কি আর বলতে পারিস রায়? মান গেছে ইজ্জত গেছে—এত বড় রাজবংশের মুখে এমনি করে কালি লেপে দিল কালনাগিনী—বলতে বলতে আবার ভরা পাত্রটা তুলে নিয়ে দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে বললে কি যে আগুন জ্বলছে দিবারাত্র রায় যদি বুঝতিস, কি করে যে এই দুই মাস আমার কেটেছে, এক এক সময় আমার এখন কি মনে হয় জানিস?

কি?

ও হারামজাদী নিশ্চয়ই সে মূর্তিটা বিক্রী করে দিয়েছে—

মূর্তিটার সাইজ কি?

বেশী নয় এই ইঞ্চি-তিনেক লম্বা ও ইঞ্চিখানেক চওড়া হবে।

ভিতরটা মূর্তির ফাঁপা না সলিড—নিরেট?

কিছুটা ফাঁপা আর কিছুটা বোধহয় সলিড—আমি ঠিক ভাল করে তো কখনো পরীক্ষা করে দেখি নি—

হীরা জহরতের কথা যা বলছিলি—

ছোটয় বড়য় মিশিয়ে প্রায় পাঁচখানা হীরা বসানো আছে মূর্তির গায়ে—যার দ্যুতিতে অন্ধকারেও মূর্তিটা ঝলমল করতো।

হীরাগুলো খুলে নেওয়া যেতে পারে?

তা যাবে না কেন? চেষ্টা করলে যায় বৈকি—

তা হলে আমার মনে হয় হয়তো এখনো মূর্তিটা সে বিক্রী করে নি।

ও শয়তানীকে তুই জানিস না কিরীটী, ও সব পারে।

তা হলেও যদি সে সত্যিই চুরি করে গিয়ে থাকে এত তাড়াতাড়ি বিক্রী করতে সাহস পাবে না।

কিসে তোর এ ধারণা হল রায়?

প্রথমতঃ যার আশ্রয়ে সে বর্তমানে আছে তুই-ই তো বললি তার অর্থের অভাব নেই, বিরাট ধনী। সে নিশ্চয়ই পদ্মিনীর কোন চাহিদাই এখনো মিটাতে পশ্চাদপদ হবে না! দ্বিতীয়তঃ সে জানে সর্বদা তুই সর্বত্র ছায়ার মতই অনুসরণ করছিস। এবং তৃতীয়তঃ সে জানে মূর্তির ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করেই তুই তার পিছু নিয়েছিস!

কিন্তু তাতেই বা কি এসে গেল! মূর্তিটা তো উদ্ধারের কোন আশাই দেখছি না।

একেবারে সে আশা নেই তাই বা বলি কি করে?

সত্যি, সত্যি—বলছিস কিরীটী, আশা আছে?

চেষ্টা করব নিশ্চয়ই আমরা। কিন্তু একটা কথা, পুলিশকে কি একথা জানিয়েছিস?

না। এখনো জানাই নি। তবে ভাবছি—

না। জানাস না! দুটো দিন তুই আমাকে একটু ভাবতে দে। আজ রাত হল উঠি! বলতে বলতে কিরীটী উঠে দাঁড়ায়।

চললি!

হ্যাঁ—তবে একটা কথা বলে যাই—তোর স্ত্রীর উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেমন সর্বদা রেখে আসছিস রেখে যাবি—

ডোন্ট সে স্ত্রী—একটা ভ্রষ্টা—ও আমার কাছে আজ মৃত। ডেড।

কিরীটী অতঃপর সে রাত্রের মত বিদায় নিল।

॥ চার ॥

পুওর, বেচারী করণ সিং? বাড়ি ফেরার পথে ঐ একটি কথাই বুঝি বারবার মনে হচ্ছিল কিরীটীর। কিন্তু সেই সঙ্গে পদ্মিনীর চিন্তাটাও মনে তার একটা অস্পষ্ট কুজ্ঝটিকার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একমাত্র করণ সিং ছাড়া আর বাদবাকি সবাই তার আপাত অপরিচিত।

রঞ্জিৎ সিং, করণের জ্ঞাতি ভাই, যে লোকটা যুদ্ধ ফেরতা মদ্যপ ও উচ্ছৃঙ্খল! বোম্বাই সাইন অ্যান্ড আর্ট ফিল্মস-এর প্রডিউসার ডিরেক্টর চুনিলাল। আর অনিন্দ্য সুন্দরী এক নারী শ্রীমতী পদ্মিনী। মরুসুন্দরী পদ্মিনী। তিনটি পুরুষ ও একটি নারী। একটি বহ্নি—আর তিনটি রূপমুগ্ধ পতঙ্গ। নারীকে নিয়ে পুরুষের এই লালসা আজকের নয় এবং নতুন কিছুও নয়। বিশেষ করে সেই নারী যদি আবার রূপবতী হয়। চাক্ষুস দেখে নি কিরীটী আজও পদ্মিনীকে, তবে তার কৈশোরের যে চিত্র একদা সে করণ সিংয়ের কাছে দেখেছিল, পূর্ণযৌবনা বিশেষ করে আজও যে নারীদেহে মাতৃত্ব আসে নি সে যে আজ কতখানি নয়ন মন লোভনীয়া হয়ে উঠেছে, কিরীটী সেটা অনুমান করতে পারে বৈকি। এবং এটাও সে বুঝতে পেরেছে একদা এদেরই বংশের সেই রাজবধূ সিংহলনন্দিনী পদ্মিনীকে কেন্দ্র করে রাজস্থানের মরুপ্রান্তরে সে ঝড় বয়ে গিয়েছিল—বহুবর্ষ পরে সেই কুলোদ্ভবা আর এক নারীকে কেন্দ্র করেও কয়টি পুরুষের মনে সেই ঝড়ই আজ দেখা দিয়েছে।

তবে সেদিনকার পদ্মিনী ছিল সত্যিই লাজবতী কুলবধূ—সতী সীমন্তিনী।

আর আজকের পদ্মিনী চটুলা 'নৃত্যপটিয়সী বারনারী।'

সেদিন ছিল এক বাদশা আলাউদ্দীন আর আজ তিনটি পুরুষ ঃ করণ সিং, রঞ্জিৎ সিং ও চুনিলাল।

আসল কার্যকারণ পদ্মিনীই—হীরা—জহরৎ খচিত রণছোড়জীর স্বর্ণমূর্তিটি—বর্তমান পদ্মিনী—পর্বের অংশমাত্র।

কিন্তু কে নিতে পারে সেই রণছোড়জীর স্বর্ণমূর্তিটি!

কার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুবিধা ছিল করণ সিংয়ের লোহার সিন্দুক থেকে মূর্তিটা চুরি করা? নিঃসন্দেহে পদ্মিনীর পক্ষে সম্ভাবনা দেখা যায়।

কিন্তু কি উদ্দেশ্যে সেই স্বর্ণমূর্তিটি চুরি করতে পারে? অর্থের লোভে, সম্ভব নয়। কারণ স্বামীর গৃহ ছেড়ে যার আশ্রয়ে সে গিয়েছিল এবং বর্তমানে যার কাছে আছে তার তো—মানে চুনিলালের অর্থের কোন অভাব নেই। তা ছাড়া রক্ষিতার মনোনয়ন ও তোষণ তো পুরুষের বিলাস ও অহমিকা। সে ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজনে কেন পদ্মিনী চুরি করবে মূর্তিটি? তবে হ্যাঁ—অলঙ্কারের জন্য মূল্যবান জহরতগুলোর লোভে জহরৎখচিত মূর্তিটা সে চুরি করতে পারে।

কিন্তু তার আগে একবার পদ্মিনীর সঙ্গে তাকে আলাপ করতেই হবে।

পদ্মিনীর সঙ্গে আলাপ করতে কিরীটীর খুব অসুবিধা হল না। তার এক বিশিষ্ট পরিচিত চিত্র পরিচালককে বলতেই সে একটা ব্যবস্থা করবে বললে।

তবু সে বললে, কিন্তু ব্যাপার কি রহস্যভেদী, হঠাৎ চিত্রাভিনেত্রীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ—

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, একটা ছবির প্রযোজনা করব ভাবছি। শোনা যায় এতে রাতারাতি যেমন ফকিরী মেলে তেমনি নাকি রাতারাতি বাদশাহীও হাতের মুঠোর মধ্যে আসতে পারে—

তাই বুঝি তোর ধারণা?

ধারণা নয়—তাই তো দেখছি। কেউ যেমন একদিন ডকের কেরাণী ছিল, গোটা-দুই ছবিতে নেমে তেমনি ছাপা বরাত না থাকলে পাবলিসিটির দৌলতে এবং প্রেম-পাগল বেকার একদল অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের চোখে ও হৃদয়ে ধাঁধা লাগিয়ে রাতারাতি মানকে বা গোবরা থেকে মলয়েশকুমারে পরিণত হয়, তেমনি কোন মতে হাজার কয়েক টাকা কোন নির্বোধ ধনীর মাথায় হাত বুলিয়ে একটা লাগসই উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ নায়ক-নায়িকা নিয়ে অনুরূপ একটা গল্প দিয়ে ছবি করে ফেলতে পারলেও রাতারাতি মোটা টাকার মুনাফা কামিয়ে নিতে যখন পারে—

রাবিশ।

রাবিশ নয় সত্যি। দেখ না, পদ্মিনী দেবীটির সঙ্গে একটিবার আলাপ করিয়ে দে—তার পর দেখিস—

থাক আর দেখতে হবে না। কাল পরশু এক সময় ওর অফ টাইম দেখে—আবার চুনিলাল যখন না থাকে বুঝে এসে ডেকে নিয়ে যাব।

দিন দুই বাদেই সেই সুযোগটা মিলে গেল।

কিরীটীর পরিচালক বন্ধু অনিল রায় কথাটা মিথ্যে বলে নি। সত্যিই চুনিলালের সদা-লোলুপ ব্যঘ্রদৃষ্টিকে এড়িয়ে কারো পক্ষেই পদ্মিনীর সঙ্গে নিভৃত দর্শনটা সম্ভবপর ছিল না।

শকুনের মত যেন বিরাট ডানা মেলে আগলে রেখেছে সর্বদা চুনিলাল তার রক্ষিতাকে। স্বাভাবিক।

স্ত্রী নয় রক্ষিতা—তার উপরে আবার গৃহত্যাগিনী, অসামান্য রূপবতী ভদ্রঘরের স্ত্রী। এবং সেই কারণেই বোধ হয় আয়োজনেরও কোন ত্রুটি ছিল না কোন দিকে। বিলাসের উপকরণে সম্পদের জৌলুসে স্বভাবতঃই বহির্মুখিনী পদ্মিনী মনটি যেন সযতনে আষ্টেপৃষ্ঠে আবৃত করে রাখবারই সর্বদা চেষ্টা করেছিল চুনিলাল।

পাছে না পাখী পালায়।

একান্ত প্রয়োজন না হলে চুনিলাল পদ্মিনীকে বড় একটা চোখের বাইরে করত না।

কিন্তু দৈবক্রমে একটা সুযোগ এসে গেল। সুটিংয়ের পরে স্টুডিও থেকে ফেরবার পথে একটা অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে কয়েক দিনের জন্য চুনিলালকে একান্ত বাধ্য হয়েই হাসপাতালের কেবিনে গিয়ে ভর্তি হতে হল।

চুনিলালের অবিশ্যি ইচ্ছা ছিল পদ্মিনীও তার সঙ্গে কেবিনে থাকে, কিন্তু কেবিনের ইন্‌চার্জ সাহেব ডাক্তার মাথা নেড়ে জানালেন তা সম্ভব নয়।

অগত্যা সকলে একবার আহার্য নিয়ে ও বৈকালে একবার করে ঘণ্টা তিনেকের জন্য পদ্মিনী হাসপাতালে যাতায়াত করতে লাগল। চুনিলাল অসুস্থ, কাজেই তার বইয়ের সুটিং বন্ধ। দ্বিপ্রহরটা পদ্মিনীর হোটেলেই কাটে.একা একা!

ঐ উপযুক্ত অবসরটিরই সুযোগ নিল অনিল।

কলকাতায় সুটিংয়ে আসবার পর অনিলের সঙ্গে স্টুডিওতেই আলাপ হয়েছিল পদ্মিনীর। অনিল শুধু একজন নামী চিত্র পরিচালকই নয়, প্রথম শ্রেণীর একজন ক্যামেরাম্যান ও ব্যবহারে কথায়-বার্তায় চমৎকার। কাজেই চুনিলাল তেমন আপত্তি করে নি ওদের আলাপে। চুনিলালের নিশ্চিন্ত থাকার আরো একটা কারণ ছিল অবিশ্যি—অনিলের বয়স পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে এবং চুলে পাক ধরেছে।

ফোনে পূর্ব অ্যাপয়েন্টমেন্ট মতই কিরীটী অনিলের সঙ্গে এক দ্বিপ্রহরে এল চুনিলালের সুটে।

পদ্মিনীকে সামনা সামনি চাক্ষুষ দেখে কিরীটীরও বুঝি কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হয় না। সত্যিই রূপের যেন তার তুলনা নেই। জ্বলন্ত একখানি অগ্নিশিখা যেন।

প্রাথমিক আলাপটা অনিলই করে দিল।

ঘণ্টা দুই আলোচনার পর কিরীটী যখন পদ্মিনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঐ হোটেলেই করণ সিংয়ের ঘরের দিকে চলল, পদ্মিনী সম্পর্কে তিনটি ব্যাপার তখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এক, পদ্মিনী ঝোঁকের মাথায় এবং কিছুটা স্বামীর প্রতি অন্ধ আক্রোশে গৃহ ছেড়ে চুনির ঘরে উঠলেও চুনির সঙ্গে ঠিক যেন সে খুশী হয়ে ঘর করতে পারছে না। দ্বিতীয়, অর্থের চাইতেও তার নাম, প্রতিপত্তি বা গ্ল্যামারের মোহ অনেক বেশী। তার মন পরিপূর্ণ-ভাবেই বহির্মুখী। ঘরের মেয়ে বা বধূ সে কোনদিন

হতে পারে নি, আজও নয়। এবং ভবিষ্যতেও মেনে নিতে পারবে না সে স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেষ্টনী এ জীবনে কোনদিন। করণ সিং সেইখানেই পদ্মিনীর প্রকৃতিকে বুঝতে না পেরে তাকে ঘরে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করে মারাত্মক ভুল করেছিল। আর এও ঐ-সঙ্গেই কিরীটী বুঝেছিল, চুনির শিকলও ঐ মেয়ে একদিন কেটে বের হবেই।

তৃতীয়তঃ, পদ্মিনীর স্বভাব ও মন যতই চটুল ও বহির্মুখী হোক না কেন আসলে সে ক্রূর বা নীচমনা নয়। একটা শিশুসুলভ সহজ সারল্য এখনো তার মনের মধ্যে কোথায় যেন ঘুমিয়ে আছে যেটা কোথায় হঠাৎ মেঘে ঢাকা আকাশে বিদ্যুতের চকিত ইশারার মতই বুঝি ঝল্‌কে ঝল্‌কে ওঠে।

করণ সিং ঘরেই ছিল। সামনে তার মদের পাত্র। ঘরের ভারী পর্দাগুলো চারদিক থেকে টেনে দিয়ে দ্বিপ্রহরের সূর্যালোককে প্রবেশাধিকার না দিয়ে ঈষৎ ঠাণ্ডা প্রায়ান্ধকারে বসে বসে নির্জলা মদ্যপান করছিল।

বন্ধ দরজার গায়ে নক পড়তেই ঈষৎ বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে আহ্বান জানাল। কাম ইন—

কিন্তু পরক্ষণেই কিরীটী ঘরে এসে প্রবেশ করতেই মুখের বিরক্তি অপসারিত হল। সাগ্রহে বললে, কিরীটী, কিবা বার্তা?

কিরীটী বসতে বসতে বললে, পদ্মিনীর সঙ্গে আলাপ করে এলাম করণ—

সেকি!

কেন আশ্চর্য হবার এতে কি আছে। সে তো আর এখন কুলবধূ নয়!

কিন্তু সেই চুনি জাম্বুবানটা—

সে তো দিন-চারেক হল হাসপাতালে প্লাস্টার করে পড়ে আছে।

হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম বটে!

একটা কথা বলব করণ যদি কিছু মনে না করিস্?

নিশ্চয়ই—বল—

সেদিন তোর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আর কিছু না হলেও এটা বুঝেছিলাম পদ্মিনীকে আজও তুই ভুলতে পারছিস না—

না, না—তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে ওঠে করণ সিং, ইউ আর রং, অ্যাবসলুটলি রং—

না—বরং তোর কথাই যদি মেনে নিতে হয় তো বলব—তোর মনের সেই গোপন ইচ্ছাটা তুই বোধহয় নিজেও জানিস না। কিন্তু একটা কথা তোকে বলতে পারি করণ, পদ্মিনী আর কোনদিনই তোর ঘরে ফিরে আসবে না—

আসবে না?—একটা ব্যর্থ চাপা বাসনার মতই যেন প্রশ্নটা উচ্চারিত হল সহসা করণের কণ্ঠ থেকে।

না, আসবে না। আর যদি আসেও, সেও থাকবে না আর তুইও তাকে ধরে রাখতে পারবি না।

কেন?

কারণ, ও মেয়ে ঘরের নয়, বাইরের। ঘরে এনে জোর করে ওকে ধরে রাখবার

চেষ্টাটাই হবে ব্যর্থ। তাই ওদিক থেকে তোকে হয়তো কোন সাহায্যই করতে পারব না করণ, কিন্তু তোর স্বর্ণমূর্তিটা হয়তো আমি উদ্ধার করে দিতে পারব!

পারবি?

পদ্মিনীর সঙ্গে আলাপের পর মনে হচ্ছে পারব।

তোর ধারণা মূর্তিটা তাহলে ওর কাছেই আছে?

তা জানি না—তবে—

তবে?

ব্যস্ত হোস না, ফিরে পাবি।

অতঃপর করণ সিং যেন কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাসকে চেপে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, বেশ—তুই যদি পারিস না হয় উদ্ধার করে দে!

দেব। আমি কিরীটী রায় তোকে কথা দিচ্ছি করণ—দেব—উদ্ধার করে দেব তোর রণছোড়জীর মূর্তি।

॥ পাঁচ ॥

দিন-দুই পরে আবার কিরীটী ও পদ্মিনীর সাক্ষাৎকার হল। এবারে গ্র্যান্ডে নয়, অন্য একটি কুখ্যাত নিশিরাতের পানশালার নিভৃত একটি কিউবিক্‌ল্‌-এর মধ্যে।

সামান্য একদিন ঘণ্টা দুয়েকের আলাপেই কিরীটীর চোখে পদ্মিনীর চরিত্র স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উপযুক্ত প্রলোভনের একটি টোপ ফেলে তাই পদ্মিনীকে ঐখানে আকর্ষণ করে আনতে কিরীটীর এতটুকুও বেগ পেতে হয় নি।

সামনে পরিপূর্ণ মদের সুদৃশ্য বেলোয়ারী পাত্র বেশ কড়া কয়টি পেগ ইতিমধ্যে পদ্মিনীকে কৌশলে কিরীটী উদরসাৎ করিয়েছিল। এবং তার আকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

সেই প্রতিক্রিয়াতেই বিলোল নয়নে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে পদ্মিনী বলেছিল, ঠিকই বলেছেন মিঃ রায়, ঐ শকুনটার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আমিও হাঁপিয়ে উঠেছি।

আপনি তার বিবাহিতা স্ত্রী নন, এভাবে জবরদস্তি করে আপনাকে আটকে রাখবার কোন এক্তিয়ার নেই তার। এভাবে যে আপনার মত এক প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীকে কেন সে আটকে রেখেছে তাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন—আপনাকে এইভাবে এক্সপ্লয়েট করে নিজে সে চিত্রজগতে অর্থ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করবে বলেই।

সবই বুঝি মিঃ রায়, কিন্তু এই আমার প্রথম ছবি, ওর মত একজন নামী ডিরেক্টারকে বাধ্য হয়েই আমাকে কতকটা বর্তমানে আঁকড়ে ধরে থাকতে হচ্ছে। জানেন না আপনি ও আমার যা পাব্লিসিটি করছে—আমাকে প্রথম ছবিতেই এস্টাবলিশ করবে প্রতিজ্ঞা করেছে। কতকটা তার জন্যই ওর অত্যাচার আমি সহ্য করছি। নইলে—

কিন্তু এখন না সরে গেলে পরে ওর ক্লাচ থেকে নিজেকে আপনার মুক্ত করা আরো কষ্টসাধ্য হবে তাও জানবেন।

তা কেন হবে। ছবিটা একবার রিলিজ হোক না—ওকে আমি, দেখবেন, ঠিক তখন কলা দেখাব যদি অবিশ্যি ছবিটা ওর হিট করে। ও-তো বলছে, ছবি হিট করবেই—

কোন প্রডিউসার বা ডিরেক্টরই জোর করে আগে থাকতে ও কথা বলতে পারে না। আপনাদের বিচারে ছবি খুব ভাল হলেও দর্শকরা নিতে পারে—

সে সম্ভাবনাও আছে বৈকি।

তবে? কেন আপনি আপনার অসাধারণ সম্ভাবনাকে নষ্ট করবেন ওর হাতে এভাবে এক প্রকার বন্দিনী থেকে?

কথাটা আপনি মিথ্যা বলেন নি মিঃ রায়, আর তা ছাড়া রঞ্জিৎ—

কিরীটী নামটা শোনামাত্রই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে! বলে, রঞ্জিৎ?

কিন্তু পদ্মিনী ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। মদে ইদানীং পদ্মিনী এতটা পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিল যে চট করে আজকাল তার খুব বেশী আত্মবিস্মৃতি হত না। প্রচণ্ড নেশার মধ্যেও একেবারে সবকিছু ভুলে বসে থাকত না বা অসংলগ্ন কিছু প্রকাশ করে বসত না।

তাই তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে পদ্মিনী বললে, না—কিছু না—

কিরীটীও আর বিশেষ কোন আগ্রহ না দেখিয়ে চুপ করে গেল।

কিরীটীর সঙ্গে পদ্মিনী তৃতীয় সাক্ষাৎ হল আবার দুদিন পরেই। পূর্বোক্ত সেই নিশিরাতের পানশালায় সেই কিউবিক্‌লেই। এবং এবারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল পদ্মিনীই।

দু চারটে মামুলি কথাবার্তার পর এবং দুটো কড়া পেগ উদরস্থ করবার পরে সহসা পদ্মিনী প্রশ্ন করে বসল, করণের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে মিঃ রায়?

কিরীটী মৃদু হেসে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, আছে এবং আজকের নয় অনেক দিনের পরিচয়।

হুঁ—তা হলে করণই আপনাকে আমার পিছু লাগিয়েছে?

এই প্রশ্নটির জন্য কিরীটী সত্যিই প্রস্তুত ছিল না। তাই বোধ হয় একটু সময় লাগে তার জবাবটা দিতে। একটু সময় নিয়ে বলে, এ প্রশ্নটা কেন করলেন ঠিক কিন্তু বুঝতে পারছি না।

ওর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল জানেন?

এবারে কিরীটী যেন একটু চমকাবার ভান করেই বলে, সেকি! সত্যি বলছেন?

সত্যি! কিন্তু সত্যিই বলতে চান এ খবরটা আপনি জানতেন না মিঃ রায়?

না-তো—

করণ বলে নি?

না। কিরীটী চমৎকার অভিনয় করে চলে।

ওর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল! পরশু যখন বিকেলের দিকে ও আপনাকে আমার ঘর থেকে হোটেলে এক সঙ্গে বের হতে দেখে আপনাকে ডাকল, তখন কিন্তু সেই আশাই করেছিলাম—ও আপনাকে আমাদের সব কথা নিশ্চয়ই বলেছে।

না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনার সম্পর্কে কোন কথাই আজ পর্যন্ত ও আমাকে বলে নি।

আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম—

তবে একটা কথা বলছিল—

কি? কি বলছিল?

ওর কি একটা স্বর্ণমূর্তি নাকি ওর বাড়ির সিন্দুক থেকে চুরি গেছে—

সহসা ঐ সময় কিরীটী লক্ষ্য করে—কথাটা তার মুখ থেকে উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন পদ্মিনীর সমস্ত মুখখানা মুহূর্তে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল! এবং তার পরই ব্যগ্রকণ্ঠে শুধাল, স্বর্ণমূর্তি—মানে রণছোড়জীর মূর্তিটা?

হ্যাঁ—সে মূর্তিটার ব্যাপার জানেন নাকি কিছু আপনি?

অ্যাঁ—পদ্মিনী যেন দ্বিতীয়বার চমকে উঠে বলে, হ্যাঁ—কিন্তু—

কি?

সে মূর্তির কথা তো বাইরের কারো পক্ষেই জানবার কথা নয় মিঃ রায়?

কেন?

তার কারণ সেই মূর্তির কথা একমাত্র করণ ও আমি ছাড়া আর তো কেউ জানত না।

ঠিক বলেছেন আপনি? আর কেউ জানত না আপনারা দুজন ছাড়া?

না—তারপরই যেন সহসা কিছুক্ষণের জন্য পদ্মিনী স্তব্ধ হয়ে থাকে। কিরীটীর মনে হ'ল কাজলটানা ঈষৎ রক্তিমাভ পদ্মিনীর চক্ষু দুটির কিনারে কিনারে যেন অশ্রুর আভাস। হাতে ধরা অর্ধপূর্ণ বেলোয়ারী পাত্রটি নিয়ে কেমন যেন অন্যমনস্ক একটা ভাব পদ্মিনীর।

বুঝতে পারে কিরীটী কিছু একটা ভাবছে পদ্মিনী।

মিঃ রায়? এক সময় আবার ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল পদ্মিনী।

বলুন?

আপনার বন্ধুকে বলবেন মূর্তিটা উদ্ধারের ছলে তিনি যেন আর এমন করে আমার পিছনে পিছনে ছায়ার মত না ঘুরে বেড়ান।

কিরীটী স্পষ্ট বুঝতে পারে পদ্মিনীর গলাটা যেন কেমন ধরা ধরা। মুখটা নিচু করে তাকিয়েছিল পদ্মিনী তার হস্তধৃত গ্লাসটার দিকে। কিরীটী নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। গ্লাস ধরা হাতটা যেন মৃদু মৃদু কাঁপছে পদ্মিনীর।

একটা কথা বলব?

বলুন। মুখ তুলে তাকাল পদ্মিনী। তারপরই পূর্ববৎ মৃদুকণ্ঠে বললে, জানি আপনি কি বলবেন মিঃ রায়। কিন্তু সত্যিই তা অসম্ভব। আর এ জীবনে কোন দিন তা হবেও না। তারপর আবার একটু থেমে পদ্মিনী বলে, আপনি হয়তো জানেন না, আর জানবার কথাও আপনার নয়! আপনার বন্ধুটি শুধু নিষ্ঠুরই নয়—নীচ। কিন্তু আর নয় উঠুন। এই কথাগুলো বলবার জন্যই আজ আপনাকে কষ্ট দিয়েছে—বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল পদ্মিনী।

কিরীটী সে রাত্রে বুঝেছিল মেয়েটি যত জঘন্য চরিত্রেরই হোক না কেন, বিলাস উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে আজও অন্তর্নিহিত নারী-মনটি তার একেবারে শুকিয়ে যায় নি। পঙ্কিলতার পল্বলে আজও বইছে নিঃশব্দে একটি মন্দাকিনীর শাশ্বত স্রোত। এবং সে

রাত্রে মেয়েটিকে কেন্দ্র করে নিঃশব্দে একটি বেদনার অনুভূতি যেন কিরীটীর মনের মধ্যে আলোড়িত হতে থাকে।

॥ ছয় ॥

পরের দিন কিরীটী করণ সিংয়ের সঙ্গে হোটেলে দেখা করে বললে চল একবার লাহোর ঘুরে আসি—

লাহোর হঠাৎ?

তোর সেই জ্ঞাতি ভাই রঞ্জিতের সঙ্গে একটিবার আলাপ করব।

কিন্তু সে-তো শুনেছি কখনো লাহোরে আবার কখনো যোধপুরে থাকে?

বেশ তো লাহোরে তাকে না পাই যোধপুরেই যাবো। রাজস্থানটা দেখবার একবার বাসনা অনেকদিন থেকেই আছে, এই ফাঁকে সেই বাসনাটা তোর রঞ্জিৎ ভাইয়ের দৌলতে চরিতার্থ হয়ে যাবে।

কিন্তু করণ সিংয়ের লাহোর যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ করে উৎসাহ দেখা গেল না। আপাততঃ কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল ছেড়ে সে কোথাও নড়তে চায় না।

এই গরমে লাহোর যাবি? কিছুদিন পরে গেলে হত না?

না। কালই রওনা হব ভাবছি, আর তুইও যাবি।

লাহোরের আনারকলিতে করণের এক বন্ধু ছিল। সেইখানেই গিয়ে উঠল কিরীটী করণের সঙ্গে। এবং পরের দিন খোঁজ নিয়ে জানা গেল সৌভাগ্যক্রমে রঞ্জিৎ সিং তখন লাহোরেই আছে। লাহোরের পুরাতন ঘিঞ্জি অংশে থাকে রঞ্জিৎ সিং। এবং কিরীটী করণের সেই পরিচিত ভদ্রলোকের মুখেই শুনল করণ যে বলেছিল রঞ্জিতের ছোট খাটো অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা তা নয়, ব্যাপারটা জমজমাট! করমচাঁদ নামে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের একটি অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা ছিল এবং সেটা পড়তি মুখে চলছিল। সেটাই কিনে নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করেছে রঞ্জিৎ ঃ সিং এন্ড কোং।

বিরাট একটা তিনতলা বাড়ি। তার একতলায় দোতলায় অফিস এবং তিনতলায় থাকে রঞ্জিৎ সিং। ঐ দিনই দ্বিপ্রহরে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এক ফার্ম অফিসের রিপ্রেজেনটেটিভের ছদ্মনামে বিক্রম কাপুর পরিচয়ে সন্ধ্যার পর গিয়ে কিরীটী হাজির হল রঞ্জিতের ঘরে।

পূর্বেই কিরীটী খোঁজ নিয়েছিল বৌ কাছে থাকে না তার, একাই থাকে রঞ্জিৎ সিং। চাকর-বাকরদের নিয়েই থাকে। তাই সোজা একেবারে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যায়।

তিনতলায় ওঠবার সিঁড়ির মুখেও কাউকে দেখতে পেল না কিরীটী। একটু ইতস্ততঃ করে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে থাকে। ঐ সময় একজন ভৃত্যর সঙ্গে মাঝামাঝি সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল।

মিঃ সিং আছেন?

হ্যাঁ—যান উপরে—

বেশ বড় আকারের একটা ঘর, মেঝেতে কার্পেট বিছানো। জানালায় জানালায়

খসখস—ঘরের মধ্যে পাখা ঘুরছে। ঘরের মধ্যস্থানে টেবিলের উপর কেরোসিন টেবিল ল্যাম্প। কিরীটীর সাড়া পেয়ে রঞ্জিৎ সিং আহ্বান জানাল।

কিরীটী ঘরের মধ্যে ঢুকল। চমৎকার মূল্যবান আসবাবপত্রের সুসজ্জিত ঘরটি। দামী একটা সোফার উপরে পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরিহিত এক ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ভদ্রলোক বসেছিল। সেই বললে, আসুন মিঃ কাপুর।

মিঃ রঞ্জিৎ সিং?

ইয়েস—

করণ সিং মিথ্যা বলে নি। রঞ্জিতের মত সুপুরুষ কচাদিৎ বড় একটা চোখে পড়ে না। রূপকথার রাজপুত্রের মতই চেহারা যেন।

বসুন মিঃ কাপুর।

কিরীটী অদূরবর্তী সোফায় রঞ্জিতের মুখোমুখি উপবেশন করল। এবং দু চারটে মামুলি কথাবার্তার পর কিরীটী এক সময় বললে, মিঃ সিং, আপনি শুনেছি একজন যোধপুরের লোকবিশ্রুত রাজ ফ্যামিলির লোক।

হ্যাঁ—মৃদু হেসে বললে রঞ্জিৎ সিং, আমাদের সেই বংশই বটে। তবে সেসব তো এখন গল্প কথা, অতীত—

অতীত হলেও পুরাতন দিনের সে ঐতিহ্য ও সুবাস যাবে কোথায়? সে যে এখনো আপনাদের চেহারায় চরিত্রে উঁকি দেয়!

বাট্ ইউ উড বি সারপ্রাইজড, টু হিয়ার দ্যাট আই হ্যাভ গট নো ফ্যাসিনেশন আর ড্রিম ফর দ্যাট্ পাস্ট অফ্ আওয়ারস। কিন্তু থাক সে কথা, আপনার প্রয়োজনের কথাটা এবারে বলুন!

মাফ করবেন মিঃ সিং! আপনাকে তো সে সময় ফোনেই বলেছিলাম পাঞ্জাবে আমার বাস হলেও কলকাতাতেই জীবনের দীর্ঘকাল আমার কেটেছে এবং কলকাতাতেই আমার ব্যবসা। অবশ্য রিসেন্টলি লন্ডনেও একটা ব্রাঞ্চ খুলেছি। আমার ব্যবসা হচ্ছে মূল্যবান সব ওল্ড কিউরিওস নিয়ে। ছবি, পট, মূর্তি, মুদ্রা, স্ট্যাম্প ইত্যাদি—

তাই তো সে সময় আপনাকে ফোনেই আমি বলেছিলাম আমার ব্যবসা তো তা নয়! আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

পারেন আপনি! এখানে আপনারই এক বিশেষ পরিচিত ভদ্রলোকের মুখে আমি শুনেছি আপনি যোধপুরের এক পুরাতন রাজ পরিবারের লোক। রাজস্থানে বহু পুরাতন ঐ ধরনের মূল্যবান দ্রব্য আমি পাব জানি। কিন্তু রাজস্থান আমার অপরিচিত জায়গা। তাই আপনার কাছ থেকে কিছু সত্যিকারের ইনফরমেশন আমি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে চাই।

ইনফরমেশন!

হ্যাঁ—আচ্ছা, একটা প্রশ্নের জবাব হয়তো নিশ্চয়ই আপনি দিতে পারবেন। যোধপুরের গিলহোট বংশে স্বর্ণনির্মিত রণছোড়দীর মূর্তি ছিল শুনেছি—

রঞ্জিৎ সিং যেন সহসা ভূত দেখার মতই চমকে ওঠে কথাটা শুনে। এবং জড়িত কণ্ঠে বলে, স্বর্ণনির্মিত রণছোড়জীর মূর্তি?

হ্যাঁ—

আমি, আমি, আমি তো—কখনো সে কথা শুনি নি!

সত্যি বলছেন শোনেন নি?

না—

সিঁড়িতে ঐ সময় লঘু পদশব্দ শোনা গেল! কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। কিন্তু করণ সিং বলেছিল—

কে! কে বলেছিল? উত্তেজনায় রঞ্জিৎ সিং ততক্ষণে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক সূক্ষ্ম সিল্কের কালো 'ভেল' ঢাকা এক নারীমূর্তি এসে ঘরের মধ্যে পা দিয়ে কঠিন-কণ্ঠে বললে, করণের নামটাও বোধহয় তুমি শোন নি রঞ্জিৎ!

কে!

নারীমূর্তির মুখের উপর থেকে কালো সিল্কের 'ভেল' অপসারিত হল, চিনতে আশা করি পারছ রঞ্জিৎ—

পদ্মিনী,—অস্ফুট কণ্ঠে কোনমতে যেন রঞ্জিৎ উচ্চারণ করল নামটা।

হ্যাঁ, পদ্মিনী। তারপরই কণ্ঠের সুর পাল্টে বললে, দাও, ফিরিয়ে দাও, সেই রণছোড়জীর মূর্তি রঞ্জিৎ—

কি আবোল-তাবোল প্রলাপ বকছ পদ্মিনী! কিসের মূর্তি?

রঞ্জিৎ তখন যেন সেই ঘরে ঐ সময় সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি কাপুর ছদ্মনামে কিরীটীর উপস্থিতির কথাটা পর্যন্ত উত্তেজনায় বিস্মৃত হয়েছিল।

আবোল-তাবোল যে আমি বকছি না তা তুমি খুব ভালভালেই বুঝতে পারছ রঞ্জিৎ। এখন আমি বুঝতে পারছি ঐ মূর্তিটার লোভে সেদিন তুমি আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছিলে। তারপর সেদিন দুপুরে পালিয়ে গিয়ে যখন তোমার ডেরায় উঠেছিলাম তুমি আমাকে আশ্বাস দিয়ে সেই যে বের হয়ে গিয়েছিলে আর ফিরে এলে না সেও ঐ কারণেই।

পদ্মিনী—

হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই ফাঁকে তুমি আমাদের বাড়িতে গিয়ে নিশ্চয়ই সিন্দুক থেকে মূর্তিটা হাতিয়ে নিয়ে ভেগেছিলে! কারণ এখন আমার মনে পড়ছে মদের নেশার ঝোঁকে একদিন মূর্তিটার কথা তোমাকে বলেছিলাম আর এও তুমি জানতে করণের সিন্দুকের চাবি কোথায় থাকত।

পাথরের মতই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনল রঞ্জিৎ। তারপর মৃদু হেসে শান্তকণ্ঠে বলে, পদ্মিনী, তুমি নিশ্চয় অতিরিক্ত মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত হয়েছ—

না, নেশাগ্রস্ত উনি হন নি রঞ্জিৎ সাহেব—

এতক্ষণে কিরীটীর কথায় ফিরে তাকাল রঞ্জিৎ তার মুখের দিকে। ঘরে তার উপস্থিতিটা বোধ হয় এতক্ষণে রঞ্জিৎ সিংয়ের মনে পড়ল।

হুঁ, এখানে কৌশল করে আপনারও আগমনটা তা হলে সেই কারণেই ঘটেছে মিঃ কাপুর? তা হলে এইটুকুই বলতে পারি আমি, আপনার ঐ প্রণয়িনী আমার মত আপনকেও ধোঁকা দিয়েছে।—বলে পদ্মিনীকে দেখাল আঙ্গুল তুলে রঞ্জিৎ।

উনি আমার প্রণয়িনী নন সিং সাহেব। আর ধোঁকাও উনি আমাকে দেননি—

কিন্তু আপনাদের প্রলাপ অনেকক্ষণ আমি সহ্য করেছি আর নয়—এখান থেকে এক্ষুনি যদি আপনারা না যান তো জানবেন বাধ্য হয়েই অন্য ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। রঞ্জিৎ সিং বলল।

সে আপনার যেমন অভিরুচি। তবে এও জানবেন ওঁদের রণছোড়জীর মূর্তির একটা হদিশ না নিয়ে আমরাও এখান থেকে নড়ছি না। জবাব দিল কিরীটী।

নড়বেন না?

না।

রঞ্জিৎ সিংয়ের পিঙ্গল চোখের তারা দুটো রুদ্ধ একটা আক্রোশে ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল ঐ সময়।

শুনুন রঞ্জিৎ সাহেব, কেলেঙ্কারি যদি না চান তো ভালোয় ভালোয় মূর্তিটা ওঁকে ফেরত দিন। আমরা কথা দিচ্ছি কেউ সে কথা জানবে না। আর কেলেঙ্কারিই যদি চান তো জানবেন শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে গিয়ে জেলখানাতেই ঢুকতে হবে।

আইন আদালত বুঝি আর দেশে নেই!

আছে বৈকি! সেই আইনই আপনাকে প্রশ্ন করবে মাত্র দুই মাস সময়ের মধ্যে আজকের এতবড় ব্যবসা আপনি গড়ে তোলবার টাকা পেলেন কোথা থেকে—আশা করি জবাবটা আপনার তৈরিই আছে?

মূর্তি আমি নিই নি—

নিয়েছেন। আর এও বুঝতে পারছি সেটা বিক্রী করে বা তার গা থেকে জহরৎগুলো খুলে বেচেই—

না, না—সেটা ও করে নি রায়, ও মূর্তি যার ঘরে থাকবে তার কোনদিন অর্থের অভাব হবে না—পদ্মিনী বলে ওঠে।

ও ঠিকই বলেছে। আমি—মানে আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে ধার নিয়ে ব্যবসা শুরু করি রঞ্জিৎ তাড়াতাড়ি বলে।

কে! কে সে আত্মীয়! কিরীটী প্রশ্ন করে।

করণ! করণ সিং দিয়েছে—

রঞ্জিতের মুখের কথাটা শেষ হয় না, লাফিয়ে এসে ঘরে ঢুকল ঐ সময় করণ সিং।

চিৎকার করে বললে, ড্যাম লায়ার—এবং সঙ্গে সঙ্গে করণ রঞ্জিতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

চেঁচিয়ে উঠল আর্তকণ্ঠে পদ্মিনী, করণ, করণ—

জড়াজড়ি করে ততক্ষণে করণ ও রঞ্জিৎ সিং মেঝেতে পড়েছে। এবং কিরীটী ওদের বাধা দেবার আগেই রঞ্জিতের কণ্ঠ চিরে একটা আর্ত চীৎকার বের হল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের ধাক্কায় টেবিল ল্যাম্পটা টেবিলের উপর থেকে ওদের গায়ে পড়ে গেল। এবং কিরীটীও অন্ধকারে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে চেয়ারের ধাক্কা খেয়ে—হাঁটুতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল অর্ধস্ফুট যন্ত্রণাকাতর একটা শব্দ করে।

ও দিকে তখন রঞ্জিৎ ও করণের গায়ে আগুন ধরে গেছে।

পদ্মিনী গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঐ আগুনের মধ্যে বোধহয় রঞ্জিতের হাত থেকে করণকে বাঁচাতেই।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব ঘটে গেল ব্যাপারটা।

রঞ্জিৎকে করণ ছোরা দিয়ে আঘাত করেছিল একেবারে বুকে। রঞ্জিতের মৃত্যু হয়েছিল তাতেই, কিন্তু করণ ও পদ্মিনী পুড়ে গিয়েছিল বিশ্রীভাবে।

কিরীটীকেও প্রায় দিন দশেক—হাঁটুটা নিয়ে ঐ লাহোরেই বসে থাকতে হয়েছিল হোটেলে।

দীর্ঘ এক মাস হাসপাতালে থেকে করণ সুস্থ হয়ে উঠল বটে, কিন্তু সুস্থ হয়ে আর পদ্মিনীর কোন সন্ধানই সে পায় নি।

॥ সাত ॥

কেন? প্রশ্ন করলাম আমি।

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে, পদ্মিনীর দেহের চাইতে মুখটাই বেশী পুড়েছিল। মুখের সমস্ত সৌন্দর্য তার অগ্নিদেবতা একেবারে যেন নিঃশেষে চেটেপুটে নিয়েছিলেন, তাই বোধহয় আর সে করণকে দেখা দেয় নি—

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস বের করে কিরীটী আবার বললে, পদ্মিনী ও করণের সংবাদ রোজ আমি নিতে যেতাম হাসপাতালে। একদিন গিয়ে দেখলাম তার বেডটা খালি। নার্স বললে, দুপুর থেকে তাকে নাকি আর পাওয়া যাচ্ছে না। সেই দিনই বুঝেছিলাম সুব্রত, মেয়েটা সত্যি করণকে ভালবাসত। চিত্রাভিনেত্রী হবার নেশার সেই ভালবাসাকে পর্যন্ত সে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছিল। নেশা এমনই বিচিত্র—

আর সেই মূর্তিটা?

জানি না।

রঞ্জিৎই তা হলে মূর্তিটা চুরি করেছিল?

হতে পারে—

কিন্তু তোর কি ধারণা?

জগতে এমন অনেক কিছু আছে সুব্রত যা এখনও আমাদের বিচার ও জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে।

কিন্তু—

কিন্তু কিরীটী আর জবাব দেয় নি।

ঃ সমাপ্ত ঃ